Download New Pdf- www.PoragEducation.com

বেলা ফুরাবার আগে

আরিফ আজাদ

সমকালীন

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশন'-এর পথচলা।

সমকালীন প্রকাশন

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

বেলা ফুরাবার আগে

আরিফ আজাদ

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

বেলা ফুরাবার আগে

আরিফ আজাদ

প্রথম প্রকাশ

একুশে বইমেলা ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব

লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

একমাত্র পরিবেশক

চর্চা গ্রন্থ প্রকাশ

১১/১, ইসলামি টাওয়ার (তৃতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ফোন : ০১৬১১৮৬৪৬৮৮

Published by Somokalin Prokashon Limited, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 287.00 (Paperback), Tk. 330.00 (Hardcover), US $ 15.00 only.

ISBN: 978-984-94844-0-0

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০। ফোন : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবকিছু কেবল বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

এবার ভিন্ন কিছু হোক
উদ্‌ভ্রান্ত উদাসীন সময়ের পাটাতন থেকে
নোঙর করা যাক নতুন এক সময়ের বুকে
মরীচিকাময় স্বপ্নের নাগপাশ ছেড়ে
ফিরে আসা যাক জীবনের নতুন অনুচ্ছেদে
হতাশা হতোদ্যম আর হঠকারিতার বলয় ভেঙে
এবার গায়ে লাগুক মুক্তির শীতল পরশ।

এবার ঘুম ভাঙুক
চোখ মেলে দেখা হোক বাইরে অপেক্ষমাণ
নতুন দিনের পৃথিবী।
নতুন ভোরের সোনারঙা রোদে
ঝেড়ে ফেলা যাক একজীবনের সমস্ত ক্লান্তি।

একটা জীবন অবলীলায় অবহেলায় কেটে যাবে
ভুল আর ভ্রান্তির বেড়াজালে
একটা জীবন আমগ্ন ডুবে রবে
এমনটা হতে দেওয়া যায় না।
জীবনের গতিপথ ভুলে
একটা জীবন ভীষণ বেপরোয়া হয়ে
ভুল স্রোতে ভুল পথে বাঁক নেবে
এমনটা হতে দেওয়া যায় না।

এবার ভিন্ন কিছু হোক
জাগরণের এই জাগ্রত জোয়ারে
এবার নতুন করে লেখা হোক জীবনের জ্যামিতি
বেলা ফুরাবার আগে
আজ তবে ফেরা হোক নীড়ে...

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

প্রকাশকের কথা

অস্বীকার করার জো নেই, বর্তমানে আমাদের চারপাশে নতুন একটি জাগরণ শুরু হয়েছে—তরুণদের বিশাল একটি অংশ এখন দ্বীন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে চায়। প্রাত্যহিক জীবনে তারা হয়ে উঠতে চায় আদর্শ মুসলিম। জাগরণের এই জোয়ারকে সঠিক পথে প্রবাহিত করতে না পারলে তা ভিন্নদিকে, ভিন্নখাতে মোড় নেবে নিঃসন্দেহে। সময়ের সূচনাটা সুখকর হলেও এখনকার তরুণদের নিত্যদিন, এমনকি প্রতিটি মুহূর্তে মুখোমুখি হতে হয় পাহাড়সম এক জাহেলি জঞ্জালের। চারপাশে ওঁৎ পেতে থাকা পদস্খলনের সকল পদধ্বনি যেন আমাদের কানের কাছে অবিরাম বেজে চলে। দ্বীন মেনে চলতে চাইলেও, আধুনিক জাহিলিয়াতের এই অদৃশ্য, অস্পৃশ্য শৃঙ্খলে আজ যেন আমরা বন্দি। চারপাশে কেবল মিথ্যা আর মোহের ছড়াছড়ি। জঞ্জালে ভরা এই বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে আত্ম ও আত্মার উন্নয়নের সুযোগ আমাদের হয়ে ওঠে না। ফলে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ভেসে যেতে হয় স্রোতের সাথে, ধ্বংসের পথে।

আত্মোন্নয়নের যাত্রায় যে সকল বাধা-বিপত্তি আছে, তা নিয়ে যুগ যুগ ধরে কাজ করেছেন মহামনীষীগণ। শৃঙ্খল ভেঙে কীভাবে নিজেদের মুক্ত করতে পারব, তার যুগপৎ নির্দেশনা আমরা পেয়ে এসেছি কুরআন, হাদিস ও সালাফে-সালিহিনের বইগুলোতে। এসব নিয়ে যেমন পূর্বে কাজ হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে, ইন শা আল্লাহ। এখনকার তরুণদের পরিবর্তন নিয়ে কাজ করার এই যে ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রে আরিফ আজাদের *বেলা ফুরাবার আগে* বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলে আমাদের বিশ্বাস। লেখক আরিফ আজাদ এখানে তার জীবন থেকে,

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি থেকে তুলে এনেছেন কিছু সমস্যা ও সমাধানের কথা। সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি বেছে নিয়েছেন যুগের মহামারি সমস্যাগুলোকেই আর সমাধানের সবটুকু জুড়ে রেখেছেন কুরআন, হাদিস ও সালাফে-সালিহিনদের জীবনকে।

তরুণদের দ্বীনে ফেরার পথে হারাম রিলেশানশিপ একটা বড় ধরনের বাধা। ফজরের সালাতে জাগতে না পারা, বিপদে ধৈর্য হারিয়ে অস্থির হয়ে ওঠা, জামাআতে সালাত আদায়ে অনীহা, চোখের যিনা, তথাকথিত সুখের পেছনে জীবন পার করে দেওয়া-সহ নানান সমস্যা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন এই বইতে। মোটাদাগে, এগুলোই আমাদের বিচ্যুতির কারণ। তিনি সমস্যাকে তুলে ধরে, সেগুলোর সমাধান ধরে এগিয়েছেন। বইটিতে তিনি যে কেবল সমস্যা ধরে ধরে কথা বলেছেন তা নয়, তিনি কথা বলেছেন সম্ভাবনা নিয়েও। আমাদের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অমিত সম্ভাবনাকে তিনি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন সর্বাত্মকভাবে।

বইটি মোটাদাগে গদ্যের একটি বই, তবে খটমটে ধারার গদ্য নয়। বর্ণনার শুরুতে তিনি কখনো হয়তো কোনো ঘটনা টেনেছেন কিংবা কোনো গল্পের অবতারণা করতে করতে ঢুকে পড়েছেন মূল বিষয়ে। ফলে, পাঠক এই গদ্যের সাথে সাথে একটা গল্পেরও আমেজ পাবেন, আশা করি। লেখার মাঝে পাঠকদের মজিয়ে রাখার ব্যাপারে লেখক আরিফ আজাদের যে মুনশিয়ানা, তার নতুন আরেক মাত্রা আমরা দেখতে পাই এ বইতে।

লেখক বলেছেন, মোটাদাগে তরুণদের সামনে রেখে বইটি লেখা হলেও, বইটি মূলত আমাদের সকলের জন্যই। আমাদের বিস্মৃত আত্মা, ভুলের সমুদ্রে ডুবে থাকা অন্তর আর হৃদয়প্রদীপকে একটু জ্বালিয়ে দিতেই তার এই প্রচেষ্টা। আমরা, সমকালীন পরিবার, লেখকের এই মহতী চিন্তা, মহৎ উদ্যোগের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত। লেখকের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি এবং যাদের জন্য লেখক তার চিন্তাগুলোকে মলাটবন্ধ করেছেন, তাদের সকলের জন্যও শুভকামনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের ভুলগুলো মাফ করে, আমাদের ভালো কাজগুলোকে আমাদের নাজাতের ওয়াসিলা বানিয়ে দেন। আমিন।

প্রকাশক
সমকালীন প্রকাশন

লেখকের কথা

‘সাজিদ সিরিজ’ লেখার পর থেকে, প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন মানুষ আমাকে ইনবক্সে, ইমেইলে বিভিন্ন বার্তা পাঠান। সেই বার্তাগুলো ভরতি থাকে ভালোবাসা, দুআ আর আশাবাদে। আমি প্রীত হই, আপ্লুত হই, আনন্দিত হই। মানুষের ভালোবাসার যে এক অদ্ভুত শক্তি আছে, তা আমি এই কয়েক বছরে খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছি, আল-হামদু লিল্লাহ। জীবনের একটা ইচ্ছে ছিল সাংবাদিক হওয়ার, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছেটা ছিল ভিন্ন। তিনি আমাকে সাংবাদিক বানাননি, লেখক বানিয়েছেন। মানুষের ভালোবাসা পাওয়ার, মানুষের কাছে পৌঁছানোর যে পথ তিনি আমার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তার শুকরিয়া একজীবনে শেষ করা যাবে না।

তরুণরা স্বপ্ন নিয়ে আমাকে বলেন, ‘ভাইয়া, আমি সাজিদ হতে চাই। কীভাবে সাজিদ হওয়া যাবে আমাকে পরামর্শ দিন।’ এমন প্রশ্ন আর আবদারের কাছে আমি মাঝে মাঝে পরাস্ত হই। ভাবি, কী পরামর্শই দেবো? সাজিদ হওয়ার জন্য তাকে বলব অনেক অনেক বই পড়তে? অনেক বেশি জানতে? কিন্তু, পরক্ষণে ভাবি, সাজিদ কি সত্যি এ রকম? আমি কি সাজিদকে এভাবে চেয়েছি কখনো? আমার মানসপটে সাজিদের যে রূপরেখা, সে সাজিদ আসলে কেমন?

পরে ভাবলাম, তারা যেহেতু সাজিদ হতে চায়, সাজিদ তৈরি করার একটা প্রকল্প হাতে নিতে অসুবিধে নেই কিছু। সাজিদের বিতর্ক আর বক্তব্যের দুনিয়ার সাথে তারা পরিচিত, কিন্তু সাজিদের একান্ত ব্যক্তিগত জীবন, যে জীবনে সাজিদ ভীষণ অন্য রকম, সে জগতের সাথে তাদের পরিচিত করানো উচিত। সাজিদ তৈরির আমার সেই খসড়া প্রস্তাবনা, সেই স্বপ্ন ও সাহসের প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে এ বইটিকে।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

বইটিকে সাজিদ তৈরির প্রথম খসড়া বললেও, মূলত বইয়ের কথাগুলো আত্ম-উন্নয়নমূলক। দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে আমি যে বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হয়েছি, হতে পারে সেগুলো দৃশ্য-অদৃশ্য, নিজের সাথে নিজের, কিংবা নিজের সাথে অন্যের—সেই দিকগুলো নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি। কথা বলেছি অমিত সম্ভাবনার অনন্য দ্বার নিয়েও, যে দ্বার উন্মুক্ত করলেই দেখা মিলবে এক পরম ও পবিত্র জীবনের। ক্ষুদ্র জীবনের অতি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা, অতি সামান্য পড়াশোনা এবং অতি অপরিপক্ক উপলব্ধি থেকে আমি যা বুঝেছি, তার একটি কাগুজে সংকলন এই বইটি। যেহেতু আমরা মানুষ এবং মানুষমাত্রেই ভুল করতে সিদ্ধহস্ত, তাই এ বইতে ভুল থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভুলগুলোর সমস্ত দায়ভার আমার। আর এ বইতে যা কিছু ভালো এবং কল্যাণকর, তার প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার।

পাঠকের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ, এই বইটি যদি আপনার সামান্য উপকারে আসে, যদি এই বই আপনাকে সামান্য পরিমাণও ভাবনার খোরাকি দেয়, তাহলে দয়া করে বইটিকে আপনার নিকট রেখে দেবেন না। আপনার প্রিয় মানুষটি, যার মধ্যেও আপনি চান যে, এই ভাবনার উদয় হোক, তার বরাবর বইটি হস্তান্তর করে দেবেন। আর অবশ্যই, আপনার সালাতে, মুনাজাতে এই অধম বান্দাকে স্মরণ রাখবেন। ওয়ামা তাওফিকি ইল্লা বিল্লাহ।

আরিফ আজাদ
arifazad.bd@outlook.com

সূচিপত্র

শুরুর আগে ১৩
মন খারাপের দিনে ১৯
আমার এত দুঃখ কেন? ৩০
বলো, সুখ কোথা পাই ৪১
জীবনের ইঁদুর-দৌড় কাহিনি ৫০
চোখের রোগ ৫৮
আমরা তো স্রেফ বন্ধু কেবল ৬৪
চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয় ৭৯
বেলা ফুরাবার আগে ৮৫
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে ৯৬
বসন্ত এসে গেছে ১০৮
সালাতে আমার মন বসে না ১১৫
তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব... .... ১২৬
যুদ্ধ মানে শত্রু-শত্রু খেলা ১৩১
মেঘের ওপার বাড়ি ....
১৪১

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আমি হব সকাল বেলার পাখি ১৫০
তুলি দুই হাত করি মোনাজাত ১৬৩
চলো বদলাই ১৭৪

শুরুর আগে

প্রিয় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সাহাবিদের চোখের মণি। তাকে এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টির অন্তরাল করা সাহাবিদের জন্য ছিল রীতিমতো বিচ্ছেদের ব্যাপার। নবিজির উপস্থিতি তাদের হৃদয়কে প্রফুল্ল করে তুলত। তাদের ধ্যানধারণা, তাদের যাপিত জীবনের সকল অনুষঙ্গ আবর্তিত হতো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘিরেই। ধু-ধু মরুভূমিতে পথহারা পথিকের বুক যেমন এক ফোঁটা পানির জন্য ছটফট করতে থাকে, সাহাবিদের কাছে নবিজির সঙ্গ ছিল ঠিক সে রকম। দুর্লভ, অমৃত সমান পানির মতন। নবিজিকে তারা চোখে হারাতেন। তিনি ছিলেন তাদের কাছে প্রাণের অধিক প্রিয়। যে মানুষটিকে এক পলক না দেখলে সাহাবিরা অস্থির হয়ে উঠতেন, ব্যাকুল হয়ে পড়তেন, যার মুহূর্তকাল অনুপস্থিতি সকলকে দিশেহারা করে তুলত, একদিন সেই মানুষটিই যখন দুনিয়ার পাঠ চুকিয়ে বিদেয় নিলেন, দুনিয়ার জীবন ছেড়ে পাড়ি জমালেন অনন্ত অসীম জীবনের পথে, সাহাবিদের মনের অবস্থা তখন কেমন হয়েছিল? 'প্রিয়তম মানুষটার সাথে দুনিয়ায় আর দেখা হবে না, একসাথে বসে গল্প করা হবে না, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঢেলে 'ইয়া রাসুলুল্লাহ' বলে সম্বোধন করা যাবে না, তার ডাকে 'লাব্বাইক' বলে হাজির হওয়া হবে না'—এমন দৃশ্যগুলো কল্পনা করা কি সাহাবিদের জন্য খুব সহজ ছিল? ছিল না। নবিজিকে হারিয়ে সাহাবিদের হৃদয়ে যে বিচ্ছেদের ঝড় উঠেছিল, সেই ঝড়ের খানিকটা আমরা বুঝতে পারি উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর ঐতিহাসিক সেই ঘটনা থেকে।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর দিন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু একেবারে পাগলের মতো হয়ে গেলেন। 'নবিজির মৃত্যু হতে পারে'—এই ব্যাপারটা তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তিনি হয়তো ভাবলেন, আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত একজন রাসুল, যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাছাই করেছেন গোটা মানবজাতির জন্যে, যার ওপর নাযিল হয়েছে আসমানি গ্রন্থ আল-কুরআন, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যার সাথে সাত আসমানের ওপরে সাক্ষাৎ করেছেন, তার কীভাবে মৃত্যু হতে পারে? উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন অধিক শোকে পাথর। 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একজন মানুষ। মানুষ হিশেবে তার মৃত্যু হওয়াটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সৃষ্ট কোনো বস্তুকেই অমরত্ব দান করেননি'—এই ধ্রুব সত্য থেকে তার মন তখন খানিক সময়ের জন্য বিস্মৃত হলো। নবিজির প্রয়াণ দিবসে এই কথাগুলো বোঝার মতন অবস্থা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর ছিল না। শোকে মুহ্যমান অবস্থায় তিনি গর্জে উঠেন। বললেন, 'যে বলবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু হয়েছে, তাকেই আমি হত্যা করব।'[১]

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমণ্ডল থেকে চাদরটা সরিয়ে, তার শুভ্রোজ্জ্বল চেহারায় দুটো চুমু খেলেন। এরপর উপস্থিত জনতার ঢলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'অবশ্যই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুবরণ করেছেন।'[২] আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর এমন সাদাসিধে সরল বক্তব্যে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনের যাতনা যেন আরও দ্বিগুণ বেড়ে গেল। নবিজির প্রয়াণে যে শোকের সাগর জন্ম নিয়েছে হৃদয়ে, সেই সাগর যেন আরও অশান্ত, আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, 'না। কখনোই না। মুনাফিকরা চিরতরে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু হতে পারে না।'[৩]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এমন বিস্মৃত হতে দেখে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইবাদত করত, তারা জেনে রাখুক যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেছেন। আর যারা আল্লাহ

[১] *তারিখুল ইসলাম*, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৩১৭; *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ১৪২; *মুসনাদে আহমাদ*, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ২১৯

[২] *আর রাহিকুল মাখতুম*, পৃষ্ঠা : ৫৩৫; বাংলা

[৩] *তাবাকাতু ইবনি সাদ*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ১১৪

সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদত করে, তারা জেনে রাখুক যে, আল্লাহ চিরঞ্জীব, চিরন্তন।'[১] এরপর তিনি সুরা আলে ইমরানের সেই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ

আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসুল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসুল বিগত হয়েছেন। যদি মুহাম্মাদ মারা যান কিংবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে কি তোমরা আল্লাহর রাস্তা থেকে পলায়ন করবে? (জেনে রাখো) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তা থেকে পলায়ন করে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান প্রদান করবেন।[২]

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুখে এই আয়াত শুনে মুহূর্তেই স্তম্ভিত হয়ে যান উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বললেন, 'মনে হলো এই আয়াত আমি আজই প্রথম শুনলাম!'[৩]

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতন একজন বিশিষ্ট সাহাবিও অল্প কিছু সময়ের জন্য বিস্মৃত হয়েছিলেন সেদিন। শোকের আতিশয্যে তিনি ভুলতে বসেছিলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মৃত্যুবরণ করতে পারেন। একজন নবি, প্রেরিত রাসুল; আসমানি কিতাবের ধারক-বাহক। জগতে পদচিহ্ন রাখা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। এমন মানুষেরও মৃত্যু হতে পারে?—ভাবনার এমন দোটানায়, বিস্মৃতির এমন ঘোরে নিমজ্জিত ছিলেন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর মুখ থেকে কুরআনের একটি আয়াত শুনেই সেদিন তার এই ঘোর ভাঙল। বুঝতে পারলেন, অতি শোকে এক মহাসত্য, এক মহাবাস্তবতা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন তিনি। এমন নয় যে, এই আয়াত এর আগে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু শোনেননি। ইতঃপূর্বে অনেক অনেক বার তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেছেন। অনেক মানুষকে তিনি এই আয়াত পড়ে শুনিয়েছেন, শিখিয়েছেন। তারপরও তিনি বললেন, 'মনে হলো এই আয়াত আমি আজই প্রথম শুনলাম!' এই যে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি

[১] *আর রাহিকুল মাখতুম*, ৫৩৫-৫৩৬; বাংলা

[২] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৪

[৩] *তারিখুত তাবারি*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৪৪২; *তারিখু ইবনি আসির*, খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২১৯; *সিরাতু ইবনি হিশাম*, খণ্ড : ৪; পৃষ্ঠা : ৬৫৬

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

ছোট্ট রিমাইন্ডার, একটি ছোট্ট নাসিহা, এতেই উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিস্মৃত অন্তর জেগে উঠেছিল সেদিন। যে মহাসত্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন তিনি, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটা ছোট্ট কথা সেদিন তাকে টেনে নিয়ে এলো পরম বাস্তবতায়। তার অন্তর উপলব্ধি করল সত্যটাকে। উপস্থিত সকল সাহাবিও বুঝলেন যে, নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও মৃত্যু হতে পারে। যদি সেদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই ভুল না ভাঙাতেন, তাহলে মুসলিম শিবিরে শিরকের মতো একটা পাপ হয়তো শেকড় গেড়ে বসত।[১]

এই ঘটনা বলার উদ্দেশ্য হলো এই—একটি নাসিহা, একটি রিমাইন্ডার, একটি উপদেশ মাঝে মাঝে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে আমাদের জীবনে। বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাওয়া আমাদের হৃদয়গুলোকে জাগিয়ে তুলতে এ রকম নাসিহার খুব বেশি দরকার মনে করি। একটি আয়াত কিংবা হাদিস অথবা একটি বাক্যও বদলে দিতে পারে আমাদের জীবন। হৃদয়ে মেলে দিতে পারে ভাবনার ডালপালা। বিস্মৃত অন্তরকে নতুন করে জাগাতে, মরচে ধরা ঈমানকে ঝালাই করতে, অবাধ্যতার অন্ধকার থেকে আমাদের তুলে আনতে অনেক সময় একটি লাইনও যথেষ্ট হতে পারে।

জীবনের উদ্যম ফিরে পেতে, মহান রবের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য এ রকম রিমাইন্ডারের বিকল্প নেই। সেই রিমাইন্ডারের উৎস হতে পারে কোনো সত্যিকার আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির সাহচর্য, হতে পারে ভালো কোনো আলিমের লেকচার, ভিডিও, কোনো ভালো স্কলারের লেখা আর্টিকেল কিংবা ভালো কোনো দ্বীনি পরামর্শমূলক বই। এই উৎসগুলো আমাদের ঈমানকে ঝালাই করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এসবের সাথে জীবনকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলতে পারলে পথ হারাবার আশঙ্কা ক্ষীণ হয়ে আসে। একজন সাহাবির ঘটনা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মনে করছি। যতক্ষণ তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে থাকতেন, ততক্ষণ তার মনে হতো যেন তিনি জান্নাতের বাগিচায় হেঁটে বেড়াচ্ছেন। মনে হতো জান্নাতের সৌন্দর্য, জান্নাতিদের বিচরণ, কলকল নহরের ধ্বনি—সবকিছুই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। নবিজির কাছাকাছি থাকলে তার অন্তর সারাক্ষণ আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে থাকে। হৃদয় টইটম্বুর থাকে ঈমানে। কিন্তু যখনই তিনি নবিজির সাহচর্য ছেড়ে নিজের ঘরে যেতেন, তখনই যেন সবকিছু থেকে ছিটকে পড়তেন। স্ত্রী-সন্তান-সংসারের

[১] এই ধারনাটা IOU ব্লগের একটি আর্টিকেলে পাওয়া।

ভাবনায় ডুবে যেতেন। এই ব্যাপারটা তাকে খুব পীড়া দিত। ভাবতেন, নবিজির সাহচর্য ছেড়ে আসলেই বুঝি তিনি মুনাফিক হয়ে যান। না হয় তার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ামাত্র কেনই-বা তার মনে হয় যে, তিনি দুনিয়ার ভাবনায় ডুবে গেছেন? স্ত্রী-সন্তান-সংসার কেনই-বা তার কাছে অধিকতর প্রিয় হয়ে ওঠে? কেন তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েন দুনিয়ার শেকলে? এই চিন্তাগুলো যখন তার হৃদয়পটে উদয় হতো, তখন তিনি অঝোরে কাঁদতে শুরু করতেন। এত বেশি কাঁদতেন যে, মনে হতো তার খুব প্রিয় কোনো মানুষ বুঝি মৃত্যুবরণ করেছে। যেন কোনো এক নিদারুণ বিচ্ছেদব্যথায় তিনি কাতর। একদিন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। ওই সাহাবি বললেন, 'আমি যখন নবিজির সাহচর্যে থাকি, তখন মনে হয় আমি যেন জান্নাতে হেঁটে বেড়াচ্ছি। আমার হৃদয় তখন হিদায়াত, নুর আর ঈমানের জোয়ারে টইটম্বুর থাকে। কিন্তু যখনই ঘরে ফিরি, মনে হয় যেন দ্বীন থেকে ছিটকে পড়েছি; দুনিয়াকে আপন করে নিয়েছি; মুনাফিক হয়ে গেছি। নবিজির সাথে থাকলে এক রকম লাগে, তাকে ছেড়ে এলে অন্য রকম। আমি জানি না, কেন আমার এমন হয়! কেন আমি দুই সময়ে দু-রকম অনুভূতি পাই!'

তখন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তোমার মতো আমার সাথেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে। নবিজির পাশে যখন থাকি, মনে হয়, এই তো দেখতে পাচ্ছি জান্নাত! এই তো সবুজ মিনার! ওই যে টলটলে স্বচ্ছ পানির ঝরনা! সবুজ গালিচার মতন দিগন্তবিস্তৃত মাঠ! কিন্তু যখনই নবিজির সাহচর্যের বাইরে আসি, যখন নিজের পরিবার-পরিজনদের আসরে উপস্থিত হই, মনে হয় এই বুঝি ছিটকে পড়লাম জান্নাতের পথ থেকে। এই বুঝি বিপথে চলে গেলাম। বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। তোমার মতো ঠিক একই সমস্যায় আমিও নিপতিত। চলো, আমরা বরং নবিজির কাছে গিয়ে আমাদের সমস্যার কথা জানাই।[১]

সাহাবিরা নবিজির পাশাপাশি যখন থাকতেন, তখন একটা জাগরণের মধ্যে সময় কাটত তাদের। ঈমানের আলোচনা, আমলের আলোচনা। জান্নাতের বাহারি বর্ণনা, জাহান্নামের ভয়, তা থেকে পরিত্রাণের উপায় ইত্যাদি আলোচনায় মজে থাকতেন তারা। নবিজির সঙ্গ ত্যাগ করামাত্রই তাদের মনে হতো, এই বুঝি তারা দ্বীন থেকে ছিটকে পড়লেন। এই বুঝি আবার ডুব দিলেন দুনিয়ায়। নবিজির সঙ্গে থাকলে তারা এক রকম থাকতেন, নবিজির সঙ্গ ত্যাগ করলেই অনুভব করতেন অন্য

[১] *জামি তিরমিযি* : ২৫১৪, হাদিসটি সহিহ

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

রকম অনুভূতি। নাসিহা তথা রিমাইন্ডারের গুরুত্বটা এখানেই। যখন আমরা কোনো ভালো ইসলামি বই পড়ি, আমলের বই পড়ি, তখন আমাদের হৃদয়ে একটা দোলা কাজ করে। ইচ্ছে করে আমল করার, বদলে যাওয়ার। নতুন করে সবকিছু সাজিয়ে নেওয়ার। কিন্তু, যখনই আমরা আবার দুনিয়ার অনুষঙ্গে মিশে যাই, আমাদের সেই উদ্যম ফুরিয়ে যায়। যখনই এ রকম অবস্থা হবে, তখনই আমাদের উচিত—ঈমানের আলোচনা হয় কিংবা ঈমানের আলোচনা আছে এমন বিষয়বস্তুতে ফিরে আসা যা আমাদের জন্য রিমাইন্ডার হিশেবে কাজ করবে। এই বইটিকে আমি এ রকম একটি রিমাইন্ডার হিশেবে দাঁড় করাতে চেয়েছি। অন্তত আমার জন্য।

এই বইতে আমি তরুণদের সমস্যাগুলোকে প্রাধান্য দিয়েছি সবচেয়ে বেশি। মোটাদাগে বলা চলে, এটা তরুণদের উদ্দেশ্যেই লেখা। একজন তরুণ হিশেবে আমি যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হই কিংবা হয়েছি, সেগুলো নিয়েই আমি আগাতে চেয়েছি এখানে। নিজে একজন তরুণ হওয়াতে তরুণদের মনস্তত্ত্ব বোঝাটা আমার জন্য দুরূহ ছিল না অবশ্যই। নিজের যাপিত জীবনের অধ্যায়ে একজন তরুণ যে সমস্যাগুলোর ভেতর দিয়ে যায়, জীবনের অলিতে-গলিতে সে যে প্রতিবন্ধকতা, যে সমস্ত বাধার সম্মুখীন হয়, সেগুলো থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কিছু নাসিহা তুলে ধরেছি মাত্র। এই নাসিহাগুলো সবার আগে আমার নিজের জন্য। আমি এও জানি, আমার মতন হাজারো যুবককে এই প্রতিবন্ধকতাগুলোর ভেতর দিয়ে যেতে হয়। যদি এই বই তাদের সামান্য উপকারে আসে, যদি কোনো তৃষ্ণার্ত হৃদয় খুঁজে পায় একপশলা বৃষ্টি, অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের কোনো এক পথিক যদি খুঁজে পায় এক টুকরো আলো, তবে আমার এই কাজ সার্থক।

তরুণদের নিয়ে কাজ করার স্বপ্ন আমার অনেক দিনের। এই তরুণরাই তো আমাদের উম্মাহর শক্তি। পিচ্ছিল পথ মাড়িয়ে আমাদের তরুণরা যত বেশি জীবনের সঠিক গন্তব্যের দিকে ফিরে আসবে, এই উম্মাহর বিজয় তত বেশি ত্বরান্বিত হবে। জীবনের আদি এবং আসল উদ্দেশ্যকে তারা যখন চিনতে শিখবে, তখন তাদের ভেতর থেকেই উঠে আসবে নতুন যুগের হামযা, খালিদ, আলি এবং উমারের দল। তাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখতে এবং স্বপ্ন দেখাতেই আমার এই ছোট্ট প্রয়াস, যে প্রয়াসের সবটুকুজুড়ে আছে তারুণ্য। নিজেকে নতুনভাবে চিনতে, নতুন আঙ্গিকে আবিষ্কার করতে এবার চলুন আমরা ভেতরে প্রবেশ করি...

মন খারাপের দিনে

খুব মন খারাপ? হৃদয়ের অন্দরমহলে ভাঙনের জোয়ার? চারপাশের পৃথিবীটাকে বিস্বাদ আর বিরক্তিকর লাগছে? মনে হচ্ছে, আপন মানুষগুলো দূরে সরে যাচ্ছে? হারিয়ে যাচ্ছে প্রিয়জন, প্রিয়মানুষ? কিংবা অযাচিত, অন্যায্য সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত অন্তর? নিন্দুকের নিন্দায় হৃদয়ের গভীরে গভীর দুঃখবোধের প্লাবন? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি অন্য একটা জগত থেকে।

বলছিলাম সেই সময়কার কথা যখন পৃথিবীতে রাজত্ব করছিল সবচাইতে নিকৃষ্ট, নির্দয়, নরপিশাচ শাসক ফিরাউন। সম্ভবত, পৃথিবী আর কখনোই তার মতন দ্বিতীয় কোনো জালিম শাসককে অবলোকন করবে না। তার অত্যাচার আর নির্যাতনের মাত্রা ছিল অতি ভয়ংকর। হবেই-বা না কেন? নিজেকে সে 'খোদা' দাবি করত। খোদার শান, মান আর মর্যাদার আসনে কল্পনা করে সে নিজেকে জগতের একচ্ছত্র অধিপতি ধরে নিত। তার এই মিথ্যে দাবির সাথে যারাই দ্বিমত করত, তাদের কপালে জুটত—মৃত্যু! সেই মৃত্যুগুলো কোনো সাধারণ মৃত্যু ছিল না। কাউকে আগুনে পুড়িয়ে মারত, কাউকে পানিতে চুবিয়ে মারত। যেন মৃত্যুর বাহারি আয়োজনে ভরপুর থাকত তার সংসদ।

ফিরাউন ধরে ধরে বনি ইসরাইলের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত। ফিরাউন জানত, তাকে বধ করার জন্য এই বনি ইসরাইলের মধ্যেই সত্য ইলাহের একজন সত্য নবি প্রেরিত হবে। সে ভাবত, বনি ইসরাইলের ঘরে জন্ম নেওয়া সকল পুত্র সন্তানকে হত্যা করতে পারলেই তার পথের কাঁটা সাফ করে ফেলা যাবে।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

এই নিষ্ঠুর, নির্দয় জালিমের হাত থেকে নিজের সন্তানকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠল শিশু মুসার মায়ের অন্তর। চোখের সামনে প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানের নির্মম মৃত্যুদৃশ্য অবলোকন করা দুনিয়ার কোনো বাবা-মায়ের পক্ষেই সম্ভব নয়। কীভাবে বাঁচাবেন পুত্রকে তিনি? কীভাবে তাকে আড়াল করবেন জালিম বাহিনীর নাগপাশ থেকে? অস্থির চঞ্চলা হয়ে পড়লেন তিনি। মুসার মায়ের হৃদয়ের এই ব্যাকুলতা আল্লাহর কাছে গোপন থাকল না। তিনি শিশু মুসা আলাইহিস সালামকে একটা বাক্সে ভরে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য মুসার মাকে নির্দেশ দিলেন। ব্যাপারটা কুরআনে এসেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন—

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ

আর আমি মুসার মায়ের নিকট এই মর্মে নির্দেশ পাঠালাম যে, তুমি তাকে দুধ পান করাও। অতঃপর যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করবে।[১]

চিন্তা করুন। একদিকে ফিরাউন বাহিনীর হাত থেকে সন্তানকে প্রাণে বাঁচাতে মায়ের অন্তর মরিয়া। অন্যদিকে বলা হচ্ছে, শিশুটাকে যেন বাক্সবন্দি করে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের মনে হতে পারে, এ যেন মৃত্যুর আগেই মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। ডাঙার বাঘের ভয়ে জলের কুমিরের সামনে সন্তানকে ঠেলে দেওয়ার মতন ব্যাপার। আমার এবং আপনার মনে যে ভাবনার উদয় হচ্ছে তা কি মুসা আলাইহিস সালামের মায়ের মনেও উদয় হয়নি? হ্যাঁ, হয়েছে। তবে, তার মনের সেই ভীতি, সেই ভয়, সেই সন্দেহ তখনই দূর হয়ে গেল, যখন তিনি আল্লাহর কাছ থেকে আশার বাণী শুনতে পেলেন। সুমহান আল্লাহ বললেন—

وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

আর একদম ভয় করবে না এবং চিন্তাও করবে না। নিশ্চয়ই আমি তোমার সন্তানকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত করব।[২]

[১] সুরা কাসাস, আয়াত : ০৭

[২] সুরা কাসাস, আয়াত : ০৭

ওই জায়গায় আমি কিংবা আপনি হলে যে ভয় এবং যে ভীতি আমাদের অন্তরকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরত, একই ভয় মুসা আলাইহিস সালামের মায়ের মনেও জেঁকে বসেছিল। তবে তিনি হতোদ্যম হয়ে যাননি। আশা ছেড়ে দেননি। তিনি চোখমুখ বন্ধ করে এমন এক সত্তার ওপর ভরসা করেছিলেন যার দেওয়া আশা কখনো মিথ্যে হয় না। যিনি কখনোই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। এরপর ফলাফল কী হলো তা আমরা সকলেই জানি। মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রক্ষা করেছিলেন। কেবল রক্ষাই করেননি, যে শত্রু হন্যে হয়ে তাকে হত্যা করার জন্য ওঁৎ পেতে বসে ছিল, সেই শত্রুর অন্দরমহলেই শিশু মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা বড় করে তুলেছিলেন। এই পরিকল্পনা কার? কে এমন নিখুঁত পরিকল্পনা করার ক্ষমতা রাখেন? তিনি সুমহান আল্লাহ।

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

তারা চক্রান্ত করে আর আল্লাহ কৌশল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী।[১]

আমরা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ঘটনাও স্মরণ করতে পারি। শিশু ইউসুফ ছিলেন পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান। ইউসুফের প্রতি পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের এই অবর্ণনীয় ভালোবাসাকে কোনোভাবে মেনে নিতে পারেনি তার অন্য সহোদরেরা। হিংসার বশবর্তী হয়ে, খেলার নাম করে তারা ছোট্ট ইউসুফকে ফেলে দেয় এক অন্ধকার কূপের মধ্যে।

পিতা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে এসে তারা খুব সুন্দর কাহিনি ফেঁদে বসল। বলল, 'বাবা, খেলার মাঠ থেকে ইউসুফকে বাঘ খেয়ে ফেলেছে!' ইয়াকুব আলাইহিস সালাম জানতেন, তার ছেলেরা তার কাছে এসে মিথ্যে কথা বলছে। তিনি এটাও জানতেন, তারা নিশ্চিত ইউসুফের কোনো ক্ষতি করে বসেছে। এতৎসত্ত্বেও তিনি কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন না। প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে হারানোর বেদনায় মাথা চাপড়িয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন না। এমনকি ছেলেদের তিনি কোনো কটু কথা, কোনো হুমকি-ধমকি পর্যন্তও দিলেন না। তিনি কী বলেছিলেন জানেন? কুরআনে এসেছে—

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

[১] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ৫৪

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

> সুতরাং, আমার করণীয় হচ্ছে সুন্দর এবং সুস্থিরভাবে ধৈর্যধারণ করা। আর তোমরা আমার কাছে যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে আল্লাহই হলেন আমার একমাত্র সাহায্যদাতা।[১]

আল্লাহর ওপর ভরসার পারদ কতটা উঁচুতে থাকলে এমন মুহূর্তে একজন বাবা এ রকম কথা বলতে পারে? এভাবে ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দিতে পারে? আর সেই ধৈর্যের বিনিময় কতটা বিশাল ছিল তা তো আমরা জানি। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে পরবর্তীকালে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মিশরে অধিষ্ঠিত করেন রাজার বিশ্বস্ত লোক হিশেবে। যে ভাইগুলো তার সাথে শত্রুতা করে একদিন তাকে কূপে ফেলে দিয়েছিল, তাদেরকেই তিনি তার পায়ের কাছে এনে ফেলেছিলেন। তিনি ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন প্রিয়তম পুত্র ইউসুফকে, আর ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন প্রিয়তম পিতাকে। সুবহানাল্লাহ! কত সুন্দর আল্লাহর জুড়ে দেওয়া মেলবন্ধন! কত চমৎকারই-না বিপদে ধৈর্যধারণের ফল!

সুতরাং, দুনিয়াবি কষ্টগুলোতে, 'না পাওয়া' ও 'হারিয়ে ফেলা' গুলোতে একজন মুমিন কখনোই হতাশ হবে না। চরম বিপদের মুহূর্তে, উভয় সংকটের সময়ে মুসা আলাইহিস সালামের মাতা আল্লাহর দেওয়া ফয়সালাই মাথা পেতে গ্রহণ করেছিলেন এবং অপেক্ষা করেছিলেন আল্লাহর কৃত ওয়াদার ফললাভের জন্য। পুত্র হারানোর শোকের দিনেও নবি ইয়াকুব আলাইহিস সালাম দেখিয়েছেন ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা। আল্লাহ তাদের কাউকেই হতাশ করেননি। আন্তরিক সবর এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করার জন্য আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় প্রদান করেছেন। মুসা আলাইহিস সালামের মাতার যিনি রব, তিনি আপনারও রব। যিনি ইয়াকুব আলাইহিস সালামের প্রতিপালক, তিনি আপনারও প্রতিপালক। মুসার মাতা যার ওপরে ভরসা করেছিলেন, আপনিও তাঁর ওপরে ভরসা করুন। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভরসার কেন্দ্রবিন্দু যেখানে, আপনিও ঠিক সেই জায়গায় আপনার সমস্ত আশা আর ভরসাকে সমর্পণ করুন। যিনি মুসার মাতার অন্তরকে প্রশান্ত করতে পারেন, তিনি কি আপনার ভেঙে খানখান হয়ে যাওয়া হৃদয়ে প্রশান্তির ফল্গুধারা বইয়ে দিতে পারেন না? যিনি মুসা আলাইহিস সালামকে তার চরম শত্রুর ঘরের মধ্যে বড় করে তুলতে পারেন, তিনি কি চাইলে আপনার দুঃখ, আপনার ব্যথা উপশম করে দিতে

[১] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১৮

পারেন না? যে মহান রব মুসার মাতার আর ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভরসার প্রতীক হয়েছিলেন, আস্থার প্রতীক হয়েছিলেন, সেই রবকে আপনিও আপনার সকল আশাভরসার প্রতীক বানিয়ে ফেলুন। জীবনের সমস্ত দুর্যোগে কেবল তাঁর ওপরই ভরসা করুন। দেখবেন আপনার জীবন এক অন্য রকম প্রশান্তিতে ভরে গেছে।

মানুষ হিশেবে আপনার অবশ্যই জানা উচিত—এই দুনিয়া আপনার জন্য কখনোই নির্মল আর নির্ঝঞ্ঝাট হবে না। জীবনের একটা পরম বাস্তবতা হলো জীবন কখনোই রেল লাইনের মতো সমান্তরাল হয় না। এই জীবন হলো দুঃখ-ক্লেশ-কষ্ট দিয়ে গড়া। দুনিয়ার সবাইকে আপনি কখনোই আপনার বন্ধু হিশেবে পাবেন না। সবচাইতে পবিত্র, সবচাইতে তাকওয়াবান ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার চারপাশের সবাইকে কখনোই বন্ধু হিশেবে পাননি। তিনি ছিলেন 'আল-আমিন' তথা বিশ্বস্ত। সবার কাছে ন্যায় এবং আস্থার প্রতীক হয়ে ওঠা লোকটিরও সমালোচক ছিল। নিন্দুক ছিল। কুৎসা-রটনাকারী ছিল। মানুষের সমালোচনার তির নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও বিদ্ধ করতে ছাড়েনি। নবিজি যখন সমালোচকদের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত, যখন তার হৃদয় ভারী হয়ে উঠেছিল মানুষের কটু কথা আর কটু বাক্যে, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বললেন—

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾

> আর আমি তো জানি তারা যা বলে তাতে আপনার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়। সুতরাং, আপনি আপনার রবের প্রশংসায় তাসবিহ পাঠ করুন আর অন্তর্ভুক্ত হোন সিজদাকারীদের।[১]

স্বয়ং নবিজিকে যেখানে সমালোচনার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে, সেখানে আপনি বা আমি কীভাবে ধরে নিতে পারি যে, আমাদের সমালোচক থাকবে না? নিন্দুক থাকবে না? আমাদের পেছনে কুৎসা-রটনাকারী থাকবে না? বস্তুত এটাই হলো জীবন! এর জবাবে আমাদের প্রতিউত্তর কী হবে? আল্লাহ শিখিয়ে দিচ্ছেন, তাসবিহ পাঠ এবং সালাত আদায়। এতেই রয়েছে ক্ষতবিক্ষত অন্তরের দুঃখ সারানোর উপশম। ভগ্নহৃদয় পুনর্নির্মাণের মহৌষধ। নবিজিও আল্লাহর বাতলে দেওয়া উপায়েই

[১] সুরা হিজর, আয়াত : ৯৭-৯৮

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

হৃদয়কে প্রশান্ত করেছেন। মানুষের অযাচিত সমালোচনায় যখন তার হৃদয় বেদনার ভারে নুইয়ে পড়ত, তখন তিনি বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সালাতের জন্য ডাকতেন আর বলতেন, 'বিলাল, সালাতের মাধ্যমে আমাদের অন্তরকে প্রশান্ত করো।'[১]

যখন কেউ আপনার নামে কুৎসা রটাবে, অনর্থক আপনার নামে সমালোচনা করবে, তখন আপনি ধৈর্যহারা হবেন না। হতবিহ্বল হয়ে পড়বেন না। সবর করবেন। এই সবরের ফল সুমিষ্ট। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার ব্যাপারে দেওয়া মুনাফিকদের অপবাদের কথা কি মনে আছে? একবার এক সফরের সময়ে তিনি কাফেলা থেকে একটু পিছিয়ে পড়েন। তিনি যে কাফেলা থেকে ছিটকে পড়েছেন সেটা কেউ বুঝতে পারেনি। এরপর, জনশূন্য সেই প্রান্তরে তিনি ঠিক কী করবেন এমন ভাবনার দোলাচলে সময় যেতে লাগল। একসময় তিনি সেখানটায় ঘুমিয়ে পড়েন। পরে, সাফওয়ান ইবনু সুলামি ওই পথ অতিক্রম করার সময় আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে দেখতে পান এবং তাকে সাথে নিয়ে পুনরায় কাফেলায় যোগ দেন।

এই ঘটনাকে নিয়ে কুৎসা রটিয়ে বেড়ায় মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই। সে প্রশ্ন তোলে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার পবিত্র চরিত্র নিয়ে! শুনতে অবাক লাগলেও সত্য, মুনাফিকদের এই কুৎসা, এই সমালোচনা এবং তিরস্কার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার মাঝে সাময়িক দূরত্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নবিজি বুঝতে পারছিলেন না, সমালোচকদের তিনি কী জবাব দেবেন। কীভাবেই-বা প্রমাণ করবেন যে, আয়িশা একজন সতীসাধ্বী নারী! তাছাড়া, আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই যা প্রচার করে বেড়াচ্ছে, তার সত্য-মিথ্যার ব্যাপারেও তিনি সন্দিহান। তিনি কেবল আল্লাহর ওপর ভরসা করলেন। এমন দোটানা পরিস্থিতি, এমন বিপন্ন সময়ে তিনি এক মহামহিম আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করেছেন। আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাও তা-ই করলেন। কারও সাথে কোনো বিরোধ করেননি। কোথাও উচ্চবাচ্য করেননি। চোখের জল ফেলে কেবল আল্লাহর কাছে নিজের সমস্ত অভিযোগ, সমস্ত বাসনা সোপর্দ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে নিরাশ করেছেন? হতাশ করেছেন? মুনাফিকদের বিরুদ্ধে, সমালোচনাকারীদের বিরুদ্ধে, কুৎসা-রটনাকারীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেননি? অবশ্যই করেছেন। ওহি নাযিল

[১] *সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৮৫, হাদিসটি সহিহ*

করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার চরিত্রের ব্যাপারে মুনাফিকদের সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। কুরআনে আল্লাহ বলছেন—

إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ

নিশ্চয় যারা এই অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল।[১]

এটা যে একটি অপবাদ, কুৎসা এবং জিঘাংসা, সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছেন। এভাবেই তো আল্লাহ তার মুমিন ব্যক্তিদের সাহায্য করে থাকেন। কখনো স্পষ্ট সাহায্য, আবার কখনো-বা অস্পষ্ট সাহায্য।

জীবনে আপনিও আপনার চারপাশে একটি দল পাবেন যারা সর্বদা আপনার সমালোচনায় মুখর থাকবে। গভীর পর্যবেক্ষণের দ্বারা আপনার ভালো কাজটির খুঁত বের করবে। আপনার ত্রুটিযুক্ত কাজটিকে ফলাও করে প্রচার করে বেড়াবে যাতে আপনাকে মানসিকভাবে ভেঙে দেওয়া যায়। যাতে আপনি হতাশ হয়ে পড়েন। আপনার মন যাতে বিষিয়ে ওঠে। এ সবকিছুই তারা আপনার প্রতি হিংসা, ঈর্ষা আর জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে করে থাকে; কারণ, আপনার অবস্থান তাদের পীড়া দেয়। আপনার গ্রহণযোগ্যতা তাদের মনে বিষাক্ত ফলার মতো আঘাত করে। আপনাকে আপনার অবস্থান থেকে নামিয়ে আনার চিন্তায় তারা সদা বিভোর থাকে—কীভাবে অন্যদের চোখে আপনাকে খাটো করা যায়, কীভাবে অন্যদের মনে আপনার ব্যাপারে সন্দেহের বীজ বুনে দেওয়া যায়।

এদের ব্যাপারে কখনোই হতাশ হবেন না। এদের কথায় মন খারাপ করবেন না। ভেঙে পড়বেন না। হতোদ্যম হবেন না। এদের কথা কিংবা বক্তব্যের বিপরীতে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না। শুধু সবর করবেন। আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাদের ক্ষমা করে দেবেন। নিজের এবং তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন। ব্যস! আপনার কাজ কেবল এতটুকুই। এ রকম অবান্তর সমালোচনায় পতিত হলে নিজের সাথে কথা বলুন। ভেবে দেখুন তো, আপনার ইখলাস আর নিয়ত আপনার কাছে পরিশুদ্ধ মনে হয় কি না? যদি অন্তরের ভেতর থেকে এই কথা প্রতিধ্বনিত হয় যে, 'আমি তো এই কাজ আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্যই করেছি', তাহলে

[১] সুরা নুর, আয়াত : ১১

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

নিশ্চিন্ত মনে আপনার পরবর্তী কাজে মনোযোগ দিন। এ রকম বিশুদ্ধ নিয়তের কারণে ভুল কাজটার জন্যও আপনার আমলনামায় হয়তো সাওয়াব যোগ হয়ে গেছে।

মন খারাপের দিনগুলোতে আল্লাহর সাথে বেশি বেশি কথা বলুন—কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে, সালাতের সিজদার মধ্যে। আল্লাহকে বলুন তিনি যেন আপনার অশান্ত মনটাকে প্রশান্ত করে দেন। তাঁকে অনুনয়-বিনয় করে বলুন, বুকের মধ্যে যে কালবৈশাখী ঝড় আপনার মনের উঠোনটাকে তছনছ করে দিচ্ছে, সেই কালবৈশাখী তিনি যেন থামিয়ে দেন। সেখানে যেন রহমতের বারিধারা প্লাবিত হয়। একটিবার নিজের জীবনে কুরআনকে জায়গা করে দিন। দেখবেন, জীবনের গতিপথ কীভাবে পাল্টে যায়। কুরআনের সারনির্যাসকে একবার নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেই দেখুন না। দেখবেন আপনার জীবনটা অন্য রকম এক শীতলতায় ভরে উঠেছে। দুনিয়ার মানুষ যে অন্তর ভেঙে দেয়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই অন্তর ভালোবাসার প্রলেপে জোড়া লাগিয়ে দেন।

আপনার মনে হচ্ছে, আপনি ব্যর্থ হয়ে গেছেন, তাই না? মনে হচ্ছে, পৃথিবীটা আপনার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে। জীবনের কোনো মানে খুঁজে না পেয়ে হতাশায় নিমজ্জিত আপনার তনুমন, এই তো? কুরআন খুলুন। দেখুন আপনার রব আপনার জন্যই বলছেন—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

অবশ্যই বিশ্বাসীরা সফল হয়েছে।[১]

আপনি একজন মুমিন। একজন বিশ্বাসী। একজন তাকওয়াবান। আপনি তো হতাশ হতে পারেন না। আল্লাহর দয়া থেকে, তাঁর করুণা, ভালোবাসা এবং রহমতের যে বারিধারা আপনার ওপর বর্ষিত হচ্ছে, তা থেকে আপনি কীভাবে নিরাশ হবেন? দুনিয়াবি ব্যর্থতা, অসফলতায় আপনার কী আসে যায়, বলুন? আল্লাহর ওপর যারা ভরসা করে, নির্ভর করে, তারা হতাশ হয় না। দুনিয়ার ব্যর্থতা তাদের আঘাত দেয় না। তারা বরং অপেক্ষার প্রহর গোনে মহাসাফল্যের। সেই সাফল্যের, যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন স্বয়ং রাব্বুল আলামিন। আপনার হৃদয় যখন আল্লাহর ওপর ভরসায় টইটম্বুর, তখন সিজদায় যাকারিয়া আলাইহিস সালামের মতো করে বলুন—

[১] সুরা মুমিনুন, আয়াত : ০১

وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

হে আমার রব! আমি তো কখনো তোমাকে ডেকে ব্যর্থ হইনি।[১]

আপনার জীবনে অনেক দুঃখ আসতে পারে। আপনি মুখোমুখি হতে পারেন নানান ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ঝড়ের। কোনো কোনো ঝড়ো হাওয়া এসে আপনার জীবনটাকে এলোমেলো করে দিয়ে যাবে। অস্ফুট স্বরে মহান রবকে যখন বলেন, 'মালিক! আমার জীবনে এত কষ্ট কেন?' তিনি তখন বলেন—

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি।[২]

এমন কঠিনতর বিপদে আশেপাশে কাউকে পাচ্ছেন না। এমনকি অন্ধকারে আপন ছায়াটাও মিলিয়ে যায়। আপনার এতদিনের সুহৃদ, প্রিয় বন্ধু, প্রিয় স্বজনদের কেউই এই দুর্দিনে আপনার পাশে নেই। নিজেকে খুব একা মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, অকূল দরিয়ায় একটি ডুবুডুবু নৌকার আপনি একাই যাত্রী। এই নৌকা যেকোনো মুহূর্তেই তলিয়ে যাবে। এমন সময়ে আপনি যখন আশাহত হয়ে রবের কাছে ফরিয়াদ করে বলেন, 'মাবুদ! আজকে আমাকে সাহায্য করার মতন কেউই নেই।' তখন আপনার রব বলেন—

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।[৩]

প্রিয়জনেরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দূরে চলে গেছে। জীবন নামক চোরাবালির সাথে আপনি আর কোনোভাবেই পেরে উঠছেন না। খুব অসহায়বোধ করছেন। মনে হচ্ছে, আপনি এক্ষুনি ডুবে যাবেন দুঃখের অতল গহ্বরে। হারিয়ে যাবেন চিরতরে। তখন

[১] সুরা মারইয়াম, আয়াত : ০৪

[২] সুরা ইনশিরাহ, আয়াত : ০৬

[৩] সুরা রুম, আয়াত : ৪৭

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

যদি মুখ ফুটে বলেন, 'আল্লাহ! আমার পাশে আজ কেউই আর অবশিষ্ট নেই।' তখন আপনার ডাক শুনে আল্লাহ বলেন—

لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

ভয় পেয়ো না! আমি তোমাদের সাথেই আছি। আমি সব শুনি এবং দেখি।[১]

পাপে জর্জরিত হয়ে আছে জীবন। চোখ মেললেই চারদিকে কেবল অন্ধকারের ঘনঘটা দেখতে পান। কলুষিত হৃদয় নিয়ে যখনই আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমি যে এত পাপ করেছি, আল্লাহ কি সত্যিই আমাকে ক্ষমা করবেন?' তখনই আপনার রব জবাব দেন—

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন।[২]

এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রতিটি সময়ে, প্রতিটি মুহূর্তে আপনার পাশে থাকেন। আল্লাহর কালামকে, তাঁর বাণীকে জীবনে ধারণ করুন। আল্লাহকে জীবনে বন্ধু বানিয়ে নিন। বিশ্বাস করুন, বন্ধু হিশেবে তাঁর চেয়ে উত্তম, তাঁর চেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল, তাঁর চেয়ে মহান আর কেউ হতেই পারে না। নিজের জীবনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে আলোর রেখা প্রবেশ করতে দিন। অন্ধকারকে আলো দ্বারা দূরীভূত করুন। আপনার যে পৃথিবী এতদিন এক ঘনঘোর আঁধারে নিমজ্জিত ছিল তা উদ্ভাসিত হবে সম্পূর্ণ নতুন এক রূপে। নতুন এক রঙে। মন খারাপের দিনগুলোতে আল্লাহকে আপনার সঙ্গী বানান, দেখবেন সে মুহূর্তগুলো সব আচমকা আপনার জীবনের সেরা মুহূর্তে পরিণত হয়ে গেছে। তাই যে দুঃখগুলোর কথা কাউকে বলতে পারছেন না, যে দুশ্চিন্তার অনলে আপনি দগ্ধ হচ্ছেন প্রতিদিন, যে ভয় আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে অহরহ, হারানোর যে বেদনা আপনাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, যে অস্থিরতা আপনাকে ঘুমোতে দিচ্ছে না, যে ভগ্নহৃদয় আপনাকে ভেঙে

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ৪৬

খানখান করে দিচ্ছে, সে সমস্ত মন খারাপের গল্পে কেবল বলুন, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল।' আমার জন্য আমার আল্লাহই যথেষ্ট। বিশ্বাস করুন, আপনার সমস্ত মনখারাপের উপশমের জন্য কেবল এটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহ যার অভিভাবক, কপালে তার দুশ্চিন্তার ভাঁজ থাকতেই পারে না।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আমার এত দুঃখ কেন?

[ক]

মাঝে মাঝে ভীষণ কষ্ট লাগে। বুকের ভেতরে বাসা বাঁধে দুঃখের কালো মেঘ। অবিরাম বৃষ্টিরধারার মতো বিষণ্ণতা এসে আছড়ে পড়ে মনের উঠোনে। আকাশছোঁয়া হিমালয় যেন তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে ভেঙে পড়তে চায় বুকের ওপর। জগৎসংসার তখন বিষাক্ত লাগে।

মাঝে মাঝে প্রচণ্ড দুঃখবোধে ভেঙে পড়ি আমরা। হয়তো হঠাৎ করে হারিয়ে বসি কোনো প্রিয় মানুষকে। খুব আশা করে থাকি এবারের পৌষের শীতে মায়ের হাতে বানানো ধোঁয়া ওঠা ভাপা পিঠা খাব বলে। কিন্তু পৌষ আসার আগেই মা হয়তো দুনিয়ার পাঠ চুকিয়ে ওপারে পাড়ি জমিয়েছেন। অথবা, আস্তে আস্তে করে জমানো টাকা, যে টাকা দিয়ে বাবাকে ঈদে উপহার দিয়ে চমকে দেবো ভেবেছিলাম, ঈদ আসার আগেই হয়তো বাবা চলে গেছেন রবের সাক্ষাতে।

এমনও হতে পারে, ভালো বেতনের কোনো চাকরি হঠাৎ করেই চলে গেল। অথবা, আমার এক বন্ধু আমার সমান যোগ্যতা নিয়ে জীবনে সাঁই সাঁই করে উন্নতি করছে, কিন্তু আমি কিছুই করতে পারছি না। আমার বন্ধু আমার সমান খাটা-খাটুনি করে খুব ভালো রেজাল্ট করছে, কিন্তু আমি পারছি না।

পারিবারিক অথবা দাম্পত্য জীবনটাও খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। ব্যবসায় লোকসান হচ্ছে। খেতে নষ্ট হচ্ছে ফসল। উর্বরতা হারাচ্ছে আবাদি জমি। মরে যাচ্ছে গবাদি

পশু। বন্যায় ভেসে গেছে একমাত্র আশ্রয়। অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে তিলে তিলে জমানো সম্পদ। মাথার ওপর বেড়েই চলেছে ঋণের বোঝা। আবার, এমনও হতে পারে, কাছের মানুষগুলো আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুটিও আজ আর ফিরে তাকাচ্ছে না। বাড়ছে দূরত্ব। ভেঙে যাচ্ছে সম্পর্কের বন্ধন।

এমন নানান রকম জীবন সমস্যার মুখোমুখি কমবেশি আমরা সকলেই হয়ে থাকি। আমরা ভেঙে পড়ি। ভেতরে ভেতরে গুঁড়িয়ে যাই। আশাহত হই। বিষণ্ণতার বিষবাষ্পে ছেঁয়ে যায় আমাদের হৃদয়কোণ। কিন্তু আমাদের সাথে কেন এমনটা হয়?

[খ]

আমরা সকলেই 'পরীক্ষা' শব্দটির সাথে পরিচিত। স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিগুলোতে আমরা পরীক্ষা দিই। পরীক্ষায় পাশের জন্য আমরা দিনরাত পড়াশুনা করি। নোট করি। নিয়মিত ক্লাস করি। দুনিয়ার জীবনটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য ঠিক সে রকম একটা পরীক্ষা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্যই। আমরা তাঁর অনুগত বান্দা কি না তা যাচাইয়ের জন্য। নাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবশ্যই এই যাচাই-বাছাইয়ের ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল নন। তিনি আলিমুল গায়েব। ভূত-ভবিষ্যৎ সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি জানেন আমাদের মধ্যে কে কে তাঁর অনুগত আর কে কে তাঁর অবাধ্য। চাইলেই তিনি আমাদের দুনিয়াতে না পাঠিয়ে সরাসরি আমাদের রূহ তথা আত্মাগুলোকে হয় জান্নাতে আর না হয় জাহান্নামে দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এমনটি করেননি। কারণ, তিনি আমাদের কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে চাননি। কী রকম প্রশ্ন? কিয়ামতের মাঠে যাতে আমরা অভিযোগ করে বলতে না পারি, 'আপনি আমাদের তো পরীক্ষাই করেননি। পরীক্ষা ছাড়াই আমাদের জাহান্নামে পাঠিয়েছেন। অথচ আমার পরীক্ষা নিলে আজকে আমি জাহান্নামের বদলে জান্নাতে থাকতে পারতাম!'

দুনিয়াকে আল্লাহ তাআলা বানিয়েছেন বিশাল একটা পরীক্ষাকেন্দ্র। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে বলছেন—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা এবং (তোমাদের) জানমাল ও ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে। আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন।[১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের পরীক্ষা করবেন ভয়ভীতি দিয়ে। কখনো কি এমন হয়েছে যে, আপনি বাসে করে কোথাও যাচ্ছেন এবং সেই বাসটা হঠাৎ করে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল? সেই দুর্ঘটনায় মারা গেছে আপনার পাশের যাত্রীটা, কিন্তু আপনার তেমন কোনো ক্ষতিই হয়নি। হয়েছে এ রকম?

দূরের যাত্রার বিরক্তি কাটাতে একটু আগেও দুজনে পাশাপাশি দিব্যি খোশগল্প করছিলেন। কিন্তু কয়েক মিনিটের ব্যবধানেই আপনার পাশের সেই সহযাত্রী এখন মৃত আর আপনি জীবিত রয়ে গেলেন। এই দুর্ঘটনায় কিন্তু আপনারও মৃত্যু হতে পারত। পাশের সহযাত্রীর মতো আপনিও কিন্তু লাশে পরিণত হতে পারতেন। আপনার নামের পাশে 'আহত' শব্দের বদলে শোভা পেত 'নিহত' শব্দটি। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন। চাক্ষুষ এই ভয়ানক দৃশ্য অবলোকন করিয়ে আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষা করেন। তিনি দেখতে চান যে, আপনি এই দৃশ্য থেকে শিক্ষা নেন কি না। তাঁর শোকর আদায় করেন কি না। তার অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসেন কি না। তিনি দেখতে চান, এই মৃত্যুর দৃশ্যটা আপনার হৃদয়ে কতটা প্রভাব ফেলে। আপনার বোধোদয় ঘটে কি না। এ রকম বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে আপনি মৃত্যুভয়ে কাতর হয়ে পড়েন কি না—সেটাই হলো আপনার জন্য পরীক্ষা।

জীবনে এমন আরও বহু ঘটনার সাক্ষী আপনি হতে পারেন। লন্ডনে যাওয়ার জন্য আপনি বুধবার সকালের বিমানের টিকেট চেয়েছেন, কিন্তু পেয়েছেন বুধবার বিকেলের। সকালের টিকেট না পাওয়ায় আপনার প্রচণ্ড মন খারাপ। হতে পারে সকালের টিকেট না পাওয়ায় লন্ডনে কোনো একটা পার্টিতে আপনি অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। হতে পারে ম্যানচেস্টার শহরের কোনো এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান আপনি মিস করবেন। অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু সকালের টিকেট না পাওয়াতে একরাশ দুঃখ আর মন খারাপ নিয়ে টিভি খুলে যখন দেখতে পেলেন লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সকালের নির্ধারিত সেই ফ্লাইট ক্র্যাশ করেছে এবং নিহত হয়েছে বিমানের সকল যাত্রী, তখন কেমন লাগবে

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৫

আপনার বলুন তো? মিস হয়ে যাওয়া ম্যানচেস্টারের ওই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান কি আপনার প্রাণের চেয়েও মূল্যবান? সকালের ফ্লাইট মিস হয়ে যাওয়ায় আপনার কি তখনো মন খারাপ থাকবে? আফসোস হবে?

মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য হলো সে নিজেকে সবসময় নির্ভুলতার আসনে দেখতে পছন্দ করে। সে মনে করে তার জীবনের সব ভালোমন্দ, ঠিক-বেঠিক বোঝার ব্যাপারে সে-ই যথেষ্ট। নিজের জন্য পছন্দ করা জিনিসটা কীভাবে তার জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে সেটা মানুষ ভাবতেও পারে না। আবার, এটাও মানুষ কল্পনা করতে পারে না যে, যেটা সে অপছন্দ করে, সেটা কীভাবে তার জন্য জীবনের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে উঠতে পারে। মানুষ এটা কখনোই বুঝতে পারবে না। এটা জানেন কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। কারণ, তিনিই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ব্যাপারে জ্ঞান রাখেন। এজন্যেই তিনি বলেছেন—

عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

হয়তো তোমরা যা অপছন্দ করো তা-ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর তোমরা যা পছন্দ করো, সেটা হতে পারে অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ জানেন। কিন্তু তোমরা জানো না।[১]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখতে চান, এ রকম নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আপনাকে বাঁচানোর পরেও আপনি পরের বার ম্যানচেস্টার শহরের মদের বারে যান কি না। তিনি দেখতে চান, রাত হলেই আপনি তার অবাধ্যতায় গা ভাসিয়ে কোনো নাইট ক্লাবে গিয়ে ফুর্তিতে মেতে ওঠেন কি না। এই যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে আপনার মধ্যে একটা ভয় ধরিয়ে দেওয়া, সেটাই আল্লাহর পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান এই ভয় আপনাকে কোন দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহর পথে না শয়তানের রাস্তায়?

আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করবেন ক্ষুধা-অনাহারের মাধ্যমে। এই উদাহরণের যথার্থতা উপলব্ধি করার জন্য রাস্তার একজন ভিক্ষুকের দিকে তাকান। অথবা সেই অভাবী লোকটার দিকে যে অপলক দৃষ্টিতে আপনার বার্গার খাওয়ার দৃশ্যটি

[১] সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৬

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

অবলোকন করে। খুব বেশি দূরেও যেতে হবে না—মায়ানমার থেকে আসা লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের কথা ভাবুন তো। কতটা মানবেতর তাদের জীবন! তাদের ওপর এই যে অত্যাচার, এই যে ক্ষুধার যন্ত্রণা, হতে পারে এটা তাদের জন্য পরীক্ষা।

বন্যায় ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়াটা একজন কৃষকের জন্য পরীক্ষা হতে পারে। আগুন লেগে ফ্যাক্টরি পুড়ে যাওয়াটা একজন ব্যবসায়ীর জন্য পরীক্ষা হতে পারে। মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান কিংবা কাছের কেউ মারা যাওয়া-সহ নানানভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের পরীক্ষা করতে পারেন। রোগ-শোক, জরা-ক্লিষ্টতা ইত্যাদি হতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।

[গ]

ছোটবেলায় হাটে গেলে ঢু মেরে আসতাম কামারের দোকানে। দেখতাম লোহাকে কীভাবে কড়া আগুনে পুড়িয়ে পিটানো হতো। ভয় পেতাম। মনে হতো, এই লোহাগুলোকে যে এভাবে পোড়াচ্ছে, এগুলো তো ছাই হয়ে যাবে। আস্তে আস্তে বুঝলাম যে লোহাকে এভাবে পোড়ালে আসলে ছাই হয় না; বরং লোহা আরও মজবুত এবং ব্যবহার উপযোগী হয়ে ওঠে। আগুনের 'পোড়ানো' ধর্ম আর লোহার 'বস্তু' ধর্ম মাথায় নিয়ে আগুন এবং লোহার মধ্যকার এই যোগসূত্র বুঝতে আমার অনেক দিন লেগেছিল।

'পরীক্ষা' হিশেবে জীবনের এই যে নানামুখী সমস্যা ও সংকট, এগুলো হলো আগুনের মতো। আর বান্দাকে তুলনা করা যায় লোহার সাথে। আগুন আর লোহার সম্পর্ক যেমন পুড়িয়ে নিঃশেষ বা ধ্বংস করে ফেলা নয়, বরং সুন্দর ও উপকারী কিছু তৈরি করা, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এই পরীক্ষাগুলোও বান্দার জন্য খারাপ কিছু নয়, বরঞ্চ বান্দাকে পরিশুদ্ধ করে তোলাই আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরই বেশি পরীক্ষা করেন। আল্লাহ যদি চান যে তাঁর কোনো বান্দা শুদ্ধ আর শুভ্রতার স্পর্শে পবিত্র হয়ে উঠুক, তখন তিনি সেই বান্দার বেশি বেশি পরীক্ষা নেন।

নবি-রাসুলদের জীবনের দিকে তাকালেই আমরা এর সত্যতা দেখতে পাই। সম্ভবত আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবি-রাসুল দুনিয়ায় প্রেরণ করেননি, যাকে কঠিন পরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে হয়নি। শিশু মুসা আলাইহিস সালামকে তো শত্রুর ভয়ে বাক্সে ভরে দরিয়ায় নিক্ষেপ করতে হয়েছিল। বড় হয়ে ওঠার পরেও কি তাকে কম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে? ফিরাউনের মুখোমুখি হওয়া থেকে শুরু করে গভীর সংকট মাথায় নিয়ে লোহিত সাগর পার হওয়া। আহ! কতই-না সংকটাপন্ন মুহূর্ত ছিল সেগুলো!

নবি আইয়ুব আলাইহিস সালাম। শেষ বয়সে এসে আল্লাহর পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে গেলেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে একে একে হারাতে লাগলেন ধনসম্পদ, জমিজমা সবকিছু। এমনকি, নিজের ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজন সকলে তার এই দুরবস্থা দেখে তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। তাকে ছেড়ে যায়নি কেবল তার পুণ্যবতী স্ত্রী।[১] চিন্তা করুন, আপনার ভীষণ বিপদের সময়ে, ঘোরতর সংকটে আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষগুলো যদি আপনাকে ছেড়ে চলে যায়, কেমন লাগবে আপনার? এজন্যেই দুনিয়ার সম্পর্কগুলোতে এমনভাবে জড়াতে নেই যা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয়। দুনিয়াবি সম্পর্কের মোহে যদি আপনি আখিরাতকে কম গুরুত্ব দেন, তাহলে আপনার বিপদের দিন যখন এই সম্পর্কগুলো ধীরে ধীরে দূরে সরে যাবে, তখন কিন্তু দুনিয়াটাই আপনার কাছে বিস্বাদ লাগবে। আত্মহত্যা করতে মন চাইবে।

এ রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তাকে। নুহ আলাইহিস সালামের ওপরে তার কওমের অত্যাচার এবং অবাধ্যতার মাত্রা এতই ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যে, তাদের হাত থেকে নুহ আলাইহিস সালামকে বাঁচানোর জন্যে পুরো কওমকেই আল্লাহ তাআলা বন্যার পানিতে তলিয়ে দিয়েছিলেন।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবনের দিকেই তাকান। খুব ছোটবেলায় ভাইয়েরা শত্রুতা করে তাকে কূপে নিক্ষেপ করে। এরপর মিশরের রাজার কাছে গিয়েও বারে বারে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। কারাগারে পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে ঈসা আলাইহিস সালামকে তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমানেই তুলে নিয়েছেন। আর সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহর কতই-না উত্তম বান্দা আর রাসুল ছিলেন তিনি! জন্মের ঠিক আগেই বাবাকে হারিয়েছেন। দুনিয়াকে বুঝতে শেখার আগে হারিয়েছেন গর্ভধারিণী মাকে। যে প্রিয়তম চাচার কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন, একসময় তিনিও একা করে চলে যান। চোখের সামনে সন্তানদের মৃত্যু, প্রিয়তমা স্ত্রীর মৃত্যু—জীবনের চিত্রনাট্যে হারাবার আর বাকি থাকলই-বা কী? দ্বীনের দাওয়াত শুরু করার পরে তায়েফবাসীর নির্লজ্জ আঘাত, নিজ কওম দ্বারা দেশছাড়া-সহ এহেন অত্যাচার নেই যা তার ওপরে আরোপ করা হয়নি।

---

[১] *তাফসির ইবনু আবি হাতিম* : ১৪৫৬২; *ফাতহুল বারি*, খণ্ড : ৬; পৃষ্ঠা : ৪২১; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ২৮৯৮; *সিলসিলাতুল আহাদি সিস সহিহাহ* : ১৭

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

এই যে নবি-রাসুলদের জীবনে আরোপিত সমস্যা, নেমে আসা বিপদ, নিপতিত হওয়া সংকট—এসব কেন ছিল? তারা তো নিষ্পাপ ছিলেন। কোনো পাপ, কোনো অন্যায় তাদের স্পর্শ করতে পারত না। তারপরও কেন তাদের জীবন ছিল দুর্ভোগময়? কেন তাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে সবচেয়ে কঠিন সব পরীক্ষার? এগুলো এজন্যেই যে আল্লাহ তাদেরও পরীক্ষা করেছেন। বিপদের মুখে, সংকটের সামনে তারা আল্লাহর ওপর কতখানি ভরসা করেন তা-ই ছিল দেখার বিষয়।

আমাদের শেখানোর জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবি-রাসুলদের জীবন থেকে এই ঘটনাগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কঠিন, দুর্ভোগ-দুর্যোগ আর সংকটের সময়ে তারা আল্লাহকে কীভাবে আঁকড়ে ধরে ছিলেন, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্যেই কুরআনুল কারিমে এই ঘটনাগুলোকে তিনি স্থান দিয়েছেন।

আমাদের জীবনেও এ রকম নানান পরীক্ষা নেমে আসতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়। ভিন্ন ভিন্ন রূপে। জীবনের এ রকম মুহূর্তগুলোকে আল্লাহর পরীক্ষা হিশেবে বরণ করে নেওয়াই হলো একজন প্রকৃত মুমিনের কাজ।

[ঘ]

আমরা জেনে গেছি কেন আমাদের জীবনে দুর্যোগ নেমে আসে। কেন চারপাশ থেকে বিপদ আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে। কেন হুট করে আমরা প্রিয়জন, প্রিয়মুখ হারিয়ে ফেলি। কেন হতাশা গ্রাস করে ফেলে আমাদের অন্তর। এই জীবন হলো পরীক্ষাক্ষেত্র আর আমরা সবাই হলাম পরীক্ষার্থী।

তাহলে জীবন যখন এ রকম দুঃখ আর কষ্টের ভারে নুইয়ে পড়বে, যখন হৃদয় আকাশে ভর করবে কালবোশেখির ঘনকালো মেঘ, যখন হতাশার অন্ধকারে ডুবে যাবে আমাদের তনুমন, তখন আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হবে?

আপনার যখন বড় কোনো রোগ হবে, চারপাশ থেকে যখন কেবল হতাশা আর নিরাশার বাণী শুনতে পাবেন, যখন শূন্যতা ভর করবে আপনার দেহমনে, তখন আইয়ুব আলাইহিস সালামের ঘটনা মনে করবেন। মরণব্যাধি শরীর নিয়েও আল্লাহর স্মরণ থেকে তিনি এক মুহূর্তের জন্য গাফিল হননি। যখন আত্মার আত্মীয়রাও তাকে ছেড়ে চলে গেল, তিনি হতাশ হননি। এমন মুহূর্তে তিনি কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য চেয়েছেন। বলেছেন—

أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

হে আমার প্রতিপালক, দুঃখক্লেশ আমাকে স্পর্শ করেছে। আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।[১]

খেয়াল করুন, আইয়ুব আলাইহিস সালামের কথার মধ্যে কিন্তু কোনো অভিযোগ নেই, অনুযোগ নেই। নেই কোনো আত্মম্ভরিতা। কেবল আছে বিনয় আর ভরসার অনন্য সমন্বয়। তিনি বলেননি, 'হে আল্লাহ, আমি কষ্ট পাচ্ছি। আমার কষ্ট কমিয়ে দিন।' তিনি বলতে পারতেন, 'মাবুদ! রোগের কারণে আমি দ্বীনের দাওয়াত দিতে পারছি না। আমাকে আপনি আরোগ্য দিন।' তিনি এ রকম বলেননি। তিনি কেবল আল্লাহর সেই গুণের দ্বারা তাঁর প্রশংসা করেছেন, যে গুণের উল্লেখ কুরআনের একেবারে প্রথম সুরাতেই আমরা দেখতে পাই। আইয়ুব আলাইহিস সালাম বলেছেন, 'আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' আল্লাহর সিফাত তথা গুণের মধ্যে অন্যতম গুণ হলো—আল্লাহ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তার চাইতে বড় দয়ালু আসমান-জমিনে আর কেউ নেই। সুরা ফাতিহার শুরুতেই আমরা এই ঘোষণা দিয়ে থাকি। আমরা বলি, 'আর রাহমানির রাহিম' অর্থাৎ 'যিনি হলেন পরম করুণাময় আর অসীম দয়ালু।'

আইয়ুব আলাইহিস সালাম অভিযোগ না করে বরং আবদার করেছেন। একজন দাস তার মালিকের কাছে যে সুরে আবদার করে, যে সুরে অনুনয়-বিনয় করে, নবি আইয়ুব আলাইহিস সালামও ঠিক একইভাবে তার মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আবদার করেছেন। সে আবদারে ভালোবাসা ছিল, ভরসা ছিল। নির্ভরতা ছিল।

আইয়ুব আলাইহিস সালামের এই আকুল ফরিয়াদের পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার দুআ কবুল করে নিলেন। তার দুঃখ মুছে দিলেন। রোগ সারিয়ে দিলেন। আল্লাহ বললেন—

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ

অতঃপর, আমি তার আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তার সব দুঃখকষ্ট দূর করে দিলাম।[২]

[১] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৩

[২] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৪

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

যে আল্লাহ আইয়ুব আলাইহিস সালামকে আরোগ্য দিয়েছেন, তিনি কি আপনাকেও আরোগ্য দিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। কেবল আপনার অন্তরটাকে আইয়ুব আলাইহিস সালামের অন্তরের মতন পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করুন। আপনার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ওই নির্ভরতা রাখুন, যে নির্ভরতা আইয়ুব আলাইহিস সালামের অন্তরে ছিল। এরপর আল্লাহর কাছে আকুল ফরিয়াদ করুন। মন খুলে আপনার কথা আপনার রবকে শোনান।

বড় কোনো বিপদে পড়ে গেলে একদম হতাশ হবেন না। ভেঙে পড়বেন না। আপনার ওপর আরোপিত বিপদ নিশ্চয়ই ইউনুস আলাইহিস সালামের বিপদের চেয়ে গুরুতর নয়। স্মরণ করুন ইউনুস আলাইহিস সালামের কথা। সমুদ্রের মাছ যখন তাকে গিলে ফেলল, কেমন সংকটাপন্ন ছিল সেই মুহূর্তগুলো? চারদিকে কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। একটা ড্রামের ভেতরে চাপা পড়লেই যেখানে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসবে, সেখানে একটা মাছের পেটে তিনি বেঁচে থাকলেন কীভাবে? কে তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন? আল্লাহ ছাড়া কার ক্ষমতা আছে মাছের পেটে নবি ইউনুস আলাইহিস সালামের জন্য অক্সিজেন পাঠাবে?

আপনি কি জানেন এ রকম বিপদে পড়ে নবি ইউনুস আলাইহিস সালাম কেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন? তিনি কি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন? ভেঙে পড়েছিলেন? নিশ্চিত মৃত্যু জেনে হাত-পা গুটিয়ে বসে ছিলেন? তিনি কি আল্লাহকে বলেছেন, 'আল্লাহ, আমাকে তো নবি হিশেবে পাঠিয়েছেন আপনি। আমি তো আপনারই কাজ করি। তাহলে আমার ওপরে কেন এই বিপদ নেমে এলো? কেন এত কঠিন শাস্তি আমার জন্য?'

নাহ। তার প্রতিক্রিয়া এ রকম ছিল না। মাছের পেটে বন্দি হওয়ার পরেও তিনি এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর ওপর থেকে ভরসা হারাননি। ভেঙে পড়েননি। আশা ছেড়ে দেননি। তিনি খুব সুন্দর পন্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করেছিলেন। মাছের পেটে বন্দি হওয়ার পরে তিনি যে দুআটি পড়েছিলেন, সেটাকে আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্থান দিয়েছেন। সেই দুআ কমবেশি আমরা সকলেই জানি।

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায-যালিমীন।

বেশ অদ্ভুত রকম সুন্দর এই দুআটি! সাধারণত বিপদে পড়লে আমরা খুব ঘাবড়ে যাই, নার্ভাস হয়ে পড়ি। হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়ি। অথচ ইউনুস

আলাইহিস সালামের বিপদের তুলনায় আমাদের বিপদ তো কিছুই না। সমুদ্রের রাক্ষস মাছের পেটের ভেতরে চলে যাওয়ার মতন সংকট পৃথিবীতে আর কী হতে পারে? এমন অবস্থায় পতিত হয়েও আল্লাহর নবি ইউনুস আলাইহিস সালাম যে ধৈর্য আর ঈমানের প্রমাণ দিয়েছেন তা অবিশ্বাস্য!

এ রকম ঘোরতর বিপদের সময়েও তিনি একত্ববাদের আহ্বান ভুলে যাননি। তিনি বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা'—আপনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই।

কঠিন বিপদ। চারদিকে ঘনকালো অন্ধকার। কোথাও আলোর লেশমাত্র নেই। এমন অবস্থাতেও তিনি বললেন, 'ওগো মাবুদ! তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, যে আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে। কারও ক্ষমতা নেই আমাকে এখান থেকে বাঁচিয়ে নেওয়ার।'

দুআর মধ্যে এই কথাটা বলে শুরুতেই তিনি ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতিটাই প্রদান করেছেন। জগতের সকল অসত্য মাবুদ, অসত্য ইলাহর কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে তিনি এক সত্য ইলাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন।

এই ঘোষণার পরে তিনি বলেছেন, সুবহানাকা। অর্থাৎ আপনি পবিত্র।

কী চমৎকার কথা! নিকষকালো অন্ধকারের মধ্যে নিজের হাত নিজে দেখতে পাচ্ছেন না। মৃত্যু একেবারে সন্নিকটে। এমন অবস্থাতেও তিনি আল্লাহর গুণগান গেয়ে বলছেন, 'হে আমার রব! আপনি তো পবিত্র।'

কোনো বিপদে পড়লে আমরা তো ফরয সালাতটুকু পর্যন্ত কাযা করে ফেলি। আল্লাহর গুণগান গাওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু দেখুন, এমন ঘোরতর বিপদেও নবি ইউনুস আলাইহিস সালাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা, তাঁর স্তুতি, তাঁর যিকির করতে ভোলেননি।

এর পরের অংশে আল্লাহর নবি ইউনুস আলাইহিস সালাম বলেছেন, ইন্নি কুন্তু মিনায-যালিমীন। অর্থাৎ নিশ্চয় আমি ছিলাম জালিম।

বিপদে পড়লে আমরা সাধারণত হাঁ-হুতাশ করি। বিলাপ করি আর বলি, 'কী এমন অপরাধ করেছি যে, আল্লাহ আমার সাথে এমনটা করছেন? কেন আমাকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছেন? Why always me? Why?'

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

অথচ, আল্লাহর নবি ইউনুস আলাইহিস সালামের সে রকম কোনো অভিযোগ, অনুযোগ বা আপত্তি ছিল না। তিনি অভিযোগের সুরে বলেননি, 'ওগো আল্লাহ! কেন আপনি আমাকে এ রকম কঠিন বিপদে নিপতিত করলেন? কী ছিল আমার অপরাধ?' বরং তিনি বলেছেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আপনি হলেন পবিত্র! আর আমি হলাম জালিম। আমিই অন্যায় করেছি। সব দোষ আমার।'[১]

তিনি দোষ স্বীকার করলেন। নিজের অন্যায় মাথা পেতে নিলেন। তবে তার আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে সকল দোষ, সকল ত্রুটি আর সকল ভ্রান্তির উর্ধ্বে ঘোষণা করলেন। প্রতিউত্তরে আল্লাহ বললেন—

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ

অতঃপর আমি তার সেই আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। এভাবেই আমি মুমিনদের রক্ষা করি।[২]

বিপদে পড়লে আমাদের উচিত ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহর প্রতি অভিযোগ না এনে নিজের ভুল স্বীকার করা। এরপর সর্বোত্তম উপায়ে আল্লাহর কাছে দুআ করা।

কুরআনে নবি-রাসুলদের এ রকম আরও বেশ কিছু দুআ আছে যেখানে তাদের সর্বোচ্চ ধৈর্য, তাকওয়া আর ঈমানের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিপদের সময় তারা কখনো ভেঙে পড়তেন না। নিরাশ হতেন না। জীবনে বিপদ আপদের সম্মুখীন হলে আমাদেরও উচিত ভেঙে না পড়া। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করা। বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করা। কেবল তাঁর কাছেই সাহায্য চাওয়া। বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের দুআ শোনেন এবং তিনি অবশ্যই আমাদের রক্ষা করবেন।

[১] ধারণাটি শাইখ উমার সুলাইমানের *In the darkest night* লেকচার থেকে পাওয়া।

[২] সুরা আম্বিয়া, আয়াত : ৮৮

বলো, সুখ কোথা পাই

[ক]

সুখ কী?—এই প্রশ্নটা মানুষের সুপ্রাচীনকালের। সুখের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে কতশত রকমের তথ্য আর তত্ত্ব মানুষ যুগে যুগে দাঁড় করিয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সুখকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য মানুষ কখনো আশ্রয় নিয়েছে দর্শনের, কখনো বিজ্ঞানের। কখনো সে বস্তুবাদের চাকচিক্যময় বিলাসিতাকেই মনে করেছে সুখের অন্তর্নিহিত রহস্য। আবার কেউ কেউ একান্ত স্রষ্টার মাঝে নিজেকে সঁপে দেওয়ার মধ্যেই খুঁজে নিয়েছে নিজের সুখ। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, সুখ আসলে কী?

আধুনিক বিজ্ঞান যখন তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে, রহস্যাবৃত জিনিসগুলো যখন মানুষ জেনে নিচ্ছে একের পর এক, যখন শহরগুলো ভরে উঠছে ইট-পাথরের ইমারতে, যখন বন-জঙ্গল উধাও হয়ে কল-কারখানায় ছেয়ে যাচ্ছে বিরান ভূমি, তখন একদল লোক এসে আমাদের জানাল—সুখ আসলে ভোগে। এই দুনিয়াকে উপভোগ করার মধ্যেই আছে সুখ। যার বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, যশ-খ্যাতি আছে, আছে আমোদ-ফুর্তির জন্য বর্ণাঢ্য সকল আয়োজনের সামর্থ্য—জগতে সে-ই হলো সুখী। তারা হ্যামিলনের বংশীবাদকের মতো আমাদের এমন পার্থিব সুখের দিকে আহ্বান করতে লাগল। তাদের বাঁশির মধুর সুরে দুলে উঠল আমাদের মন। তারা আমাদের বোঝাতে সক্ষম হলো যে, এই জীবনটাই শেষ। মৃত্যুই সবকিছুর সমাপ্তি। এরপর আর কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু না। কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার। সুতরাং, এই জীবনকে যে যত বেশি উপভোগ করতে পারবে, সে তত বেশি সুখী মানুষ।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আমরা শুনলাম। এরপর সুখী মানুষ হবার জন্য নেমে পড়লাম একটা দুরন্ত প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতা বড় হবার প্রতিযোগিতা। কাকে ছাড়িয়ে কে বড় হব। কাকে ছাপিয়ে কে এগিয়ে যাব। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নির্ধারিত হলো। কাড়ি কাড়ি টাকায় আমাদের ব্যাংক ভরতি থাকতে হবে। আমার নিজস্ব গাড়ি থাকতে হবে, বাড়ি থাকতে হবে। আমাকে জৈবিক সুখ দেওয়ার জন্য একদল সুন্দরী রমণী থাকতে হবে। যশ-খ্যাতি তো অবশ্যই থাকা চাই। মিডিয়াতে আমি হব 'টক অব দ্য টাউন', পত্রিকার 'টক অব দ্য ডে'। আমাকে নিয়ে ফিচার হবে, প্রদর্শনী হবে। আমাকে একনজর দেখার জন্য, আমার একটা অটোগ্রাফের জন্য মানুষ দীর্ঘ সারিতে দাঁড়িয়ে থাকবে, তবেই-না আমি সুখী মানুষ!

কর্পোরেট দুনিয়ায় খ্যাতিই সবকিছু। যার খ্যাতি নেই, সে সুখী নয়। সুখী হতে হলে তাকে খ্যাতি অর্জন করতে হবে। কিছুদিন আগে একটা গুঞ্জন চাউর হয়েছিল জোরেশোরেই। হলিউডের এক অভিনেত্রী তার যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। অভিনয় জগতে 'খ্যাতির' জন্য তাকে পর্দার পেছনের এবং সামনের পুরুষদের বিছানায় সঙ্গ দিতে হয়েছে। হতে হয়েছে অনেকগুলো পুরুষের উপভোগের বস্তু। খ্যাতির তাড়না আর মোহে অন্ধ এই অভিনেত্রী হ্যামিলনের সেই বংশীবাদকদের সুরে নিজেকে একাত্ম করে রেখেছিল। ভেবেছিল, এতেই বুঝি সুখ। এতেই বুঝি জীবনের সকল প্রাপ্তি। সেই প্রাপ্তি আর সুখলাভের আশায় বিলিয়েছে নিজের সর্বস্ব। হয়েছে পুরুষদের বিছানার সামগ্রী। যখন তার হুঁশ ফিরল, যখন বুঝতে পারল যে, এটা আসলে সুখ নয়, মরীচিকা—তখন সে সোচ্চার হলো, প্রতিবাদ জানাল। টুইটারে লিখল—'If you've been sexually harassed or assaulted, write 'me too' as a reply to this tweet'. দেখা গেল, এই টুইটের প্রতিউত্তরে হাজার হাজার টুইট আসতে লাগল। স্বপ্নিল বলিউড আর হলিউডের হাজার হাজার অভিনেত্রী সেই টুইটের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে 'Me Too' লিখে প্রতিবাদ জানাল। অর্থাৎ তারাও তাদের সেই 'সুখের দুনিয়ায়' কোনো-না-কোনভাবে যৌন নির্যাতনের শিকার। যেই খ্যাতি আর সুখের জন্য মেয়েগুলো নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছিল পার্থিবতা লাভের মধ্যে, সেই সুখ অর্জন করতে গিয়ে নিজেকে বিকিয়ে বসা সেই অভিনেত্রীরা বুঝেছিল, চোখ ধাঁধানো এই কর্পোরেট দুনিয়া আসলে আস্ত একখণ্ড নরক।

[খ]

মিডিয়া আমাদের সামনে যাদেরকে সুখী হিশেবে উপস্থাপন করে, মাঝে মাঝে আমরা তাদের কিছু করুণ পরিণতির গল্প শুনি। লিনকিন পার্কের সেই বিখ্যাত গায়কের কথা মনে আছে? অসম্ভব খ্যাতিতে রাঙানো ছিল যার ক্যারিয়ার। কী পায়নি লোকটা জীবনে? টাকা, গ্ল্যামার, চাকচিক্যময় জীবন! সবকিছু! তবু কেন তাকে আত্মহত্যা করতে হলো? এই তো সেদিন শুনলাম পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত কমেডি শো 'মিরাক্কেল'-এর সঞ্চালক মীর আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন। একবার কিংবা দুবার নয়, এই পর্যন্ত চার-চারবার নাকি আত্মহননের পথে পা বাড়িয়েছিলেন মীর। কী অদ্ভুত, তাই না? বস্তুবাদী দুনিয়া আমাদের যা দিয়ে সুখী করতে চায়, যা লাভে সুখী হতে বলে তার সবটাই তো এদের আছে। তবু এরা কেন যেন সুখী নয়। এদের জীবনের কোথাও যেন অসুখী হবার ভীষণ অসুখ।

কয়েকদিন আগে বলিউডের এক উঠতি নায়িকার ঘটনায় মুখর ছিল সোশ্যাল মিডিয়া। অভিনয় জীবনের শুরুতেই তাক লাগিয়ে দেওয়া এই নায়িকা জানিয়েছেন তিনি ভালো নেই। তার খ্যাতি, বিত্ত-বৈভব কিংবা কর্পোরেট মুগ্ধতার কোনো অভাব নেই। তবু কোথাও যেন তিনি শান্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। সবকিছু থেকেও তার মনে হয় যেন কোথাও আসলে কিচ্ছু নেই।

লিনকিন পার্কের সেই গায়ক, মীরাক্কেলের মীর কিংবা নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে খ্যাতি লাভ করা সেই নায়িকা—তারা কি আদৌ সুখী? আদৌ কি তারা তৃপ্ত? সন্তুষ্ট? আদতে সুখের মূল হচ্ছে সন্তুষ্টি। পরিতৃপ্তি। আপনি যখন কোনো কিছু পেয়ে সন্তুষ্ট হবেন না, তৃপ্ত হবেন না, তখন আপনার মধ্যে একধরনের অস্থিরতা কাজ করবে। যা পেয়েছেন তারচেয়ে বেশি কীভাবে অর্জন করা যায়—সেই নেশা আপনাকে সর্বদা তাড়িয়ে বেড়াবে। আপনি ঘুমের মধ্যেও অস্থির থাকবেন। ঘুম ভাঙলেই আপনার খ্যাতি আর অর্জনের পেছনে দৌড়াতে মন চাইবে। সুখ তাহলে কোথায়?

খালি টাকা আর খ্যাতিই যদি সুখের নিয়ামক হতো, ফেইসবুকের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ হতো পৃথিবীর সেরা পাঁচজন সুখী মানুষের একজন। সবচেয়ে কম বয়সে বিলিওনিয়ার বনে যাওয়া মার্ক জাকারবার্গ কি আসলেই সুখী? তার রয়েছে অসম্ভব রকম খ্যাতি আর বিত্ত। তবে তাতেই যে সে সন্তুষ্ট তা কিন্তু নয়। অন্য আর দশজনের মতো বেশি অর্জনের আকাঙ্ক্ষা জেঁকে বসে আছে তার হৃদয়-মনেও। এই আরও অর্জন, আরও পাওয়ার জন্য যা করা দরকার এই ধরনের লোকগুলো

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

তার সবটাই করতে পারে। জাকারবার্গও করে। এই তো সেদিন জাকারবার্গকে মার্কিন আদালতের মুখোমুখি হতে হলো। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে সে নাকি আমেরিকার গত নির্বাচনের সময় মার্কিন ইউজারদের তথ্য ফাঁস করেছে কোনো থার্ড পার্টির কাছে। এই কাজটার জন্য সে নিশ্চয়ই বিশাল অঙ্কের বান্ডেল পেয়েছে। কিন্তু, দিনশেষে কী মিলল ভাগ্যে? ভর্ৎসনা! আর মুখোমুখি হতে হচ্ছে বিচারের। এই যে লোভ, এই যে আরও পাওয়া, আরও বড় হওয়ার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা, এটা মানুষকে নৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়। সে যখন লোভ আর লালসার মধ্যে ডুবে যায়, ভালোমন্দের তফাৎ নির্ণয় করা তার পক্ষে আর সহজ হয় না।

[গ]

কর্পোরেট দুনিয়ার কথিত সুখের পেছনে ছুটতে গিয়ে হতোদ্যম হয়ে যাওয়া মানুষের এ রকম আরও অনেক গল্প আছে। এই গল্পগুলো থেকে শেখার বিষয় হলো এই—সুখ আসলে শারীরিক নয়, আত্মিক। আত্মার পরিতৃপ্তিই হলো সুখের কারণ। আমাদের আত্মা যদি প্রশান্ত না হয়, আমাদের আত্মার যে খোরাক তা যদি আমরা লাভ করতে না পারি, তাহলে আমাদের সুখী হওয়াটা একটা নিছক অভিনয় মাত্র। সুখ নয়।

সুখের ব্যাপারে কুরআনের আলাদা ভাষ্য রয়েছে। কুরআন সুখকে অর্থ, বিত্ত কিংবা দুনিয়ার চাকচিক্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত করেনি; বরং কুরআন সুখ বলতে বুঝিয়েছে আল্লাহর নিকট নিজেকে একান্ত সঁপে দেওয়াকে। সুখ মানে হলো অন্তরের প্রশান্তি। অন্তরের স্থিরতা। অন্তর যখন প্রশান্ত, প্রফুল্ল থাকে, তখন একজন মানুষ সুখী হয়। যদি অন্তর বিষাদগ্রস্ত থাকে, অন্তরে যদি ভর করে দুখের কালো মেঘ, তাহলে একজন মানুষের জীবনটা দুঃখ, কষ্ট আর হতাশায় পর্যবসিত হয়। আরবিতে 'সাকিনা' মানে হলো অন্তরের প্রশান্তি। কুরআনের যত জায়গায় এই 'সাকিনা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সবখানে আমরা ভয়াবহ বিপদ, দুর্যোগ কিংবা দুর্ভোগের ঘনঘটা দেখতে পাই। তবে, সাথে সাথে দেখতে পাই আল্লাহর ওপর ভরসা, তার কাছে নিবেদিত, সমর্পিত কিছু আনুগত্যের নির্দশন। কুরআন বুঝিয়েছে এটাই সুখ। কুরআনের ভাষায় এটাই অন্তরের প্রশান্তি।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের কাহিনিটার কথাই চিন্তা করা যাক। কী এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিন ছিল সেটা! কুরাইশদের অকথ্য, নির্মম, অবর্ণনীয় নির্যাতন থেকে বাঁচতে মক্কা ছেড়ে তিনি যখন মদিনায় যাচ্ছিলেন, তখন তার সাথি ছিল কেবল আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। পেছনে

তাড়া করছে একদল কুরাইশ বাহিনী। হাঁটতে হাঁটতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু একটা গুহার মধ্যে আশ্রয় নিলেন। ওদিকে, কুরাইশ বাহিনীও একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে। তারা এতটাই নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল যে, কোনো কুরাইশ সৈন্য যদি নিজের পায়ের দিকে তাকাত, তাহলেই নবিজি সাল্লায়াললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ধরা পড়ে যেতেন। অবস্থা এমন বেগতিক দেখে ঘাবড়ে গেলেন নবিজির সাথি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু। তাকে চিন্তিত দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন!'

শত্রু একেবারে নাকের ডগায়। একটু এদিক-সেদিক হলে ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা শতভাগ। আর ধরা পড়লেই নিশ্চিত মৃত্যু। এমন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু যেখানে অস্থির-অশান্ত, সেখানে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরম নির্ভরতায় বললেন, 'চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন!' আল্লাহর ওপর এই যে নির্ভরতা, এই যে তাওয়াক্কুল, কুরআন এটাকেই 'সুখ', এটাকেই 'অন্তরের প্রশান্তি' হিশেবে উল্লেখ করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুরআনে বলেছেন—

إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ

যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, 'তুমি চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন!' অতঃপর আল্লাহ তার অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন।[১]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ওপর ভরসা করেছেন, আর আল্লাহ তার হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছেন প্রশান্তির ফল্গুধারা। সেই প্রশান্তির সামনে দুনিয়ার যেকোনো বিপদ নস্যি, তুচ্ছ। জীবনের এই যে দুঃসময়, দুর্যোগ আর দুর্ভোগের মুহূর্ত, এই মুহূর্তগুলোতে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার মাঝেই রয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি। সুখ। প্রশান্তি। আজকাল মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি ছেড়ে এমন সব বিষয়ে সুখের সন্ধানে ব্যস্ত, যেখানে আদতে মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নেই।

[১] সুরা তাওবা, আয়াত : ৪০

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

[ঘ]

সুখ কীসে—এই প্রশ্নটা মানব-ইতিহাসের আদিমতম প্রশ্নগুলোর একটা। মানুষ তার অস্তিত্বের শুরু থেকেই এই প্রশ্নের পেছনে ছুটে চলেছে নিরন্তর। বহু বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সমাজবিদ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং করছেন। কিন্তু, সবাই ঘুরে ফিরে আমাদের সেই বস্তুবাদী দুনিয়ার দিকেই ডেকে চলেন নিরন্তর। বস্তুবাদী দুনিয়াই যদি সুখের আঁকড়া হবে, কেন আমরা সেই দুনিয়ার করুণ আর্তচিৎকার শুনি প্রতিনিয়ত? কেন সেই দুনিয়া থেকে চাপা কান্নার স্বর আমাদের কানে এসে বাজে? কেন সেই দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষগুলো বেছে নেয় আত্মহননের পথ?

আগেই বলেছি, বস্তুবাদী দুনিয়ার চোখ ধাঁধানো এসব আয়োজনে সুখ নেই। এগুলো নিজের আত্মার সাথে প্রবঞ্চনা বৈ কিচ্ছু না। সুখের নাম করে নেহাত মরীচিকার পেছনে দৌড়ানো। সুখ আসলে কোথায়—এই প্রশ্নের সবচেয়ে স্পষ্ট, সবচেয়ে যৌক্তিক উত্তরটা এসেছে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে। তিনি বলেছেন—

মানুষের শরীরে এমন একটি মাংসপিণ্ড আছে যেটা সুস্থ থাকলে মানুষের সারা শরীর সুস্থ থাকে। আবার যেটা অসুস্থ হলে মানুষের সারা শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর তা হলো অন্তর।'[১]

কোন সেই মাংসপিণ্ড? সেটা হলো অন্তর। অন্তর যদি সুস্থ থাকে, সতেজ থাকে, তাতে যদি ভর না করে কোনো আত্মপ্রবঞ্চনা, তাহলে সেই মানুষটা সুখী। আবার যার হৃদয় আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত, সে যতই সুখী হওয়ার ভান করুক, সেটা দিনশেষে স্রেফ অভিনয়।

বিখ্যাত 'Yes!' Magazine একবার সুখী হওয়ার কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক উপায় নিয়ে ফিচার করেছিল। সুখী হওয়ার জন্য তারা যে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য কারণ চিহ্নিত করেছিল তার মধ্যে একটা হলো—তুলনা এড়িয়ে চলা। অর্থাৎ একজন দিনদিন ধনী থেকে ধনী হচ্ছে বলেই যে আমাকেও ধনী হতে হবে, এ রকম মানসিকতা এড়িয়ে চলা। বরঞ্চ নিজেকে নিয়ে, নিজের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা।

---

[১] সহিহ বুখারি : ৫২; সহিহ মুসলিম : ১৫৯৯

কুরআনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের রব ঠিক সেই পথই বাতলে দিয়েছেন যা আজকের দার্শনিকেরা সুখী হওয়ার জন্য নিয়ামক বানাচ্ছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন—

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

কখনোই সে-সমস্ত বস্তুর দিকে তাকাবেন না, যা আমি তাদের (দুনিয়াপূজারীদের) উপভোগের জন্য দিয়েছি। এসব দিয়ে আমি তাদের পরীক্ষা করি। বস্তুত, আপনার প্রতিপালকের দেওয়া রিযিকই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে বেশি স্থায়ী।[১]

আজকের দুনিয়ায় অসুখী হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ সম্ভবত এই দুনিয়াপূজাই। মানুষ সম্পদের মোহে বিভোর। তার প্রতিবেশী দিনের পর দিন সম্পদের পাহাড় বানাচ্ছে বলে তাকেও যেভাবে হোক সম্পদশালী হতে হবে। তার কলিগের টয়োটা ব্র্যান্ডের গাড়ি আছে বলে তারও একটা টয়োটা ব্র্যান্ডের গাড়ি থাকতে হবে। তার বন্ধু Iphone 11 চালায় বলে তাকেও Iphone 11 ব্যবহার করতে হবে। এই যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা, এই প্রতিযোগিতা মানুষকে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিচ্যুত করে দেয়। আমরা ছিটকে পড়ি সত্যিকার সুখের রাস্তা থেকে, যে রাস্তায় আমাদের দেহ-মন প্রশান্তি লাভ করে। এজন্যেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের তুলনা এড়িয়ে চলতে বলেছেন। যারা দুনিয়াপূজায় মত্ত হয়ে আছে, তাদের দিকে ফিরে তাকাতে নিষেধ করেছেন এবং এও বলেছেন, কেবল তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রিযিক হিশেবে আমাদের দান করেছেন।

সুখী হবার জন্য Yes! Magazine-এর পরের উপায় হলো—'Smile, even when you don't feel like it.' অর্থাৎ হাসুন, এমনকি যখন দুঃখ ভর করে মনে, তখনো। যারা হাসতে পারে, তাদের প্রচণ্ড আশাবাদী মানুষ হিশেবে দেখা হয়। তাদের মনের মধ্যে সবসময় একটা আশার আলো জ্বলজ্বল করে।

---

[১] সূরা ত-হা, আয়াত : ১৩১

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

কোনো ভালো কাজকেই ছোট মনে করো না, এমনকি যদি সেটা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলাও হয়।[১]

জারির ইবনু আব্দিল্লাহ আল-বাজালি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'যেদিন থেকে আমি ইসলামে দাখিল হই, সেদিন থেকে এমন কোনোদিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি যখন তার মুখে হাসি ছিল না।'[১]

হৃদয়কোণে যদি আশা না থাকে, যদি মানুষের পরম একটা ভরসার স্থল, নির্ভরতার কেন্দ্র না থাকে, তাহলে সে মানুষ প্রচণ্ড হতাশায় ডুবে যাবে। আমরা যদি জীবনের প্রতিকূলতার কথা চিন্তা করি, তাহলে নবিজির জীবনই আমাদের সামনে সবচাইতে বড় উদাহরণ। মানবজীবনে এমন কোনো বিপদ নেই, এমন কোনো দুর্যোগ নেই যা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে নেমে আসেনি। তদুপরি তিনি সর্বদা আশাবাদী মানুষ ছিলেন। তিনি কখনোই হতাশ হননি। তার জীবন ছিল হাসিখুশি, কর্মচঞ্চল।

Yes! Magazine-এর সেই ফিচারে সুখী হবার উপায় হিশেবে আরও বলা ছিল— কৃতজ্ঞ হওয়া, দান করা, এমনকি টাকার পেছনে হন্যে হয়ে না ছোটাকেও তারা সুখী হওয়ার নিয়ামক হিশেবে উল্লেখ করেছিল। তারা বলেছিল, 'Put money low on your list of properties।'

ইসলামে কৃতজ্ঞ হওয়ার ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। একজন মুমিনের পুরো জীবনটাই কৃতজ্ঞতার বাঁধনে বাঁধা। সে হাঁচি দিলে বলে—'আল-হামদু লিল্লাহ' অর্থাৎ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার।' আবার যখন সে জীবনে কোনো কিছু অর্জন করে, তখনো বলে 'আল-হামদু লিল্লাহ'। যেকোনো মুহূর্তে, যেকোনো পরিস্থিতিতে, হোক সুখের কিবা দুখের—একজন মুমিন সর্বদা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। এজন্যই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যের। তার সকল বিষয়ই কল্যাণকর! সে যখন সুখে থাকে, তখন সে তার রবের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং এটা তার জন্য উত্তম। আবার, সে যখন কঠিন

দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে যায়, তখন সে সবর করে এবং রবের কৃতজ্ঞতা জানায়। এটাও তার জন্য উত্তম।'[১]

মুমিনের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র তার রবের কৃতজ্ঞতায় ভরা। আখিরাতের অনন্ত জীবনের সুখের জন্য দুনিয়ার জীবনে মহান আল্লাহ তাআলার আনুগত্য, তার সন্তুষ্টি এবং সন্তোষের পথে হাঁটতে পারাটাই সত্যিকারের সুখ। হ্যামিলনের বংশীবাদকেরা আমাদের যে অদ্ভুত সুরে সুখের পথে ডাকে, সেই পথে আছে কেবল ধোঁকা আর প্রতারণা। কর্পোরেট দুনিয়ার রঙিন চশমা পরে চোখের সামনে দিয়ে তরতর করে আকাশ ছুঁতে থাকা ইট-পাথরের কোঠরে সুখ নেই। সুখ নেই বস্তুবাদী মহলের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত 'বড় হওয়া' আর 'নাম কুড়ানোর' মাঝে। এসব নিছকই চোরাবালি। খাদের কিনারায় পা ফসকালে যেমন তলিয়ে যেতে হয় অতল গহ্বরে, এই দুনিয়া ঠিক তেমনই। পা ফসকালেই বিপদ। কুরআনের ভাষায়—

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ

এই দুনিয়ার জীবন নিছক খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়।[২]

আপনার রব জানাচ্ছেন এই দুনিয়া হলো নিছক খেল-তামাশার ক্ষেত্র। একটা ধোঁয়াশা। একটা কূপ। একটা ফাঁদ। এখানে যা সুখ বলে ধরা হয় তা আসলে মরীচিকা। সুখ তো নিহিত আছে স্রষ্টার আনুগত্যে। এই কঠিন এবং অপ্রিয় সত্য যারা বুঝেছে, তারাই পেয়েছে সত্যিকার সুখের সন্ধান। সুখ তো কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে। সুখ আছে আনুগত্যে মাথা নোয়ানোতে। সুখ আছে বান্দার নিরীহ আকুল ফরিয়াদে।

[১] সহিহ মুসলিম : ২৯৯৯

[২] সুরা আনআম, আয়াত : ৩২

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

জীবনের ইঁদুর-দৌড় কাহিনি

আমাদের জীবন যেন প্রতিযোগিতাময়। ধনসম্পদের প্রতিযোগিতা, টাকাপয়সার প্রতিযোগিতা, বাড়ি-গাড়ির প্রতিযোগিতা। আমরা প্রতিযোগিতা করি একে-অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার, একে-অন্যের চেয়ে বড় হওয়ার, একে-অন্যের চেয়ে উঁচুতে যাওয়ার। অমুকের ছেলে পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে, আমার ছেলে কেন হতে পারল না—এই নিয়ে আমাদের ভাবনার শেষ নেই। অমুকের মেয়ে সংগীত প্রতিযোগিতায় সেরা পুরস্কার জিতেছে, আমার মেয়ে কেন বাছাই পর্ব থেকেই ছিটকে পড়ল—সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমাদের রাতের ঘুম হারাম করে ফেলি। মোদ্দাকথা, আমরা একটা 'Rat Race'-এর মধ্যে জীবন অতিবাহিত করি।

Rat Race-এর আক্ষরিক অর্থ ইঁদুর-দৌড়। কিন্তু প্রায়োগিক অর্থে Rat Race বলতে বোঝায় বেশি বেশি সম্পদ এবং ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতা। নিজেদের জীবনের দিকে তাকালে আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করব যে, আমাদের জীবনটা কোনো-না-কোনোভাবে এই Rat Race-এর আওতায় পড়ে গেছে। আমাদের টাকা চাই, অনেক টাকা। সেই টাকার পেছনে আমরা অবিরাম ছুটে চলি। আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হলো এই টাকা। আমি বিসিএস ক্যাডার কেন হব? কারণ, আমার একটি সরকারি চাকরি চাই। সরকারি চাকরি হলেই আমি ধরে নিতে পারি যে, আমার জীবনের নিরাপত্তা অনেকটাই নিশ্চিত হয়ে গেছে। ভালো স্কেলের স্যালারি, ভালো সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। অফিসের গাড়ি পাওয়া যাবে। নসিবে থাকলে একটা বাড়িও জুটে যেতে পারে। পড়াশোনা নিয়ে আমি বেশ তৎপর। কারণ আমাকে বিসিএস

ক্যাডার হতে হবে। আমার কাছে বিসিএস ক্যাডার মানেই জীবন। জীবন মানেই বিসিএস ক্যাডার হওয়া। জীবনের এই যে প্রবণতা, এটা হলো এক ধরনের Rat Race.

আবার, চাকরি হয়ে গেলে আমার পেরেশানি থাকে প্রমোশান নিয়ে। আমার সাথে কাজ করা সেলিম সাহেব আমার চোখের সামনে দিয়েই তরতর করে প্রমোশান পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি যেখানে ছিলাম ওখানেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছি—ব্যাপারটা আমি ঠিক মেনে নিতে পারি না। আমাকেও প্রমোশান পেতে হবে। সেলিম সাহেবের মতো আমাকেও তরতর করে ওপরে উঠতে হবে। এই ওপরে ওঠার জন্য যত ধরনের কাজ করা লাগে তা করতে আমি প্রস্তুত। বসের যত ধরনের তোষামুদি, মোসাহেবি করা লাগে করব। ঘুস দিতে হয় দেবো। তার বিনিময়ে আমার শুধু প্রমোশান চাই। একবার যদি প্রমোশান পেয়ে যাই, তাহলে এতদিন ধরে আমাকে টিটকিরি করা অধস্তন লোকগুলোকে একবার দেখেই ছাড়ব। এই যে ক্ষমতা পাওয়ার জন্য একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা—এটাও এক ধরনের Rat Race.

অমুকের ছেলে প্রথম হয়েছে, কিন্তু আমার সন্তান মেরিট লিস্টেই থাকতে পারছে না। আমার ছেলেকে আমি সেরা পজিশানে দেখতে চাই-ই চাই। তাহলে এখন কী করতে হবে? তিন-তিনজন টিচার দিয়ে ছেলেকে পড়াচ্ছি। ছেলের জীবনটাকে আমি স্কুল, পড়ার টেবিল আর খাটের মধ্যে বেঁধে ফেলেছি। চুলোয় যাক তার মানসিক বিকাশ। আমি ওকে সেরাদের কাতারে দেখতে চাই, ব্যস। নাহলে ক্লাবে আমার মান-সম্মানই থাকছে না। সন্তানসন্ততি নিয়ে আমাদের এই যে প্রতিযোগিতা, এটাও এক ধরনের Rat Race. সবখানে আমাদের শুধু 'চাই আর চাই'।

মজার ব্যাপার হলো, কুরআনে এই 'Rat Race' শিরোনামের একটা পূর্ণাঙ্গ সুরা আছে। ওখানেও এই ব্যাপারগুলো খুব সুন্দরভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তুলে ধরেছেন আমাদের জন্য। আমরা যে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে আমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি, সেই ব্যাপারটা কুরআন খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছে এই সুরায়। সুরাটির নাম হলো 'আত-তাকাসুর'। তাকাসুর মানে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা। এই প্রাচুর্য টাকাপয়সা হতে পারে, ধনসম্পদ হতে পারে, সন্তানসন্ততি হতে পারে। এমনকি চাকরি, ক্যারিয়ার, স্ত্রী এবং জ্ঞানও এই প্রাচুর্যের অন্তর্ভুক্ত। সুরাটা নিম্নরূপ—

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ①

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের ভুলিয়ে রেখেছে

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ②

যতক্ষণ না তোমরা কবরে যাও

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ③

মোটেই ঠিক নয়! শীঘ্রই তোমরা জানবে

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ④

আবার বলি, মোটেই ঠিক নয়! তোমরা তো শীঘ্রই জানতে পারবে

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ⑤

কখনোই নয়! যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে পারতে

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ⑥

তোমরা অবশ্যই অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ⑦

আবার বলি, তোমরা অবশ্যই দিব্যদৃষ্টিতে জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ⑧

...অবশ্যই তোমরা আমার প্রদত্ত নিআমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে

শুরুতেই খেয়াল করি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের ভুলিয়ে রেখেছে।' প্রাচুর্য মানে কী? ধনসম্পদ, টাকাপয়সা, স্ত্রী-সন্তানসন্ততি, ক্ষমতা ইত্যাদি। এগুলো আমাদের ভুলিয়ে রেখেছে। গাফিল করে রেখেছে। কী থেকে? আখিরাত থেকে। আমাদের অনন্ত ঠিকানা। আমাদের জন্য অন্য একটা জগৎ অপেক্ষা করছে এবং সেখানে জবাবদিহিতার একটি মঞ্চ অপেক্ষা করে আছে—এই বোধ থেকে প্রাচুর্য আমাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। ভুলিয়ে রেখেছে। এই আয়াতের শুরুতেই 'আলহাকুম' শব্দ আছে। মুফাসসিরগণ এই আলহাকুম শব্দের অর্থ করেছেন এমন নগণ্য জিনিস নিয়ে পড়ে থাকা যা দামি কোনো জিনিসের ব্যাপারে ভুলিয়ে রাখে। অর্থাৎ আলহাকুম হলো দামি জিনিস ফেলে রেখে নগণ্য, তুচ্ছ জিনিসের পেছনে ছুটে বেড়ানো।[১] আমাদের জন্য আখিরাতই হলো দামি জিনিস। দামি জায়গা। জান্নাত হলো আমাদের পরম আরাধ্য স্বপ্ন। সেই পরম আরাধ্য স্বপ্নকে ভুলে আমরা দুনিয়ার পেছনে দুর্নিবার ছুটে চলি। দুনিয়ার পেছনে ছুটতে ছুটতে আখিরাতকে আমরা বেমালুম ভুলে যাই। প্রাচুর্য আমাদের এমন অন্ধ আর বধির বানিয়ে রাখে যে, আমরা দামি জিনিসটিকে অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখতে পাই না।

পরের আয়াতেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, 'যতক্ষণ না তোমরা কবরে যাও।' খুবই সাংঘাতিক অথচ নিরেট বাস্তব একটি কথা। দুনিয়ার পেছনে নিরন্তর ছুটতে ছুটতে একদিন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় মৃত্যুর। মালাকুল মাউত এসে আমাদের রুহটাকে দেহপিঞ্জর থেকে বের করে নিয়ে যায়। সাথে সাথে দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমরা হয়ে পড়ি অন্য জগতের বাসিন্দা। আমরা তখন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি—সেই ভিন্ন জগতে দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা কাজ করে না। সেই জগতে আমার কোনো প্রভাব, কোনো ক্ষমতা খাটানোর সুযোগ নেই। দুনিয়ায় যে ব্যাংক-ব্যালেন্স, সম্পদের পাহাড় আমি গড়ে গিয়েছি, সেসবের কোনো মূল্যই ওখানে নেই। প্রাচুর্য লাভের নেশা যে আমাকে মৃত্যু অবধি নেশাগ্রস্ত করে রাখে, সেই বাস্তবতার কথা তুলে ধরেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই প্রাচুর্যের নেশা থেকে আমি বের হতে পারি না।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, 'মোটেই ঠিক নয়! শীঘ্রই তোমরা জানবে।' আল্লাহ আমাদের জানাচ্ছেন, আমরা যে দুনিয়ার পেছনে ছুটতে

[১] তাফসিরে আলূসি দ্রষ্টব্য

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

ছুটতে হয়রান হয়ে যাচ্ছি, ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, সেটা একটা মরীচিকা মাত্র। এই দুনিয়ার মোহ আর মায়ার পেছনে অবিরাম ছুটে চলা যে আমাদের কোনো কাজেই আসবে না তা আমরা খুব শীঘ্রই টের পাব।

চতুর্থ আয়াতে বলছেন, 'আবার বলি, মোটেই ঠিক নয়! শীঘ্রই তোমরা তা জানতে পারবে।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই আয়াতে আগের আয়াতের কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করেছেন। যখন দেশে বড় ধরনের কোনো দুর্যোগ দেখা দেয়, যখন আবহাওয়া মারাত্মক রকমের বৈরী হয়ে ওঠে, তখন টিভিতে সংবাদ-উপস্থাপক বলেন, 'সারাদেশে সাত নম্বর বিপদ সংকেত, আমি আবারও বলছি, সাত নম্বর বিপদ সংকেত দেখানো হচ্ছে।' 'সাত নম্বর বিপদ সংকেত' কথাটা দুই-দুইবার উচ্চারণ করে উপস্থাপক আমাদের আসন্ন বিপদের মাত্রা উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করেন। এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাও ঠিক কঠিন এক বিপদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করার জন্য একই কথা দুইবার উচ্চারণ করে বিপদের মাত্রা বুঝিয়েছেন। আয়াতটি আমাদের বলছে, 'আবার বলি! তোমরা যা করে বেড়াচ্ছ তা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়। শীঘ্রই বুঝতে পারবে তোমরা কীসের পেছনে ছুটে চলেছ।'

পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'কখনোই নয়! যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে' অর্থাৎ, যদি তোমরা দেখতে পেতে, তোমাদের প্রাধান্য দেওয়া বিষয়গুলো কতটা মূল্যহীন, কতটা তুচ্ছ, তাহলে এতটা উদাসীনভাবে দিন কাটাতে পারতে না। মৃত্যুর পরে তোমাদের ধনসম্পদ, তোমাদের ক্ষমতা, তোমাদের স্ত্রী-সন্তানসন্ততি যে কোনো কাজেই আসবে না, সেটা যদি উপলব্ধি করতে পারতে, তাহলে এইসব মিথ্যে মোহের পেছনে জীবনের মূল্যবান সময়গুলো এভাবে অপব্যয় করতে না।

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে।'

খুব কঠিন একটা আয়াত। আল্লাহ বুঝিয়েছেন—এই যে দুনিয়ার কাছে নিজেকে আমরা সঁপে দিয়েছি, দুনিয়াকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আগাগোড়া, বেমালুম আখিরাতের কথা ভুলে গিয়েছি, দুনিয়াকে আমাদের সবকিছু মনে করে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছি, আজ এটাই হলো আমাদের কর্মফল, পরিণাম—আগুনের লেলিহান শিখা।

সপ্তম আয়াতে তিনি আবার বলেছেন, 'আবার বলি, তোমরা অবশ্যই দিব্যদৃষ্টিতে জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে।' আগের মতো এখানেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পূর্বের আয়াতের কথাগুলোর ওপর জোর দিয়েছেন। আল্লাহ যখন কোনো কিছুর ওপর বারবার জোর দিয়ে কথা বলেন, তখন বুঝতে হবে ব্যাপারটার গুরুত্ব কতখানি। তিনি আমাদের জানাচ্ছেন, যে বাস্তবতাকে তোমরা অস্বীকার করতে, যে বাস্তবতার ব্যাপারে তোমরা বিস্মৃত হয়ে দুনিয়ার ফাঁদে পড়েছিলে, এই দেখো আজ! আজ দেখো সেই বাস্তবতা কতটা ভয়ংকর!

অষ্টম আয়াতে তিনি বলেন, 'তারপর, সেদিন অবশ্যই তোমরা আমার প্রদত্ত নিআমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।' নিআমত হিশেবে আমাদের জীবন দান করা হয়েছিল। এই জীবনে বাঁচার জন্য হায়াত হিশেবে কিছু সময় বেঁধে দেওয়া হয় আমাদের। সেই সময়গুলো আমরা কোন কাজে ব্যবহার করেছি? নিআমত হিশেবে আমাকে স্বাস্থ্য দান করা হয়েছিল। সেই স্বাস্থ্য, সেই সুঠাম দেহ নিয়ে আমি কত ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছি? কত রাত আমি তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়েছি? নিআমত হিশেবে আমাকে ধনসম্পদ দান করা হয়েছিল। সেই ধনসম্পদ কোন পথে আমি ব্যয় করেছি? কতটুকু দান-সাদাকা করেছি? নিআমত হিশেবে আমাকে সন্তানসন্ততি দান করা হয়েছিল। তাদের কি সঠিক শিক্ষা দিয়ে মানুষ করেছিলাম? আমার মৃত্যুর পরে তারা যেন আমার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া[১]-র ওয়াসিলা হতে পারে, এমন সন্তান কি আমি দুনিয়ার বুকে রেখে আসতে পেরেছি?—জিজ্ঞাসা করা হবে।

এটাই হচ্ছে Rat Race তথা জীবনের ইঁদুর-দৌড় কাহিনি। আমাদের জীবনের বাস্তবতার সাথে কতই-না মিল! কতটাই-না গাফিল আমরা আসল উদ্দেশ্য থেকে। আজকে খ্যাতির লোভ, সম্পদের লোভ আর ক্ষমতার লোভ আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। বড় হওয়ার নেশা, অন্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার তাড়না আজ আমাদের এতই মাতোয়ারা করে রেখেছে যে, আমরা আমাদের পরম নিয়তি মৃত্যুর কথা ভুলে বসে আছি। একদিন হুট করে মৃত্যু সামনে চলে আসবে। আমাকে অপ্রস্তুত দেখে মালাকুল মাউত কখনোই ফিরে যাবে না। আমাকে আরেকটাবার শুধরে নেওয়ার সুযোগও দেওয়া হবে না। পরকালের পাথেয় সংগ্রহ ছাড়াই যখন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, তখন কেমন অবস্থা হবে আমার?

---

[১] এমন কাজ যার সাওয়াব মৃত্যুর পরও ব্যক্তির আমলনামায় যোগ হতে থাকে।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আমি আফসোস করব। আমার সামনে দিয়ে কত লোক হেঁটে হেঁটে জান্নাতে চলে যাচ্ছে। এরা তো তারাই, দুনিয়ায় যাদের সবসময় আখিরাত নিয়ে ভাবতে দেখেছিলাম। জীবনে এরা ছিল সৎ, সত্যবাদী, আমলদার। মসজিদের সাথে তাদের ছিল আত্মার বন্ধন। রামাদান মাসগুলোতে তারা হয়ে উঠত অন্য মানুষ। তারা কখনো কাউকে কষ্ট দিয়ে কথা বলত না, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলত না। বিনয়ের সর্বোচ্চ মাত্রা দেখা যেত তাদের আচরণে। তারাই আজ মহা-পুরস্কারপ্রাপ্ত! আর আমি? আমি ছিলাম উদ্ধত আর বেখেয়াল। আখিরাত নিয়ে আমি না কখনো ভাবতাম, না আখিরাতের জন্য কোনো আমল করতাম। রামাদান মাসগুলো কতই-না হেলাফেলায় কাটিয়েছি আমি। আমার সহকর্মী, আমার সহপাঠী, আমার প্রতিবেশী আজ আমার সামনে দিয়ে জান্নাতে চলে যাচ্ছে, আর আমার ভাগ্যে জুটল জাহান্নাম। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে আমি বলব—

يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

হায়! আমি যদি পরকালের জন্য কিছু করতাম![১]

আমলনামা হাতে পাওয়ার পরে আমি তাতে চোখ বুলালাম। কোথাও কোনো ভালো আমল দেখতে পাচ্ছি না। সবখানে কেবল আমার পাপ আর পাপ। অশ্লীল ভিডিও আর অশ্লীল জিনিস দেখতে দেখতে যত রাত পার করেছি, তার সব হিশেবই দেখছি এখানে সবিস্তারে লেখা আছে। ক্যাম্পাসের যে-কয়টা মেয়ের দিকে কু-নজরে তাকাতাম, তার হিশেবও দেখছি উঠে এসেছে এখানে। ইয়া আল্লাহ! অপবাদ দিয়ে প্রতিবেশী যে মেয়েটার বিয়ে আটকে দিয়েছিলাম, সে হিশেবটাও দেখছি বাদ পড়েনি! আমি তখন আফসোসের সুরে বলব—

يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ

হায়! আজ আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হতো![২]

দুনিয়ায় যাদের ফাঁদে পড়ে আখিরাত সম্পর্কে বিস্মৃত হয়েছিলাম, তাদের নামগুলোও সেদিন আমার সামনে উপস্থাপন করা হবে। যে বন্ধুটার প্রলোভনে পড়ে ইন্টারনেটের নিষিদ্ধ সাইটে ঢু মেরেছিলাম, যার প্ররোচনায় অমুক-তমুককে উত্যক্ত করেছিলাম, যাদের সাথে সিনেমা, কনসার্ট দেখতে গিয়েছিলাম, তাদের সকলের নাম সেদিন আমাকে দেখানো হবে। আমি অবাক হব আর বলব—

يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

হায়! আমি যদি তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম![১]

জীবনের এই ইঁদুর-দৌড় খেলায় আমি মত্ত হয়ে আছি। সেই খেলায় জিতে যাওয়ার জন্য জীবন আমাকে যেভাবেই নাচাক, আমি সেভাবেই নাচতে প্রস্তুত। আমি জানি না আগামীকাল সকালে ঘুম থেকে জাগতে পারব কি না। তবুও আমার চৈতন্য ফেরে না। একদণ্ড ভাবার ফুরসত পাই না, যদি এক্ষুনি আমার মৃত্যু হয়? যদি এখনই ঢলে পড়ি রাস্তায়? যদি প্রাণবায়ু এক্ষুনি বেরিয়ে যায় আমার শরীর থেকে? আমাকে কী অসহায় হয়ে, আপসোস করে বলতে হবে—'হায়! আমি যদি পরকালের জন্য কিছু করতাম!'

[১] ...

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

চোখের রোগ

[ক]

এক বন্ধুর সাথে একবার ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আমার চোখে গোলগাল একটা যন্ত্র পরিয়ে দিয়ে ডাক্তার সাহেব বললেন, 'সামনে তাকান।'

আমি সামনের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, 'কী দেখতে পাচ্ছেন?'

'কিছু ইংরেজি বর্ণ।'

'পড়ুন সেগুলো।'

আমার সামনে একটা গোলাকার চক-প্লেটে পেন্ডুলামের মতো ঝুলতে থাকা ইংরেজি বর্ণগুলোর কোনোটা খুবই ক্ষুদ্র আকৃতির, আবার কোনোটা খুব বড়। ছোট-বড় আর মাঝারি আকৃতির এই বর্ণমালা পড়তে বেশ অসুবিধা হবার কথা। চোখে সমস্যা থাকলে তো বেশ বিপাকেই পড়তে হবে। মূলত চোখে কোনো সমস্যা আছে কি না তা নির্ণয়ের জন্যই এগুলোকে এভাবে সাজানো হয়েছে। কিন্তু বর্ণমালা পড়তে আমার কোনো অসুবিধেই হয়নি। গড়গড় করে এক নিঃশ্বাসে সেগুলো পড়ে ফেললাম। পাশে বসে থাকা ভদ্রলোক গোলগাল যন্ত্রটা আমার চোখ থেকে খুলে নিয়ে বললেন—

'আপনি তো চোখে আমার চেয়েও ভালো দেখতে পান। কী জন্যে এসেছেন?'

'রুটিন চেক-আপ করাতে।'

'রেগুলার করান?'

'না।'

তাহলে?'

'এই যে, আজ থেকে শুরু করলাম।'

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক ফিক করে হেসে দিলেন।

[খ]

ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের অত্যাধুনিক যন্ত্র আমার চোখে কোনো সমস্যা খুঁজে পায়নি। চোখের চিকিৎসার ওপর বড়সড় রকমের ডিগ্রীধারী ডাক্তারও আমার চোখ দেখে বললেন যে, আমার চোখ দিব্যি সুস্থ। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক যন্ত্র আর ডিগ্রীপ্রাপ্ত ডাক্তারেরা আমার চোখে সমস্যা খুঁজে না পেলেও আমি তো জানি আমার চোখ কী পরিমাণ অসুস্থ। আমার চোখে রয়েছে এক অদ্ভুত রকমের অসুখ! সেই অসুখ শনাক্ত করার ক্ষমতা এখানকার যন্ত্রগুলোর নেই। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান কিংবা ভালো পাওয়ারের চশমাও কখনো সেই অসুখ সারাতে পারবে না। দুনিয়ার কোনো অত্যাধুনিক যন্ত্রও এই অসুখ খুঁজে পাবে না, কারণ, এই অসুখের কেন্দ্রস্থল চোখের কর্নিয়া নয়, বক্ষস্থিত অন্তর।

চোখে দেখতে না পাওয়াটা—একটা সমস্যা বটে, তবে খুব গুরুতর সমস্যা নয়। জগতে প্রতারণার সবচেয়ে বিশ্বস্ত অঙ্গাই সম্ভবত চোখ। চোখে দিব্যি দেখতে পায়—এমন কত লোকই তো অন্য লোককে চোখে চোখ রেখে খুন করে ফেলে। চোখে দেখতে পাওয়া লোকগুলো কত সহজেই চোখে চোখ রেখে মিথ্যে কথা বলে, চোখের দৃষ্টি দিয়ে সুদ আর ঘুসের টাকা গুনে গুনে পকেট ভরতি করে। তারা মনে করে তাদের চোখগুলো দিব্যি ভালো আছে। কেবল চোখে দেখতে পাওয়াই কি সত্যিকার চোখের সুস্থতা?

উম্মু মাকতুম রাযিয়াল্লাহু আনহু। অন্ধ সাহাবি। চর্মচক্ষু দিয়ে দুনিয়াকে দেখার সুবিধে থেকে তিনি ছিলেন বঞ্চিত। তবে, তিনি কি সত্যিই অন্ধ ছিলেন? সত্যিই কি তিনি চোখে দেখতে পেতেন না? যদি না-ই দেখতে পান, হেরা গুহা থেকে উৎসারিত সেই শুদ্ধতম আলোর খোঁজ তিনি পেলেন কীভাবে? কীভাবে ঠিক ঠিক চিনে ফেলেছিলেন আসমান ভেদ করে আসা সেই সত্যটিকে? দুনিয়াকে আলোকিত করতে আসা অতিজাগতিক সেই আলোকে তিনি চিনতে পারলেন কী উপায়ে? তবে কি অন্ধত্ব মানেই 'না দেখা' নয়? তবে কি মানুষ চোখ ছাড়াও অন্য কোনো উপায়ে, অন্য কোনো মাধ্যমে দেখতে পায়? তাহলে কোন সে উপায়? কোন সে মাধ্যম?

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

হ্যাঁ, সেই মাধ্যম হলো অন্তরের চোখ। বক্ষস্থিত যে চোখ, সেই চোখ যদি সুস্থ থাকে, তার জন্য দুনিয়া কখনো অন্ধকার হয় না। সুস্থ চর্মচক্ষু যেখানে ঘোর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখে না, অন্তর্চক্ষু সেখানে দেখতে পায় ঝলমলে আলো। সাহাবি উম্মু মাকতুম রাযিয়াল্লাহু আনহুর চর্মচক্ষুতে আলো ছিল না, তবে তার বক্ষস্থিত চোখের জ্যোতি তাকে সত্যিকার অন্ধ হতে দেয়নি। সেই জ্যোতি ঠিক ঠিক খুঁজে নিয়েছিল শুদ্ধতার পথ। খুঁজে নিয়েছিল পরম পবিত্র সত্যটিকে। সেই সত্যের নাম তাওহিদ। একত্ববাদ। এক ইলাহ। এক মাবুদ।

পক্ষান্তরে, আবু জাহেল কিংবা আবু লাহাবের কথা চিন্তা করুন। বাহ্যিক চোখে দুনিয়ার সবকিছু তারা দেখতে পেলেও তাদের অন্তরের চোখ ছিল মৃত। তাদের চর্মচক্ষু ছিল দিব্যি সুস্থ। কিন্তু বক্ষস্থিত যে চোখ, সেই চোখ ছিল আলোকহীন। বাহ্যিক চোখে দুনিয়ার সবকিছু দেখার সাধ মিটলেও তারা দেখতে পায়নি আসমানি আলোর প্রভা। যে আলোর ঝিলিক রাঙিয়ে দিয়ে গেছে পৃথিবীর পথপ্রান্তর, যে আলোতে ঝলমল করে উঠেছিল মরু-মূষিকের উপত্যকা, সেই আলোর বাণী পৌঁছতে পারেনি তাদের অন্তরের কুঠুরিতে। তাদের অন্তর্চোখ ছিল মৃত। অন্তরের চোখ মরে যাওয়াতে তারা সত্যটাকে চিনতে পারেনি। খুঁজে আনতে পারেনি দিগন্তবিস্তৃত সেই ঐশী আলোর রেখা। বাহ্যিক দৃষ্টি আর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে কি আকাশপাতাল ব্যবধান, তাই না?

[গ]

ক্যাম্পাসে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই বলি, 'দোস্ত, আমি না অমুকের ওপর ক্রাশ খেয়েছি।' ক্রাশ খাওয়া মানে মেয়েটার রূপ দেখে পাগল হয়ে যাওয়া। কল্পনায় নীল শাড়ি পরিহিত সেই ললনার খোঁপায় গোলাপ গুঁজে দিতে দিতে বলা, 'তোমার জন্য দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বাঁধতে পারি লাল কাপড়। বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে আনতে পারি একশ আটটি নীলপদ্ম।' কল্পনায় আমি হয়ে যাই শাহজাহান আর সে হয় আমার মমতাজ। আমার রাতগুলো কেটে যায় সেই ক্রাশের কথা ভাবতে ভাবতে। দিনগুলোতে আমার মন খালি আনচান করে তাকে এক নজর দেখার জন্য। তাকে আমার চোখে সে-ই হলো মোনালিসা। রূপকথার রূপের দেবী আফ্রোদিতি। তাকে দেখলেই আমার মনের ভেতর উথালপাথাল শুরু হয়। আমি তখন কবি হয়ে যাই। আনমনে গুনগুন করি, 'তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ?'

নিজেকে কবি বানানোর আগে, আমরা কি একবার আল-কুরআনের দিকে ফিরে যেতে পারি না? আমরা তো বিশ্বাস করি, আল-কুরআন হলো আমাদের জীবনবিধান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্ট করেই বলছেন—

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

(হে রাসুল) মুমিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে।[১]

আমাকে জানতে হবে, কোনো বেগানা নারীর দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকার অনুমতি আমাকে দেওয়া হয়নি। বরং, হাদিসে বলা হয়েছে, কোনো নারীর দিকে দৃষ্টি চলে গেলে সাথে সাথে তা ফিরিয়ে নিতে। ভুলেও দ্বিতীয় বার যেন মুখ তুলে না তাকানো হয়।[২] কারণ, দ্বিতীয় বারের তাকানোতে শয়তানের কুমন্ত্রণা থাকে। শয়তান তখন মনের ভেতরে কুমন্ত্রণা দেয় আর করিয়ে নেয় বিভিন্ন ধরনের পাপকাজ। একটি সহিহ হাদিস থেকে জানা যায়, একবার মুযদালিফাহ থেকে মিনায় যাত্রাকালে আল ফাদল ইবনু আব্বাস এক মহিলার দিকে বারংবার তাকাচ্ছিলেন। এটা দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে তার ঘাড়টাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।[৩]

সুরা আল মুমিনের ১৯ নম্বর আয়াত : যেখানে বলা হচ্ছে, 'চক্ষুসমূহের খিয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তা তিনি জানেন'—এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আয়াতটিতে এমন এক ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে, যে কোনো বাড়িতে যায় এবং ওই বাড়ির সুন্দরী মহিলার দিকে বারংবার চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকায়। যখনই তার এই কাজ কারও নজরে পড়ে যায়, তখন সে চোখ নামিয়ে ফেলে। এরপর, আবার যখন সে সুযোগ পায়, তখন আবার ওই সুন্দরী মহিলার দিকে তাকায়।'[৪]

খেয়াল করুন, এই যে একজন মহিলার দিকে বারবার নজর দেওয়া, ফিরে ফিরে তাকানো, এটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 'চোখের খিয়ানত' বলেছেন।

---

[১] সুরা নুর, আয়াত : ৩০

[২] সুনানু আবি দাউদ : ২১৫১; হাদিসটি গ্রহণযোগ্য

[৩] সুনানু আবি দাউদ : ১৮১১; হাদিসটি গ্রহণযোগ্য

[৪] তাফসির ইবনু কাসির, সুরা মুমিনের ১৯নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

'খিয়ানত' মানে হলো আপনার কাছে কেউ কিছু গচ্ছিত রেখেছে, কিন্তু সেই জিনিসটা আপনি হয় অপব্যবহার করেছেন, নয়তো আত্মসাৎ করেছেন। চোখ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া অন্যতম আমানত। সেই আমানত দিয়ে যখন আমরা ভুল কিছু দেখব, তখন তা খিয়ানত নয় তো কী?

কোনো মহিলার দিকে লুকিয়ে-চুরিয়ে তাকানোটাও আল্লাহর কাছে যদি গোপন না থাকে, তাহলে আমরা যারা নিত্যনতুন 'ক্রাশ' খেয়ে ভাবনার সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে পাপের জলে অবগাহন করি, আমাদের ক্ষেত্রে কী হবে? আমরা যেটাকে 'ক্রাশ' বলছি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটাকে 'চোখের যিনা' বলেছেন।[1]

[ঘ]

তাহলে উপায়? অন্তর্দৃষ্টিতে যে বিশাল রোগ নিয়ে আমার বসবাস, সেই রোগ সারাবার পন্থা কী? মনের ভেতরে শেকড় গেড়ে বসা লালসার পাহাড়, শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কলুষিত করে রাখা অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার প্রেসক্রিপশান কী? প্রেসক্রিপশান হলো তাকওয়া। আল্লাহভীতি। আল্লাহকে ভয় করা। মনের ভেতরে সুরা যিলযালে বলা আল্লাহর এই কথাগুলো গেঁথে নেওয়া—

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨

অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে তা সে (বিচার দিবসে) দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখতে পাবে।[2]

আমি আজ যে মেয়েটির ওপর ক্রাশ খাচ্ছি, যে মহিলাকে নিয়ে আমি আজ মৌজ-মাস্তি করছি, তা আমার আমলনামায় উঠে যাচ্ছে। মোবাইল আর কম্পিউটারের বদৌলতে যে নীল দুনিয়ায় আমি বিচরণ করছি, সেই বিচরণের প্রতিটি মুহূর্ত লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে একটি অদৃশ্য আমলনামায়। ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালের অত্যাধুনিক যন্ত্রে হয়তো এই রোগ আর এই হিশেব ধরা পড়বে না, কিন্তু পুনরুত্থান দিবসে আমার সামনে আমার সকল কৃতকর্মকে উপস্থাপন করা হবে। ব্রাউজার হিস্ট্রি থেকে

[১] *সহিহ বুখারি* : ৬২৪৩, ৬৬১২; *সহিহ মুসলিম* : ২৬৫৭

[২] সুরা যিলযাল, আয়াত : ৭-৮

এক ক্লিকে মুছে দেওয়া নিষিদ্ধ সাইটের বিচরণ থেকে শুরু করে ক্যাম্পাসের সেই ক্রাশের কথা ভাবতে ভাবতে জড়িয়ে পড়া পাপ—সবকিছুই আমার সামনে হাজির করা হবে। এই রোগ থেকে বাঁচার একটাই উপায়—তাওবা। করজোড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা। এ রকম পাপে আর না জড়ানোর দৃঢ় শপথ করা। সর্বোপরি, ফরয সালাত এবং তাহাজ্জুদের সালাতে আল্লাহর কাছে অশ্রু বিসর্জনের মাধ্যমে হিদায়াত চাওয়া। যে মহান রব আমাকে চোখের মতন নিআমত দ্বারা ধন্য করেছেন, তার দরবারে আকুল ফরিয়াদে নত হওয়া।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আমরা তো স্রেফ বন্ধু কেবল

[ক]

যুবকদের দ্বীনে ফেরার পথে সবচেয়ে বড় যে প্রতিবন্ধকতা, সেটা হলো হারাম রিলেশানশিপ। এমন অনেকেই আছে যারা হয়তো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ে, রামাদানে সিয়াম রাখে, দ্বীনের ব্যাপারেও খুব আগ্রহী। কিন্তু, একটা জায়গায় এসে আটকে গেছে—হারাম রিলেশানশিপ। তাদের ধারণা, নন-মাহরাম[১] একটি মেয়ের সাথে চলাফেরা করা, একসাথে ঘুরতে যাওয়া, ফুচকা খাওয়া, সেলফি তোলা, সেই সেলফিগুলো ফেইসবুকে আপলোড দেওয়া এবং হাত ধরাধরি করে পার্কে হেঁটে বেড়ানোতে আসলে কোনো সমস্যা নেই।

হারাম রিলেশানশিপের সূচনাটা মোটাদাগে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে শুরু হয়ে থাকে। একটা ছেলে বা মেয়ে যখন নতুন নতুন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তখন তার মনে যৌবনের উত্তাল হাওয়া বইতে থাকে। সে আশা করে কলেজের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রটা তার বন্ধু হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে স্মার্ট ছেলেটা তার সাথে একই রিকশায় ঘুরে বেড়ানোতে সে অন্য রকম একটা আনন্দ পেয়ে থাকে। ডিপার্টমেন্টের সবচেয়ে সুন্দরী বান্ধবীটা ক্যান্টিনে তার সাথে বসে ফুচকা খাচ্ছে—ব্যাপারটাই তার কাছে অন্য রকম! কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে

[১] আত্মীয়তা, দুধপান অথবা শ্বশুরালয়ের সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে বিয়ে জায়েয নয়, তবে দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয, তারা হচ্ছে মাহরাম। আর যারা এর বাইরে, তাদের বলা হয় নন-মাহরাম।

থাকাকালীন আমাদের জীবনে এ রকম অনেকগুলো বন্ধু-বান্ধবী এসে ভিড় করে, যাদের আমরা মিষ্টি ভাষায় 'জাস্ট ফ্রেন্ড' বলে থাকি।

কোনো একটা ছেলে যখন নন-মাহরাম কোনো মেয়েকে নিয়ে ক্যান্টিনে বসে আড্ডা দেয় কিংবা একটা মেয়ে যখন ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র কোনো এক নন-মাহরাম বড় ভাইয়ের সাথে একই রিকশায় করে ঘুরে বেড়ায়—এই ঘটনাগুলোকে আমরা নেহাতই 'বন্ধুত্ব' বলে চালিয়ে দিই। কিন্তু এই তথাকথিত 'বন্ধুত্ব' 'জাস্ট ফ্রেন্ড'-এর নেপথ্যের ঘটনা আমরা তেমন জানতে পারি না।

এ রকম 'জাস্ট ফ্রেন্ড' রিলেশানশিপে আক্রান্ত কোনো ভাই কিংবা বোনকে যখনই আপনি বলতে যাবেন যে, তারা যা করছে বা যেভাবে চলছে তা আদৌ ইসলাম সমর্থন করে না, তখনই তারা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে। আর বলবে, 'আরে ভাই! আমরা প্রেম করছি নাকি? আমরা তো কেবল বন্ধু। আপনি আর আমি যেমন বন্ধু, এই মেয়েটা আর আমার মধ্যেও সে রকম বন্ধুত্ব। এর বাইরে আর কিছু না।'

তাদের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা রেখেই বলতে হয়—তারা যে বন্ধুত্বের কথা বলছেন, সেই বন্ধুত্ব করতে ইসলাম কখনোই অনুমতি দেয় না। তারা যদি ইসলামকে অন্য পাঁচ-দশটা ধর্মের মতো কেবল আনুষ্ঠানিক ইবাদত-কেন্দ্রিক ধর্ম মনে করে থাকে, তাহলে তারা খুব বড় ভুলের মধ্যে আছে। ইসলাম ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে ঘুমুতে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের জীবনের সকল দিক নিয়েই কথা বলে। আদতে ইসলাম কোনো ধর্ম নয়। এটা হলো দ্বীন। একটা পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। এই ইসলাম নির্ধারণ করে দেয়—আমি কার সাথে মিশব, কার সাথে মিশব না। কী খাব আর কী খাব না। কী পরব আর কী পরব না। কীভাবে চলব আর কীভাবে চলব না। পরীক্ষায় পাশ করার জন্য কিংবা ভালো রেজাল্ট করার জন্য আমরা যেমন ক্লাসের সিলেবাস ফলো করি, ঠিক সেভাবে কুরআন ও হাদিস হলো আমাদের জীবনের সিলেবাস। এই সিলেবাস অনুসরণ করা ব্যতীত আখিরাতে ভালো রেজাল্ট করা আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়।

কেবল 'জাস্ট ফ্রেন্ড' বলে যার সাথে আমি মিশছি, ঘুরছি, একসাথে খাচ্ছি, তার সাথে মেশার, ঘোরার কিংবা খাওয়ার অনুমতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে দেননি। আমার জন্য তিনি কুরআনুল কারীমে স্পষ্ট করেই বলেছেন—

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

(হে রাসুল) আপনি মুমিন ব্যক্তিদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।[১]

আয়াতটির দিকে আরেকবার খেয়াল করা যাক। এখানে মুমিন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য করেই বলা হচ্ছে। মুমিন ব্যক্তি কারা? যারা আল্লাহতে বিশ্বাস করে। রাসুল, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা ইত্যাদিতে বিশ্বাস করে তারাই হলো মুমিন। একবার চিন্তা করি, আমি কি আল্লাহতে বিশ্বাস করি? নবি-রাসুলে বিশ্বাস করি? পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম-ফেরেশতায় বিশ্বাস করি? উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে এই আয়াতটি আমার জন্য। হ্যাঁ, আমাকে উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দৃষ্টি সংযত এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে চলতে বলেছেন।

'দৃষ্টি সংযত' বলতে আসলে কী বোঝায়? তাহলে কি আমরা চোখ বন্ধ করে হাঁটব? না, ব্যাপারটা আসলে তা নয়। নবিজির হাদিস থেকে জানা যায়, তিনি বলেছেন, 'যখনই কোনো পরনারীর দিকে চোখ পড়ে যাবে, সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয়বার চোখ তুলে তার দিকে তাকানো যাবে না।[২]

আমাদের জন্য শরিয়তের সীমানা হলো—চলার পথে যদি কোনো নন-মাহরাম তথা বেগানা নারীর দিকে আমাদের দৃষ্টি চলে যায়, তাহলে সাথে সাথে সেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। দ্বিতীয় বার তাকানো যাবে না। শরিয়তের সীমারেখা যখন এমন, তখন আমরা কীভাবে বন্ধুত্বের নাম করে একজন বেগানা নারীর হাত ধরে হাঁটাহাঁটি, ঘোরাঘুরি, আনন্দ-মাস্তি-ফুর্তি করে বেড়ানোকে জায়েয মনে করতে পারি? ইসলাম যা আমাদের জন্য অনুমোদন করেনি, আমরা কীভাবে সেটাকে নিজেদের জন্য জায়েয ভাবতে পারি?

কেউ বলতে পারে, 'আমি তো তাকে কেবল বন্ধুই ভাবছি। তার ব্যাপারে কোনো খারাপ ধারণা আমার ভেতরে নেই। কখনো আসবেও না।'

[১] সুরা নুর, আয়াত : ৩০

[২] সহিহ মুসলিম : ২১৫৯

এমন ভাবনা-পোষণকারীদের একটা গল্প শোনাতে চাই। এই গল্প এমন এক সালিহ তথা নেককার ব্যক্তির যার সারাটা দিন কেটে যেত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইবাদতে। যিনি ছিলেন আগাগোড়া একজন ধার্মিক, পরহেযগার ব্যক্তি। আল্লাহর এমন এক খালিস বান্দা কীভাবে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন সেটাই ঘটনার মূল প্রতিপাদ্য।

ঘটনাটি বারসিসা নামের বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের একজন নেককার ব্যক্তির। জানা যায়, বনি ইসরাইলের লোকেরা যখন পাপের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল, যখন তাদের আগাগোড়া পাপ আর পঙ্কিলতায় ছেয়ে গিয়েছিল, তখন বিশাল একটি জনপদে কেবল বারসিসাই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল ছিলেন। আরও জানা যায়, তিনি তার প্রার্থনাগৃহে একটানা ৭০ বছর আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন ছিলেন।

একবার বনি ইসরাইলের তিনজন যুবক একটি কাজে শহরের বাইরে যাওয়ার জন্য মনস্থির করল। তাদের ছিল যুবতী এক বোন। পাপ-পঙ্কিলতার এই সময়ে তাদের বোনকে কে দেখে রাখবে—সেই চিন্তায় তারা অস্থির হয়ে উঠল। তখন বনি ইসরাইলের অন্য লোকেরা তাদের পরামর্শ দিয়ে বলল, 'পাপাচারের এই অস্থির সময়ে তোমাদের বোনকে দেখে রাখার মতো, হিফাযতে রাখার মতো বনি ইসরাইল সমাজে আর কেউ অবশিষ্ট নেই। তবে বারসিসার কাছে তোমরা তোমাদের বোনকে রেখে যেতে পারো। আমরা তাকে পাপ থেকে মুক্ত, অন্যায় থেকে দূরে এবং আমাদের মধ্যে সর্বোচ্চ তাকওয়াবান ও পরহেযগার হিশেবে জানি।'

তিন ভাই এ রকম একজন আল্লাহওয়ালা লোকের সন্ধান পেয়ে খুব খুশি এবং চিন্তামুক্ত হলো। বারসিসার কাছে এসে বোনের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করল তারা। একজন বেগানা মহিলার দায়িত্ব নেওয়ার কথা শুনেই ভয়ে কেঁপে উঠল বারসিসার অন্তর। তিনি বললেন, 'চুপ করো! আমি কখনোই এই দায়িত্ব নিতে পারব না। আল্লাহর দোহাই লাগে, তোমরা এখান থেকে চলে যাও।'

বারসিসার এমন কথা শুনে তিন ভাই মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে যাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে শয়তান তার কুমন্ত্রণা নিয়ে হাজির হলো। সে বারসিসার মনে এমন আবেগ আর দরদি যুক্তি ঢেলে দিল যাতে করে তার হৃদয় সহজেই গলে যায়। বারসিসার মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে শয়তান বলল, 'বারসিসা, তুমি কী করলে এটা! এই সরল,

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

মহৎ ভাইগুলোর এমন নিষ্পাপ আবদারকে তুমি প্রত্যাখ্যান করলে? তুমি কি মনে করেছ, তারা কাজের জন্য শহরের বাইরে চলে গেলে তাদের ছোট বোনটা নিরাপদে থাকবে? কেউ তার সম্ভ্রমহানি করবে না? তুমি কি মনে করো না যে, সে তোমার কাছেই সর্বোচ্চ নিরাপদে থাকত?'

শয়তানের পক্ষ থেকে মনে উদয় হওয়া এই প্রশ্নগুলোকে বারসিসা খুব পছন্দ করে ফেলে। তার কাছে এই কথাগুলোকে খুব যুক্তিযুক্ত এবং বাস্তবিক বলে মনে হলো। সে ভাবল, 'ঠিকই তো! সময় তো খুব বেশি ভালো না। তাদের বোন একা থাকলে যে-কারও দ্বারা নির্যাতিতা হতে পারে। তারচেয়ে ভালো হয়, যদি আমিই এই মেয়েটার দায়িত্ব নিয়ে রাখি। এতে করে সে হয়তো অন্যদের লালসার শিকার হওয়া থেকে বেঁচে যাবে।'

বারসিসা ফিরে যাওয়া তিন ভাইকে ডাক দিল। বলল, 'ঠিক আছে। আমি তোমাদের বোনের দায়িত্ব নিতে পারি। তবে শর্ত হলো, সে আমার সাথে আমার প্রার্থনাগৃহে থাকতে পারবে না। দূরে আমার একটি কুঁড়েঘর আছে। সেখানেই তাকে থাকতে হবে।'

বারসিসা তাদের বোনের যিম্মাদার হতে রাজি হয়েছে দেখে তিন ভাই-ই খুব খুশি। তারা বারসিসার শর্ত মেনে নিয়ে বোনকে তার কাছে রেখে শহরের বাইরে চলে গেল।

বারসিসা রোজ তার প্রার্থনাগৃহের সামনে মেয়েটির জন্য খাবার রেখে দরজা বন্ধ করে দিত। খাবারের পাত্র বারসিসার ঘরের সামনে থেকে নিয়ে আসত মেয়েটি। এভাবেই পার হচ্ছিল দিন। কিন্তু শয়তানের চক্রান্ত আরও গভীরে। সে আবার বারসিসার মনে কুমন্ত্রণা দিল। শয়তানের কুমন্ত্রণাগুলো ছিল আপাতদৃষ্টিতে যৌক্তিক ও বাস্তবিক। সে বারসিসার মনে এই ভাবনার উদয় ঘটাল যে, 'বারসিসা! তুমি সবসময় মেয়েটির জন্য ঘরের বাইরে খাবার রাখো। সে নিজের ঘর থেকে বের হয়ে তোমার ঘর অবধি হেঁটে এসে সেই খাবারগুলো নিয়ে যায়। আচ্ছা বারসিসা, একটা ব্যাপার কি খেয়াল করেছ? তোমার ঘর অবধি যখন মেয়েটা হেঁটে আসে, সে সময় না-জানি কত পরপুরুষ তাকে দেখে ফেলে। এটা কি ঠিক, বলো? তুমি তো চাইলে তার ঘরের দোরগোড়া পর্যন্ত খাবারগুলো রেখে আসতে পারো।'

বারসিসার মনে এই ভাবনা দাগ কাটল। সে ভাবল, 'সত্যিই তো। আমার ঘর পর্যন্ত আসতে তাকে তো অনেক পরপুরুষ দেখে ফেলে।'

বারসিসা পরের দিন থেকে আর নিজের ঘরের কাছে খাবারপাত্র না রেখে মেয়েটার ঘরের দোরগোড়ায় রেখে আসতে লাগল। এভাবে চলল আরও কিছু দিন। শয়তান তার কূটবুদ্ধি নিয়ে আবার হাজির হলো। এবার বলল, 'বারসিসা! ভারি আজব লোক তো তুমি! তার ঘরের দোরগোড়া পর্যন্ত যেতে পারো, ভেতরে গিয়ে তার সাথে দু-চারটে কথা তো বলতে পারো, তাই না? বেচারি ভাইদের অনুপস্থিতিতে কতই-না একাকী জীবন পার করছে!'

এই ভাবনাও বারসিসার মনঃপুত হলো। সে ভাবল, 'সত্যিই তো! এতদূর পর্যন্ত যখন আসি, তার সাথে দু-চারটে কথা তো বলে যেতে পারি। ভাইদের অনুপস্থিতিতে সে নিশ্চয় খুব একাকীবোধ করে।'

পরের দিন থেকে বারসিসা খাবার নিয়ে সোজা মেয়েটার ঘরের ভেতরে ঢুকতে শুরু করে। দুজনের হালকা কিছু গল্প-আলাপও হয়। সেই আলাপগুলো আস্তে আস্তে দীর্ঘ আলাপে পরিণত হয় এবং একসময় বারসিসা মেয়েটার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। সেই আসক্তি একটা পর্যায়ে শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায়।[১]

বারসিসার গল্পের এখানেই ইতি টেনে দিই। আমরা যারা 'জাস্ট ফ্রেন্ড' বলে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে জায়েয মনে করি এবং এতে ক্ষতির কিছু দেখি না বলে থাকি—আমাদের জন্য এই গল্পে ভালো রকমের শিক্ষা রয়েছে। শয়তান বনি ইসরাইল যুগের সবচেয়ে সেরা দ্বীনদার, তাকওয়াবান, আমলদার আর নেককার বান্দা বারসিসাকে যেভাবে ফাঁদে ফেলেছে, আমাদের যুবসমাজকেও ঠিক একইভাবে শয়তান ফাঁদে ফেলে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, 'দুজন নারী-পুরুষ যখন একান্তে আসে, সেখানে তৃতীয়জন হয় শয়তান।'[২]

আমরা যখন নন-মাহরাম কাউকে নিয়ে একান্তে আলাপে মত্ত হই কিংবা একই রিকশায় চেপে যাওয়া-আসা করি, তখন মাঝখানে শয়তান এসে আমাদের বিভ্রান্ত করতে থাকে। আমাদের মনে হতে পারে, 'আরে! আমার মনে তো আমার বান্ধবী সম্পর্কে কখনো খারাপ ধারণা আসে না। আমি তো কখনো ওর দিকে খারাপ নজরে তাকাই-ই না।' আমরা যারা এমন চিন্তাভাবনা মনে লালন করি, আমাদের উচিত

[১] তাফসিরে কুরতবি, সুরা হাশরের ১৬নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য

[২] জামি তিরমিযি : ২১৬৫, হাদিসটি সহিহ

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

বারসিসার ঘটনাটি আরেকবার মনোযোগ সহকারে পড়া। শয়তান কিন্তু একটিবারের জন্যও বারসিসাকে বলেনি ওই মেয়েটার সাথে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়তে; বরং শয়তান বারসিসাকে যা যা বলেছিল তা আপনার দৃষ্টিতে বাস্তবিক, মানবিক ও যৌক্তিক মনে হতে পারে। শয়তান একবারের জন্যও মেয়েটাকে ফুসলাতে কিংবা তার দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকাতে বারসিসাকে উদ্বুদ্ধ করেনি। বরং, শয়তান খুব ভালো ভালো কথা বলে বারসিসাকে মেয়েটার কাছাকাছি নিয়ে আসে। এই যে আজকে আমরা বলি, 'আমি তো ওর দিকে খারাপ নজরে তাকাই-ই না', 'ওর প্রতি আমার তো দুর্বলতা নেই' কিংবা 'আমি তো ওকে বন্ধু হিশেবেই দেখি কেবল'—এগুলো সবকিছুই শয়তানের পাতানো জাল। ফাঁদ। শয়তান আমাদের মনে এই ভাবনার উদয় করে দেয় যে, একজন নন-মাহরামের সাথে বন্ধুত্ব করা, তার সাথে বসে আড্ডা দেওয়া, ঘুরে বেড়ানো, রিকশায় চেপে আসা-যাওয়া করা, এতে আসলে কোনো সমস্যা নেই। এগুলো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। দুজন ছেলে-মেয়ের তো বন্ধুত্ব হতেই পারে।

ভুল। আপনার মাহরাম নয় এমন কারও সাথে বসে আপনি আড্ডা দিতে পারেন না, চ্যাট করতে পারেন না। ফোনে কথা বলতে পারেন না। যার সামনে আপনার জন্য পর্দা ফরয, তার সাথে কীভাবে আপনি হাত ধরাধরি করে হাঁটতে পারেন? যাকে দেখামাত্র আপনার জন্য দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া ফরয, তার সাথে কীভাবে আপনি বন্ধুত্ব পাতাতে পারেন? ক্যাম্পাসে আড্ডা দিতে পারেন? রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ্যাট করতে পারেন? ফোনে কথা বলতে পারেন?

কুরআনের আরেকটি আয়াতের দিকে লক্ষ করা যাক—

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

(হে নবি-পত্নীগণ!) তোমরা অন্য নারীদের মতো নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে (পরপুরুষদের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। এতে করে (যদি তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো) যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, সে প্রলুব্ধ হয় আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।[১]

[১] সুরা আহযাব, আয়াত : ৩২

এই আয়াতে যদিও নবিজির স্ত্রীগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, তথাপি তাফসিরকারকগণ বলেছেন, এটা সকল মুমিন নারীর জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নারীদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'তোমরা পরপুরুষদের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না।' এটাই হচ্ছে ইসলামের সীমারেখা। আপনি যখন নিজেকে একজন মুমিন নারী হিশেবে দাবি করবেন, তখন আপনি কখনোই আপনার ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র ভাইটাকে মিষ্টি স্বরে 'ভাইয়া' বলে সম্বোধন করবেন না। আপনি কখনোই নন-মাহরাম কারও সাথে মিষ্টি গলায় কথা বলবেন না, আড্ডা দেবেন না। এতে করে তারা আপনার গলার, আপনার মিষ্টি স্বরে প্রলুব্ধ হবে এবং আপনার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলে, আপনাকে নিয়ে, আপনাকে ঘিরে তারা কুৎসিত চিন্তায় মত্ত হবে। তাদের একান্ত মুহূর্তগুলোতে কল্পনায় আপনাকে নিয়ে তারা কত ধরনের বাজে চিন্তা যে করবে তা ভাবতেই আপনার গা গুলিয়ে উঠবে।

'জাস্ট ফ্রেন্ড'-এর কোনো ধারণা ইসলামে নেই এবং এই ধারণা ইসলামের মৌলিক, বুনিয়াদি শিক্ষার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। নিজেকে মুমিন-মুসলিম দাবি করা কোনো ছেলে অবশ্যই বেগানা কোনো নারীর হাত ধরাধরি করে হাঁটতে পারে না। একজন মুমিন নারী কখনোই বেগানা কোনো পুরুষের সাথে রিকশায় চেপে চলাচল করতে পারে না, পার্কে পাশাপাশি বসে আড্ডা দিতে পারে না। এসবগুলোই তার জন্য হারাম।

চলুন, আমরা নিজেদের কেবল তার জন্যই সংরক্ষণ করি যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। যে আমার স্ত্রী হবে তার জন্যই যৌবনকে হিফাযত করি। তার সাথেই রাতে জোছনা দেখার জন্য, সমুদ্রের পারে তার হাত ধরে হাঁটার জন্য, গোলাপ হাতে তাকে 'ভালোবাসি' বলার জন্য, বর্ষার রিমঝিম বৃষ্টিতে তাকে নিয়ে ভেজার জন্য অপেক্ষা করি। এই স্থান, এই অধিকার, এই মুহূর্তগুলো অন্য কাউকে যেন দিয়ে না বসি। আমার ওপর আমার স্ত্রীর একেবারে প্রথম অধিকার হলো এই—আমি আমার জীবন, যৌবনকে তার জন্য হিফাযত করে চলব।

আপনার ভবিষ্যৎ স্বামীর জন্য আপনার রূপ-লাবণ্যকে হিফাযত করুন। কেবল তার জন্যই না হয় সাজলেন। তার হাত ধরাধরি করে বৃষ্টিবিলাস উপভোগ করলেন। বিশ্বাস করুন, আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে কখনোই সুখ নেই, শান্তি নেই। আল্লাহর বিধান মেনে নিজেকে একটিবার পরিবর্তন করেই দেখুন না! যে নন-মাহরাম

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

ছেলেটার হাত ধরে আছেন, সেই হাত আজকেই ছেড়ে দিন। এই মুহূর্ত থেকে তাকে সাফ জানিয়ে দিন তার আর আল্লাহর মাঝে আপনি সবসময় আল্লাহকেই বেছে নিবেন। তাকে আরও জানিয়ে দিন, কেবল আল্লাহর জন্যই আপনি আজ থেকে তার সাথে সমস্ত সম্পর্কের ইতি টেনে দিলেন। দেখবেন, আপনার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবকিছু কত সহজ করে দিবেন!

যে মেয়েটাকে ক্যাম্পাসে না দেখলে আপনার হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়, তাকে আজকেই জানিয়ে দিন আপনার পরিবর্তনের কথা। তাকে বলে দিন আজ থেকে আপনি আর তাকে নিয়ে ভাবছেন না। কাউকে নিয়েই আপনি আর ভাবেন না; আল্লাহ ছাড়া। তাকে আরও বলুন, আল্লাহর জন্যই আপনি তাকে ত্যাগ করলেন। তার সাথে কাটানো সকল স্মৃতি, সকল মুহূর্তকে আল্লাহর জন্যই মন থেকে মুছে দিলেন। আল্লাহর দিকে এক বিঘত আগান, তিনি আপনার দিকে এক বাহু অগ্রসর হবেন।[1]

[খ]

রিলেশানশিপ মানে আমরা কেবল 'প্রেম' করাকেই বুঝি। অথচ রিলেশানশিপের মধ্যে আমাদের তথাকথিত 'জাস্ট ফ্রেন্ড' 'বন্ধু'-সহ যাবতীয় সম্পর্কই অন্তর্ভুক্ত। যার সামনে পর্দাবিহীন যাওয়ার, যার সাথে অহেতুক কথা বলার, সময় কাটানোর কিংবা ঘুরে বেড়ানোর অনুমতি আমার নেই, তার সাথে আমি যে নামে কিংবা যে অভিধায় সম্পর্ক রাখিই না কেন—এ সমস্তকিছুই হারাম রিলেশানশিপের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা আমার জন্য হারাম করেছেন। এই হারাম রিলেশানশিপের দৌড় কতটুকু সেটা ভুক্তভোগী না হলে টের পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। হারাম রিলেশানশিপের পাপকে বৈধতা দিতে শয়তান সবসময় তার বাহারি যুক্তি নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। ঠিক এজন্যেই এর সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে আমরা ভাবতে পারি না। আসলে শয়তান চায় না আমরা এতদূর ভাবি। সে আমাদের চোখের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছে একটা রঙিন পর্দা। সেই পর্দা হলো—'আপনি ভালো তো জগৎ ভালো!'

খুব সম্প্রতি তিনটে ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। খুব সম্প্রতি বলছি এজন্যেই, কারণ, এই লেখাটা যখন লিখতে বসেছি, তার ঠিক মাস দুয়েকের মাঝেই এই

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৭৪০৫; *সহিহ মুসলিম* : ২৬৭৫

ঘটনাগুলো ঘটে। প্রথম ঘটনা দেশের প্রথিতযশা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের। খবরে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কতগুলো মৃত নবজাতকের লাশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাস্টবিন! নবজাতকের লাশ! চোখের সামনে কোন দৃশ্যটা ভেসে উঠছে বলুন তো? কিছু কপোত-কপোতি। একত্র হয়েছিল যৌবনের উন্মত্ত উন্মাদনায়। একেবারে শুরুর দিকে তারা ছিল কেবলই 'জাস্ট ফ্রেন্ড।' আর কিচ্ছু না। তাদের মাঝে 'বন্ধুত্ব' ছাড়া আর কোনো সম্পর্কই ছিল না। একে অন্যের জন্য নোট তৈরি করত। ক্যাম্পাসে একজন অন্যজনের জন্য অপেক্ষা করত। বিনীত বিকেলগুলো তারা পার করত বাহারি রঙের আর বাহারি পদের আড্ডা দিয়ে। একটা সময় সেই 'জাস্ট ফ্রেন্ড' সম্পর্ককে শয়তান টেনে নিয়ে গেছে একটি অবৈধ, অনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত। এরপর কী হলো? যখন চোখের সামনে থেকে উন্মাদনার পর্দাটা সরে গেল, যখন কেটে গেল যৌবনের তাড়নামিশ্রিত সকল মোহ, যখন রঙিন দুনিয়ার ডিঙি নৌকা থেকে তারা বাস্তবের দুনিয়ায় এসে নোঙর করল, তখন অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করল যে, তাদের কৃতকর্মের ফল দুজনের কেউই আর বয়ে বেড়াতে চায় না। তাদের এই সম্পর্কের জেরে ভ্রূণ হয়ে বেড়ে ওঠা আরেকটা নিষ্পাপ শরীরকে জন্মের আগেই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। যে শরীরটির থাকার কথা ছিল বাবা-মার আদরমাখা কোল আর দোলুনির দোলনায়, সেই শরীরের স্থান হয়েছে পচা ডাস্টবিনের আস্তাকুঁড়ে! জাহিলিয়াতের চরম অধঃপতনের যুগেও এ রকম দৃশ্যের দেখা মেলা ভার!

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে ঢাকার মিরপুর এলাকায়। এক কাক ডাকা ভোরে, অভিজাত মিরপুর এলাকায় দেখা গেল ভয়ানক একটি দৃশ্য। রাস্তার ধারে পড়ে থাকতে দেখা গেল একটি নবজাতকের লাশ। দেখে মনে হলো এইমাত্রই ভূমিষ্ঠ হওয়া। এমনকি মায়ের পেটে যে অমরার (প্লাসেন্টা) মাধ্যমে সে খাদ্যগ্রহণ করত, সেই অমরাটিও দড়ির মতো বাচ্চাটির গায়ে আষ্টেপৃষ্ঠে ছিল। কী ভয়ংকর দৃশ্য ভাবুন! দুজন মানুষের নিষিদ্ধ আবেগ আর কামনার বলি হতে হলো একটি নিষ্পাপ প্রাণকে। তার কি কোনো অপরাধ ছিল? সে কি বলেছে যে তোমরা আমাকে যেনতেনভাবে জন্ম দিয়ে পৃথিবীর আলো দেখাও?

তৃতীয় ঘটনাটা ঢাকার এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের। আমরা বাড়িতে বিয়ে হতে দেখেছি। বিয়ে হতে দেখেছি মসজিদ আর কাজী অফিসেও। কিন্তু হাসপাতালের বেডে বিয়ে হয়েছে—এমন ঘটনা শুনেছেন কখনো? ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছে ঢাকার এনাম মেডিকেল কলেজে। একটা মেয়ে ওই হাসপাতালে ভর্তি। ডেলিভারি কেইস।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

কিন্তু মেয়েটার বিয়ে হয়নি। বিয়েই যদি না হবে, তাহলে বাচ্চার প্রশ্ন আসে কীভাবে? যৌবনের উন্মত্ততায় ডুবে কোনো এক 'জাস্ট ফ্রেন্ড'-এর সাথে মেয়েটা সম্পর্ক জুড়িয়ে বসেছিল। আর ফলাফল যা হবার তা-ই হলো। ছেলেটা সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারে এই ভয়ে মেয়েটা ভ্রূণ নষ্ট করেনি। ব্যস, হাসপাতালের বেডে, দুই পক্ষের লোকজন মিলে ছেলে-মেয়ে দুটোকে বিয়ে দিয়ে দিল।

হারাম রিলেশানশিপ দুজন মানুষকে পাপের সাগরে কীভাবে ডুবিয়ে দিতে পারে, ওপরের ঘটনা তিনটি তার জলজ্যান্ত উদাহরণ! প্রথম দেখাতেই ভালো লাগা। এরপর বন্ধু হওয়া। ক্যাম্পাসে আড্ডা দেওয়া। ফোনে-চ্যাটে দিনরাত সময় পার করা, ঘুরতে যাওয়া, একসাথে খাওয়া ইত্যাদির পরে একদিন তারা জড়িয়ে পড়ে একটি অবৈধ সম্পর্কে। ডুব দেয় নিষিদ্ধ আবেগের অতল গহ্বরে। সেই ডুবের ফলাফল হয় ভ্রূণহত্যা, আত্মহত্যা কিংবা হাসপাতালের বেডে বিয়ে! যেই সম্পর্কে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘিত হয়, যে সম্পর্কে আল্লাহর অসন্তুষ্টি, সেই সম্পর্কের সূচনা থেকে সমাপ্তি—কোথাও কোনো শান্তি আছে কি?

[গ]

'হারাম রিলেশানশিপ' শব্দদ্বয় শুনলে আমাদের চোখের সামনে একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে। আমরা মনে করি, হারাম রিলেশানশিপ মানে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া দুটো ছেলেমেয়ে একসাথে খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘুরছে, প্রেম করছে, অনৈতিক সম্পর্কে ডুব দিচ্ছে। এটুকুই। অথচ বিয়ের পরেও যদি কোনো পুরুষ ঘরে স্ত্রী রেখে অন্য মহিলার সাথে অনৈতিক, অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে, তবে সেটাও হারাম রিলেশানশিপ। স্বামীর অগোচরে স্ত্রী যদি কোনো পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক করে, হাসে-মাতে, বিভিন্ন অনৈতিক, অশ্লীল, অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, এটাও হারাম রিলেশানশিপ। এক কথায়, এ ধরনের সম্পর্কগুলোকে 'পরকীয়া' বলা হয়। এই রোগ আমাদের সমাজে বর্তমানে মহামারির আকার ধারণ করেছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল সমাজে বিদ্যমান এই পাপের কারণেই প্রতিদিন অসংখ্য পরিবারে ভাঙন ধরে। উত্তর আধুনিক সমাজে ডিভোর্সের যে মহামারি অবস্থা আমরা অবলোকন করি, তার অন্যতম প্রধান কারণই হলো এই পরকীয়া।

একবার এক লোক একজন শাইখকে বললেন, 'শাইখ, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে আর ভালো লাগে না। কী করা যায় বলুন তো?'

শাইখ জানতে চাইলেন, 'কেন? তোমার স্ত্রীর পূর্বের রূপ-লাবণ্য কি লোপ পেয়েছে?'

লোকটা বলল, 'জি না, শাইখ। সে আগের মতোই আছে।'

'তাহলে তার কি কোনো অঙ্গহানি হয়েছে যার কারণে তুমি তাকে আর পছন্দ করতে পারছ না?'

'না, শাইখ। তার কোনো রকম অঙ্গহানি হয়নি।'

'সে কি তোমার প্রতি উদাসীন?'

'একেবারেই না শাইখ। সে আগের মতোই আমাকে ভালোবাসে। দেখাশোনা করে। যত্ন করে।'

এরপর শাইখ বললেন, 'ঠিক আছে। এবার তাহলে তোমার কথা বলো। তুমি কি আজকাল পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত হয়ে পড়েছ? তুমি কি বেগানা নারীদের কাছ থেকে নিজের দৃষ্টিকে হিফাযত করে চলতে পারো? তুমি কি অন্য কারও সাথে কোনো অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছ?'

লোকটি মাথা নিচু করে বলল, 'জি, শাইখ! আমি আজকাল পর্নোগ্রাফিতে খুব মারাত্মকভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছি। আমি আমার দৃষ্টিকে হিফাযত করে চলতে পারি না। আর ইতোমধ্যে একটা অনৈতিক সম্পর্কেও জড়িয়ে পড়েছি।'

শাইখ তখন বললেন, 'তুমি যখন হারামে ডুব দেবে, হারাম জিনিসকে পছন্দ করা শুরু করবে, তখন হালাল জিনিসকে তোমার কাছে ভালো লাগবে না। বিরক্তিকর লাগবে। এটাই স্বাভাবিক।'

ব্যাপারটা আসলেই তা-ই! আমরা যখন মিউজিক, গান-বাদ্য-বাজনা পছন্দ করা শুরু করি, তাতে আসক্ত হয়ে পড়ি, তখন কুরআনের সুর আমাদের কানে পানসে ঠেকে। আমরা যখন স্বামী-স্ত্রীর মতো হালাল সম্পর্ক বাদ দিয়ে অন্যায়, অবৈধ, অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি, আমাদের কাছে তখন হালাল সম্পর্কগুলোকেই বিরক্তিকর মনে হয়। মনে হয়, এই সম্পর্কের মায়াজাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারলেই যেন আমাদের মুক্তি! এই অনীহা, অনিচ্ছা, ভালো না লাগা একসময় রূপ নেয় ডিভোর্সের মতন সিদ্ধান্তে। ফলে আমাদের পরিবারগুলো ভেঙে খানখান হয়ে যায়। একটা অনৈতিক সম্পর্ক মাঝখানে নষ্ট করে দেয় অনেকগুলো মানুষের জীবন আর স্বপ্ন। লন্ডভন্ড করে দেয় তিলে তিলে গড়ে তোলা কারও নিজস্ব জগৎ।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

[ঘ]

এই পর্যায়ে কেউ কেউ যুক্তি তুলে ধরতে পারেন। বলতে পারেন, 'ভাই! ব্যাপারটাকে আপনি যতটা সরলীকরণ করেছেন, সেটা আসলে অতটা সরল নয়। ক্যাম্পাসের কোনো এক বান্ধবীর সাথে বসে আড্ডা দিলে কিংবা অফিসের কোনো মেয়ে কলিগের সাথে অবসরে বসে কফি খেলে সেটা তো আর অনৈতিক সম্পর্কে গড়ায় না। এটা জাস্ট ফ্রেন্ডলি ব্যাপার!'

শাইখ আলি তানতাবি রাহিমাহুল্লাহর একটা কথা আমার খুব পছন্দের। তিনি বলেছেন, 'কিছু যুবক বলে থাকে তারা মেয়েদের চরিত্র ও ভদ্রতা ছাড়া আর নাকি কিছুই দেখে না। মেয়েদের সাথে তারা নাকি বন্ধুর মতোই কথা বলে এবং মেয়েদের বন্ধুর মতোই ভালোবাসে। মিথ্যে কথা! আল্লাহর শপথ, এসব মিথ্যে কথা! যুবকেরা তাদের আড্ডায় তোমাকে নিয়ে যে ধরনের কথা বলে তা যদি শুনতে পেতে, তাহলে তুমি ভয়ে চমকে উঠতে।'

শাইখ তানতাবির কথাগুলোর নিরেট বাস্তবতা আছে। দুজন বন্ধুর একাকী আলাপের মাঝে তাদের সুন্দরী বান্ধবীটা সম্পর্কে কী ধরনের কথাবার্তা উঠে আসে তা না শুনলে বিশ্বাস করাটাই দুরূহ! সেই রগরগে আলোচনাগুলো যদি সেই বান্ধবী শুনতে পেত, তাহলে সে কোনোদিনও আর তাদের মুখ দেখত না।

আপনি বলতে পারেন, কেবল কথা বললেই কিংবা তাকালেই কি পাপ হয়ে যায়? জি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'চোখের যিনা হলো চোখ দিয়ে দেখা। জিহ্বার যিনা হলো সেই জিহ্বা দিয়ে (অশ্লীল, রগরগে) কথা বলা। হাতের যিনা হলো পরনারীকে (খারাপ উদ্দেশ্যে) স্পর্শ করা। পায়ের যিনা হলো ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া এবং মনের যিনা হলো (ব্যভিচারের) ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা করা। আর এ সবকিছুকে কাজে রূপান্তর করে মানুষের গুপ্তাঙ্গ।'[১]

হাদিসের ভাষ্য এখানে খুবই স্পষ্ট। চোখ দিয়ে আপনি ক্যাম্পাসের যে বান্ধবীটার রূপলাবণ্য উপভোগ করছেন, আপনি আসলে সেখানে যিনা করছেন। চোখের যিনা। তার হাতে ফুল গুঁজে দেওয়ার নাম করে অথবা বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে তার হাত স্পর্শ করার যে কায়দা আপনি করে থাকেন, তা আসলে যিনা। হাতের যিনা।

---

[১] *সহিহ বুখারি : ৬২৪৩, ৬৬১২; সহিহ মুসলিম : ২৬৫৭*

বন্ধুদের সাথে একান্ত আড্ডায়, চ্যাটে কিংবা মোবাইল ফোনে বান্ধবীদের নিয়ে যে অশ্লীল, কুৎসিত আলাপে আপনি মেতে ওঠেন, তাও একপ্রকার যিনা। জিহ্বার যিনা। বান্ধবী কিংবা কলিগের হাত ধরার জন্য, তার পাশে বসার জন্য, তার কথা শোনার জন্য আপনার মন যখন আকুপাকু করে, তখনো আপনি আসলে যিনা করেন। মনের যিনা। এই একান্ত কামনাগুলো মেটানোর উদ্দেশ্যে আপনি যখন ঘর থেকে বের হন, তখনো আপনি যিনার মধ্যেই থাকেন। পায়ের যিনা।

সুতরাং 'একটু কথা বললে সমস্যা কী?' 'একটু হাত ধরলে আপত্তি কীসের?' 'আমরা তো আর প্রেম করছি না, বন্ধুই তো'—এ সমস্ত কথা আসলে ঠুনকো অজুহাত মাত্র। শয়তানের একটা চোরা ফাঁদ। একটা রঙিন চশমা যা পরলে দুনিয়াটাকেই রঙিন রঙিন মনে হয়।

[ঙ]

হারাম রিলেশানশিপের প্রতি পদেই ওঁৎ পেতে আছে বিপদ। এমন সম্পর্কে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাপের ছড়াছড়ি ছাড়া প্রাপ্তির খাতায় আর কোনো কিছু ওঠার সম্ভাবনা নেই। অপরদিকে হালাল রিলেশানশিপের দিকে তাকান। কত সুন্দর আর মধুর এই সম্পর্ক! স্ত্রীর দিকে আপনি যখন মায়াভরা দৃষ্টিতে তাকান, যখন আপনি স্ত্রীর মুখে ভালোবেসে খাবার তুলে দেন, আপনি যখন স্ত্রীর জন্য উপহার নিয়ে আসেন, তাকে নিয়ে ঘুরতে যান, তার পাশে বসে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তার গল্প শোনেন—এ সবকিছুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার জন্য সাওয়াব বরাদ্দ রেখেছেন। ফেরেশতারা তখন আপনার জন্য সাদাকার সাওয়াব লিখে ফেলে। অন্যদিকে হারাম রিলেশানশিপে আপনি বেগানা নারীর দিকে তাকালে, তাকে স্পর্শ করলে, তার সাথে কথা বললে, তার কথা চিন্তা করলে আপনার আমলনামায় গুনাহ যুক্ত হয়ে যায়।

হারাম রিলেশানশিপের অপর নাম দেওয়া যায় যিনা। আর যিনার শাস্তি খুবই ভয়াবহ। দুনিয়াতেও, আখিরাতেও। হারাম রিলেশানশিপ থেকে বেরিয়ে আসাটা খুব সহজ নয়। সহজ নয় তাদের জন্য যারা দ্বীনটাকে মন থেকে মেনে নিতে পারে না। যারা নিজেদের আত্মাকে আল্লাহর বদলে শয়তানের কাছে জমা দিয়ে রেখেছে, তাদের জন্য পতনের এই চোরাবালি থেকে মুক্তিলাভ দুঃসাধ্য। তবে যারা আল্লাহর হয়ে যেতে চায়, যাদের জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সবকিছুই আল্লাহর ভালোবাসা, অনুগ্রহ আর দয়াকে ঘিরে আবর্তিত হয়, তাদের জন্য এটা মোটেও কঠিন নয়। আল্লাহর দিকে

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

যারা মন থেকে ফিরে আসতে চায়, আল্লাহ তাদের জন্য সকল প্রতিবন্ধকতাকে সহজ করে দেন। তাদের হৃদয়ে ঢেলে দেন প্রশান্তির সুনির্মল সুবাস। সেই সুবাসে বান্দা রাঙিয়ে নেয় তার যাপিত জীবন। আল্লাহর দিকে ফিরে আসার জন্য খুব জমকালো আয়োজনের দরকার হয় না। কেবল আন্তরিক তাওবা আর চোখের পানিই তো!

চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়

[ক]

ঘটনাটি শাইখ মুহাম্মাদ আল আরিফীর কাছ থেকে শোনা। শাইখের কাছে একবার এক ছেলে এসে বলল, 'শাইখ! ইন্টারনেটের ব্যাপারগুলো খুব ভালো বোঝে এ রকম আমার একটা বন্ধু ছিল। সে আবার পর্নোগ্রাফিতেও ছিল ভীষণরকম আসক্ত। একবার সে একটা পর্ন সাইটে ঢুকে সেখানে সাবস্ক্রাইব করে ফেলে। সে যে সাইটে সাবস্ক্রাইব করেছিল, ওই সাইটে ফ্রিতে পর্নোগ্রাফি দেখা যেত না, বরং টাকার বিনিময়ে পর্নোগ্রাফির ফাইল ইমেইল করত ওরা। সে যখনই পর্নোগ্রাফির নতুন কোনো ফাইল রিসিভ করত, সেটা মোবাইলে ডাউনলোড করে নিয়ে পরে আমাদের দেখাত। আমরাও উপভোগ করতাম ভিডিওগুলো। অবাক হতাম, এত নিত্য-নতুন ভিডিও সে কীভাবে সংগ্রহ করে সেটা ভেবে।

যখন তার কাছে জানতে চাইতাম সে এগুলো কীভাবে, কোত্থেকে সংগ্রহ করে, তখন সে আমাদের আগ্রহকে একপ্রকার হেসেই উড়িয়ে দিত আর বলত, 'আরে ধুর! এগুলো টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করি।' আমরা বললাম, 'সমস্যা নেই, আমরাও টাকা দিয়ে সংগ্রহ করব। তুই আমাদের বল এগুলো কোথায় পাস?' আমাদের কথা শুনে সে বলল, 'তোরা শুধু শুধু টাকা নষ্ট করবি কেন? তারচেয়ে এক কাজ করা যাক। তোরা তোদের ইমেল এড্রেসগুলো আমাকে দে। আমি নতুন ভিডিও ফাইল পাওয়ামাত্রই তোদের সবাইকে একসাথে পাঠিয়ে দেবো।'

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

তার প্রস্তাবটা আমাদের খুব মনে ধরল। ভাবলাম, 'ভালোই তো। আমাদের টাকাগুলো বাঁচল, আবার ভিডিওগুলোও পাওয়া যাবে।' আমরা আমাদের এবং আমাদের বন্ধুদের ইমেইল এড্রেস সংগ্রহ করে ওর কাছে দিলাম। পরের সপ্তাহ হতে তার ইমেইল আইডি থেকে আমরা নতুন নতুন পর্নোগ্রাফির ফাইল পেতে শুরু করি। এভাবে কেটে গেল ছয় মাস।

একদিন হঠাৎ রোড এক্সিডেন্টে আমাদের সেই বন্ধুটা মারা যায়। ওর মৃত্যুতে আমরা সবাই প্রচণ্ডরকম ধাক্কা খেলাম। শাইখ, ওর জানাযার সালাত পড়ে যখন ওকে কবরে শুইয়ে দিয়ে বাসায় এলাম, তখন আমার ফোনে নতুন একটা ইমেইলের নোটিফিকেশান আসে। নোটিফিকেশান চেক করতে গিয়ে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ি। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, যে বন্ধুটাকে আমি একটু আগে কবরে শুইয়ে রেখে এসেছি, তারই ইমেইল আইডি থেকে আমার ইমেইলে নতুন পর্নোগ্রাফির ফাইল এসে জমা হয়েছে। ভাবলাম হয়তো পুরাতন কোনো ইমেইল হবে। এই ভেবে সেবার এড়িয়ে গেলাম ব্যাপারটা। কিন্তু পরের সপ্তাহে দেখলাম ওর ইমেইল থেকে আবারও নোটিফিকেশান। এবারও পর্নোগ্রাফির ফাইল এসে জমা হয়েছে। আমি ইমেইলটা ভালোমতো চেক করলাম। দেখলাম এটা পুরোনো ইমেইল নয়। একেবারে নতুন। সাথে সাথেই ব্যাপারটা আমি বুঝে গেলাম। ও নিশ্চয় ইমেইলের 'অটো ফরওয়ার্ড' অপশান অন করে রেখেছিল যার দরুন ও নতুন নতুন যেসব ভিডিও ফাইল রিসিভ করছে, সেগুলো একইসাথে আমাদের আইডিতেও চলে আসছে।

আমি উক্ত সাইটের অথোরিটির সাথে যোগাযোগ করলাম। ইমেইল করে তাদেরকে জানালাম যে, আমার ওই বন্ধুটি এখন মৃত। তাই তারা যেন তার আইডিতে এসব ভিডিও পাঠানো বন্ধ করে দেয়। ওই সাইটের লোকজন আমার কাছে তার ইমেইলের পাসওয়ার্ড চাইল। পাসওয়ার্ড জানা না থাকায় আমি দিতে পারলাম না। তারা বলল, 'দুঃখিত! তাহলে আমাদের আর কিছুই করার নেই। এই ব্যক্তির এখনো সাড়ে চার বছরের সাবস্ক্রিপশন বাকি। পরবর্তী সাড়ে চার বছর তার ইমেইলে আমাদের ভিডিও ফাইল অটো চলে যাবে। সাবস্ক্রিপশন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আপাতত।'

শাইখ! আজ প্রায় দুবছর হয়ে যাচ্ছে আমার বন্ধু কবরে শুয়ে আছে। অথচ ওর ইমেইল আইডি থেকে প্রতি সপ্তাহে সে আর তার সাথে সাথে আমরাও অশ্লীল ভিডিওগুলোর ফাইল রিসিভ করে যাচ্ছি।'

ঘটনাটা এখানেই সমাপ্ত। এটা এমন এক জীবনের উপাখ্যান যেখানে পাপের বোঝা মৃত্যুর পরও বয়ে বেড়াতে হচ্ছে তাকে। কবরে থেকেও পেতে হচ্ছে অশ্লীল ভিডিও। এটা এমন এক জাহিলিয়াতের মৃত্যু, যেখানে পাপের ভার কবরের চাপের পরও মাথা থেকে নামতে চাইছে না। যে ছেলেটা এ রকম সাইটে চারটে বছরের জন্য সাবস্ক্রিপশন করে রেখেছে এবং তা বন্ধুদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার সু-বন্দোবস্তও করে গেছে, তার পাপটা কি সংক্রামক নয়? সে নিজে যে পাপে আক্রান্ত, জর্জরিত, একই পাপ সে আরও অনেকের মাঝেও ছড়িয়ে দিয়ে গেছে।

যারা পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত, তারা বুঝতে পারে না কত বিশাল বড় পাপের পাহাড় তারা দুনিয়ায় তৈরি করছে। এ রকম ভিডিওগুলোতে তাদের একটা 'ভিউ' অনেক কিছু নির্দিষ্ট করে দেয়। খুলে দেয় অনেক কিছুর পথ। এই ভিডিওগুলোর নিহিতার্থ কেবলই বিনোদন কিংবা মনোরঞ্জন নয়। মোটাদাগে ব্যবসা। তাই এসব ভিডিওতে আপনার একটা ভিউ এ রকম আরও দশটা ভিডিও বানানোর পথকে সুগম করে। একটা ভিউ এ রকম আরও অনেকগুলো ভিডিও বানানোর পেছনে ভূমিকা রাখে। ফলে যতদিন পর্যন্ত এ রকম ভিডিও বানানো হবে এবং ইন্টারনেটে ছড়ানো হবে, তার পেছনে আপনার একটা ভিডিয়ের ভূমিকাও চলমান থাকবে।

প্রতিটা খারাপ কাজ আরও অনেকগুলো খারাপ কাজের কারণ। প্রতিটা মিথ্যা কথা আরও অনেকগুলো মিথ্যা কথার জনক। প্রতিটা অসততা আরও অনেকগুলো অসততার সূত্রপাত। পাপ একপ্রকার সংক্রামক। সেটা ছড়িয়ে পড়ে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে।

ছেলেটা জীবনলীলা সাঙ্গ করে চলে গেছে। অথচ জারি রেখে গেছে একটা পাপের মেশিন। সেই মেশিনে নিত্য উৎপন্ন হচ্ছে হরেক পদের পাপ। আর মৃত্যুর পরেও তার আমলনামায় যোগ হচ্ছে সেই পাপের দায়। ভয়াবহ! মৃত্যুর পরও রেহাই নেই। চলে গেছে, কিন্তু প্রস্থান হয়নি।

অপরদিকে, আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারও চলে গেছেন। রাহিমাহুল্লাহ। আল্লাহ যেন তাকে সবটুকু মায়া-মমতা দিয়ে জড়িয়ে রাখেন। উম্মাহর জন্য তিনি রেখে গেছেন কিছু অমূল্য সম্পদ। তার বইগুলো আজও বুভুক্ষু হৃদয়ে প্রশান্তির প্রলেপ লাগায়। তার কাজগুলো থেকে কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মাহ উপকৃত হবে। কত পথহারা পথিক খুঁজে পাবে পথ। কত দিশেহারা নাবিক খুঁজে পাবে কূল। এই কাজগুলো থেকে যতদিন উম্মাহ উপকৃত হবে, ততদিন কি আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আমলনামাতেও সেই সাওয়াব পৌঁছে যাবে না? সাদাকায়ে জারিয়া হিশেবে স্যারের আমলনামাও নিত্য ভারী হবে, ইন শা আল্লাহ। আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারও চলে গেছেন। তবে ওই যে, সব চলে যাওয়াই প্রস্থান নয়...

[খ]

মানুষেরা ব্যাংকে টাকা জমিয়ে, ইন্সুরেন্স করে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত সময়ের জন্য অগ্রিম টাকা জমিয়ে তারা জীবন থেকে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি কমাতে চায়। ক্ষুদ্র এই জীবনের একটু নিরাপত্তা, একটু ভালো থাকা, একটু বাড়তি আয়েশের জন্য আমরা কত বাহারি আয়োজনই-না করি প্রতিনিয়ত। অথচ আমাদের সামনে যে অনন্ত জীবনের হাতছানি, যে অপার সময়ের স্রোতে আমাদের ভাসতে হবে অনন্তকাল, সেই জীবনের নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, ভালো থাকা আর আরাম-আয়েশ নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাদের চিন্তাচেতনা, ধ্যানজ্ঞান সবকিছু আবর্তিত হচ্ছে দুনিয়াকে কেন্দ্র করে। আখিরাতের রসদ গোছানোর জন্য আমাদের যেন কোনো তাড়া নেই। কিন্তু চক্ষু মুদলেই কি প্রলয় থেমে যায়? যায় না। মৃত্যুকে আলিঙ্গান করতে আমাদের যতই অনীহা-অনিচ্ছাই থাকুক, মৃত্যুর চেয়ে সত্য আমাদের জীবনে আর কিছু নেই। দুনিয়ার কঠিন বাস্তবতা হলো এই—একদিন আমাদের মৃত্যু হবে। নশ্বর এই পৃথিবীর পাট চুকিয়ে আমাদের পাড়ি জমাতে হবে এক অনন্ত জীবনের পথে।

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সাথে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। আমরা প্রবেশ করি অন্য এক জগতে। তবে, মৃত্যু দুনিয়া থেকে আমাদের মুছে দিতে পারলেও, মুছে দিতে পারে না আমাদের কর্ম। সময়ের পাটাতনে সেই কর্মগুলো অনস্তিত্বের মাঝেও আমাদের অস্তিত্বশীল করে তোলে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, কেবল তিনটি আমল ছাড়া। দান-সাদাকা, উপকারী জ্ঞান এবং নেককার সন্তানসন্ততি।'[১]

অর্থাৎ দুনিয়ায় যখন আমাদের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না, তখনও এই তিনটি কর্ম আমাদের জন্য সাদাকা হিশেবে জারি থাকবে। কবরে আমাদের জন্য নতুন নতুন সাওয়াব পাঠাবে। সেই সাওয়াব যুক্ত হবে আমাদের আমলনামায়। আমলের ঘাটতির

[১] সহিহ মুসলিম : ১৬৩১

কারণে যখন আমরা আল্লাহর কোনো পরীক্ষায় আটকে পড়ব, সাদাকায়ে জারিয়ার এই সাওয়াবগুলো তখন হতে পারে আমাদের নাজাতের ওয়াসিলা। আখিরাতের এই ব্যাংক সেদিন আমাদের জন্য হয়ে উঠতে পারে বিপদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। আখিরাতের জন্য এমন একটি চলমান ব্যাংক তৈরি করতে হলে আমাদের কী করতে হবে? খুব সহজ! কেবল তিনটি কাজে জোর দিতে হবে।

সাদাকায়ে জারিয়া

সাদাকায়ে জারিয়া একটি চলমান সাওয়াব ব্যাংকের নাম। এই ব্যাংক নিত্য-নতুন সাওয়াব উৎপন্ন করে চলে। ধরুন, আপনার অনেক টাকাপয়সা। সেই অনেক টাকাপয়সা থেকে আপনি কোথাও একটি মসজিদ নির্মাণ করে দিলেন। এখন সেই মসজিদে যতদিন আযান হবে, যতদিন সেখানে মানুষ সালাত আদায় করবে, যতদিন সেখানে মানুষ কুরআন শিখবে, ঠিক ততদিন আপনার আমলনামায় তার সাওয়াব যুক্ত হবে। আপনি বেঁচে থাকাবস্থায় এই সাওয়াব তো পাবেনই, মারা যাওয়ার পরও এই সাওয়াব আপনার আমলনামায় অনবরত যুক্ত হতে থাকবে। চিন্তা করুন, কবরের জীবনে আপনি সালাত পড়তে পারছেন না, সিয়াম রাখতে পারছেন না, হজ-যাকাত-কুরবানি কোনো কিছুই করার আর সুযোগ নেই আপনার। কিন্তু দুনিয়ায় আপনি এমন একটি কাজ করে এসেছেন যার বদৌলতে সালাত না পড়েও, সিয়াম না রেখেও, হজ-যাকাত-কুরবানি না দিয়েও কবরে বসে সাওয়াব পেয়ে যাচ্ছেন! মসজিদ নির্মাণ ছাড়াও কূপ খনন, টিউবওয়েল বসানো, এমনকি কোথাও যদি কোনো ফলের গাছ লাগান, সেই গাছ থেকে যদি পথচারী এবং পশুপাখি ফলমূল খায়, তাহলে সেটাও আপনার জন্য সাদাকায়ে জারিয়া হিশেবে গণ্য হবে।

নেককার সন্তানাদি

দুনিয়ায় আপনার সন্তানদের যদি ইসলামের সুমহান শিক্ষায় দীক্ষিত করেন, তাদের মধ্যে ঈমান, তাকওয়া আর ইখলাসের সন্নিবেশ ঘটাতে পারেন, তাদের যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুপম আদর্শে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে আপনার মৃত্যুর পর আপনার সন্তানেরা আপনার জন্য 'চলমান ব্যাংক' হিশেবে ভূমিকা রাখবে। তারা প্রতিনিয়ত আপনার জন্য দুআ করবে। তাদের কৃত সকল নেক কর্মের ফল আপনার আমলনামাতেও সমানভাবে যুক্ত হতে থাকবে।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

উপকারী জ্ঞান

দুনিয়াতে যে উপকারী জ্ঞান আপনি অর্জন করেছেন, সেগুলো যখন মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেবেন, সেই জ্ঞান আখিরাতে আপনার জন্য সাওয়াবের 'চলন্ত ব্যাংক'-এর ভূমিকা পালন করবে। আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার রাহিমাহুল্লাহর লিখে যাওয়া বইগুলো পড়ে যখন কোনো ব্যক্তি আমল করে, নিজের আকিদা বিশুদ্ধ করে, তখন এই কাজের জন্য ওই ব্যক্তি যে পরিমাণ সাওয়াব লাভ করে, ঠিক একই পরিমাণ সাওয়াব আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যারের আমলনামাতেও পৌঁছে যায়। আমরাও যদি এ রকম বই কিংবা উপকারী জ্ঞান ছড়ানোর উপকরণ দুনিয়ায় রেখে যেতে পারি, তাহলে আশা করা যায়, এগুলোর বদৌলতে মৃত্যুর পর আমাদের আমলনামাতেও এ রকম সাওয়াব যুক্ত হতে থাকবে, ইন শা আল্লাহ।

মৃত্যুর মাধ্যমেই যেন আমাদের স্মৃতি দুনিয়া থেকে মুছে না যায়। দুনিয়াতে না থাকা অবস্থাতেও যেন আমাদের কাজগুলো আমাদের হয়ে কথা বলে। আমাদের সাদাকায়ে জারিয়া, আমাদের সন্তানাদি আর আমাদের জ্ঞান যেন নিরন্তর সাওয়াবের 'চলমান ব্যাংক' হিশেবে কাজ করে। আমরা চলে যাব ঠিক, কিন্তু আমাদের যেন প্রস্থান না হয়।

বেলা ফুরাবার আগে

[ক]

কিরজেইডা রড্রিগেজ। পৃথিবীর বিখ্যাত একজন ফ্যাশন ডিজাইনার, ফ্যাশন ব্লগার এবং সেলিব্রিটি লেখকের নাম। অর্থ-কড়ি, বিত্ত-বৈভব কিংবা যশ-খ্যাতি- একজীবনে 'অপ্রাপ্তি' বলে সম্ভবত কোনো কিছুই নেই তার ঝুলিতে। দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় পুরে ফেলা রড্রিগেজ খুব সম্প্রতি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুর আগে বলে যান কিছু শেষ অনুভূতি। সেই অনুভূতিতে উঠে আসে কিছু টলটলে সত্য। এমন অকপট স্বীকারোক্তি রঙিন কর্পোরেট দুনিয়া আমাদের কখনোই জানাবে না। রড্রিগেজ লিখেছেন—

'পৃথিবীর দামি ব্র্যান্ডের গাড়ি পড়ে আছে আমার গ্যারেজে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই গাড়িতে আমি আর চড়তে পারছি না! নিত্যনতুন দামি সব ডিজাইনের কাপড়ে আমার ড্রয়ার ভরতি। কিন্তু আজ সেগুলো আর আমার গায়ে তোলা সম্ভব নয়। আমার সংগ্রহে থাকে পৃথিবীর দামি ব্র্যান্ডের জুতো। সবচেয়ে দামি ব্যাগটাই থাকে আমার দখলে। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, আজ সেগুলো নিতান্তই অকেজো আমার ঘরে! টাকায় ভরতি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, অথচ সেই টাকা আজ আর কোনো কাজেই লাগছে না। আমার অত্যাধুনিক বাড়িটা দামি দামি সব আসবাবপত্রে ভরপুর, কিন্তু সেই আসবাবে শুয়ে আমি যে একটু আরাম করব, সেই সুযোগ আর কই? হাসপাতালের ছোট্ট বিছানায় আজ আমি কাতর। অথচ এমনও সময় ছিলো, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে যেতে মন চাইলে আমি আমার ব্যক্তিগত প্লেনে চেপে

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

দিব্যি চলে যেতে পারতাম! আমার জীবনে কোনো কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু আমার হৃদয়জুড়ে অভাবের হাহাকার। আমার সবকিছুই আছে, কিন্তু সব থেকেও আজ আমি কেমন যেন নিঃস্ব!'

অর্থকড়ি উপার্জনের জন্য যে মানুষটা নিজের গোটা জীবনটাই ব্যয় করল, জীবনের একটা পর্যায়ে গিয়ে সেই টাকা, সেই অর্থ তার কোনো কাজেই আর লাগছিল না। সবচেয়ে দামি পোশাক গায়ে দিয়ে যে মানুষ চষে বেড়াত পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, সময়ের পরিক্রমায় হাসপাতালের দেওয়া রঙিন একটা চাদর ব্যতীত আর কোনো কিছুই সে গায়ে তুলতে পারছে না! দামি ব্র্যান্ডের গাড়ি কিংবা ওড়ার জন্য আধুনিক মানের জেট না হলে যার চলতই না, সে কিনা বন্দি হয়ে পড়ে হুইল চেয়ারের শিকলে! জীবন কতটা প্রবঞ্চনাময়, কতটাই ঠুনকো, তাই না? জীবন আসলে একটা মরীচিকার নাম যেখানে মৃত্যুই হলো ধ্রুব সত্য। দুনিয়ার জীবন বিশাল একটা নাট্যমঞ্চের ক্ষুদ্র একটা অংশ মাত্র। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'এই দুনিয়ার উপমা হলো এমন এক মুসাফিরের মতো, যে তার ভ্রমণে বের হয়েছে। পথিমধ্যে ক্লান্ত লাগছিল বলে সে একটা গাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার পথচলা আরম্ভ করেছে।'[১]

পথিকের দীর্ঘ সফরটা কিন্তু দুনিয়ার জীবন নয়। সেই সময়টা আরও বহু মাত্রায় প্রলম্বিত। কেবল গাছের ছায়ার নিচে সে যে সময়টুকু ব্যয় করেছে, ওইটুকুই হলো দুনিয়ার জীবন! মানে, একটা সুদীর্ঘ সময়ের যাত্রায় কেবল খুব অল্প কিছু সময়ের বিশ্রামের নামই হলো দুনিয়া।

মানুষের জীবনে মৃত্যুর মতন নির্মম সত্য আর কিছু নেই। অথচ সেই নির্মম সত্যকে, সেই অখণ্ডনীয় বাস্তবতাকে অস্বীকার করার জন্য আমাদের কত তোড়জোড়। আমরা মৃত্যু থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাই। কিন্তু পালাতে গিয়ে আমরা মৃত্যুর আরও সন্নিকটে চলে আসি। মৃত্যু আসলে আমাদের তাড়া করে না। মৃত্যু তার নির্ধারিত স্থানে অপেক্ষারত। সময়ের পরিক্রমায় আমরাই বরং মৃত্যুর দিকে ছুটে যাই নিরন্তর।

ধুকপুক ধুকপুক শব্দে বেজে চলছে আমার হৃৎপিণ্ড। এই কথার অর্থ দুটো। প্রথমত, আমি এখনো জীবিত আছি, আর দ্বিতীয়ত, আমি একদিন অবশ্যই মারা যাব। বিজ্ঞানের

[১] জামি তিরমিযি : ২৩৭৭, হাদিসটি সহিহ

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রে আমরা পড়েছি, গরম একটি কফির কাপকে টেবিলের ওপর রাখা হলে সময়ের ব্যবধানে সেটি আস্তে আস্তে ঠান্ডা হতে থাকবে। তবে সেটি কখনোই আরও বেশি গরম হয়ে উঠবে না। তাপগতিবিদ্যার এই সূত্র মানুষের জীবনের সাথেও অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। মাতৃগর্ভে যেদিন আমাদের প্রাণকণা সঞ্চারিত হয়েছিল, ঠিক সেদিন থেকেই আমাদের জীবনের উষ্ণতার শুরু। এরপর ধীরে ধীরে সেই উষ্ণতা আমরা হারিয়ে চলেছি। প্রতিদিন হারাচ্ছি। প্রতিনিয়ত হারাচ্ছি। হঠাৎ এমন একটা সময় আমাদের সামনে উপস্থিত হবে, যখন আমরা সমস্ত উষ্ণতা হারিয়ে স্তব্ধ, ঠান্ডা, শীতল হয়ে যাব। সেদিন ছিন্নভিন্ন হবে আমাদের জাগতিক সকল বন্ধন। এর নামই মৃত্যু!

মৃত্যু সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু সালাবাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'তুমি দুনিয়ার জীবন নিয়ে মত্ত, অথচ, হতে পারে তোমার কাফনের কাপড় ইতোমধ্যে ধোপার কাছে চলে এসেছে।'[১]

ভয়ংকর সত্য কথা! এই যে আজ আমি দুনিয়ার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলছি, আখিরাতের চিন্তা হৃদয়-মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি, আমি কি নিশ্চিত যে আগামীকালকের রাঙা প্রভাতে আমি দুচোখ মেলতে পারব? আজকেই যে আমার জীবনের শেষ দিন নয়, জীবনের শেষ সকালটা যে ইতোমধ্যে আমি পার করে ফেলিনি, তার কী নিশ্চয়তা? আজ যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে আমার কাফনের কাপড় তো ইতোমধ্যে বাজারে চলে এসেছে। অপেক্ষা কেবল একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের। যে মুহূর্তে দোকানদারের কাছে আমার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছাবে আর তিনি সাড়ে তিন হাত কাপড় কেটে নিয়ে আমার শেষ বিদায়ের জন্য প্যাকেট করে দেবেন।

যদি আজ সত্যিই আমার মৃত্যু হয়, আমি কি তাহলে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত? মৃত্যুর আগে শেষ ওয়াক্তের সালাতে আমি কি হাজির ছিলাম? যেদিন আমার মৃত্যু হয়, সেদিন আমার ঘরের টেলিভিশন কতবার অন-অফ হয়েছে আর কুরআন কতবার খোলা-বাঁধা হয়েছে? মৃত্যুর আগের সময়টাতে কতবার আমার ঠোঁটে আল্লাহর যিকির গুঞ্জরিত হয়েছে আর কতবার অহেতুক আলাপে মৌজ-মাস্তি করে আমি সময় কাটিয়েছি?

[১] আল-আকিবাহ, পৃষ্ঠা : ৮৮

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

[খ]

দুনিয়ার জীবন নিয়ে সুগভীর একটি উপলব্ধি আছে ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহর। তিনি বলেছেন, 'একজন লোক জঙ্গালের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে একটা সিংহ তাকে ধাওয়া করতে শুরু করে। সিংহের থাবা থেকে বাঁচতে লোকটা প্রাণপণে দৌড়াতে লাগল। লোকটা দেখল, কাছেই একটা কূপ। সে ভাবল, এই কূপে ঝাঁপ দিলে সিংহের আক্রমণ থেকে হয়তো বাঁচা যাবে। যেই ভাবা সেই কাজ। লোকটা সিংহের ভয়াল থাবা থেকে বাঁচতে ওই কূপের মধ্যেই ঝাঁপ দিল। কূপে ঝাঁপ দিয়ে লোকটা কোনোভাবে একটা দড়ি আঁকড়ে ধরতে সক্ষম হলো। ফলে, সে একেবারে কূপের গভীরেও গিয়ে পড়ল না। লোকটা ভাবল, 'যাক বাবা, এই যাত্রায় অন্তত বাঁচা গেল!' কিন্তু পরক্ষণেই কূপের নিচে দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথেই লোকটা একেবারে চমকে উঠল। দেখল, কূপের নিচে বিশাল আকৃতির একটি বিষধর সাপ হাঁ করে আছে তাকে গিলে খাওয়ার জন্য। এবার লোকটা ওপরে তাকাল। দেখল, কূপের মুখে অপেক্ষমাণ আছে সেই ভয়ংকর সিংহ।

একটু পরে কোত্থেকে যেন একটা সাদা ইঁদুর আর একটা কালো ইঁদুর এসে লোকটার জড়িয়ে ধরা দড়িটা কুটকুট করে কাটতে শুরু করেছে। অবস্থা তো খুবই ভয়ানক! ওপরে সিংহ, নিচে সাপ। মাঝখানে এই ইঁদুরদের চরম শত্রুতা। মৃত্যুকে ঠেকানোর কোনো উপায়ই আর অবশিষ্ট নেই।

হঠাৎ লোকটার সামনে কোত্থেকে একটা মধুর চাক আবির্ভূত হলো। সেই চাক থেকে চুইয়ে চুইয়ে মধু পড়ছে। লোকটা এক হাতে সেই মধু নিয়ে মুখে পুরে দিল। মধুর স্বাদ আর মিষ্টতা লোকটাকে ওপরের সিংহ, নিচের সাপ আর সেই দুই শত্রু ইঁদুরের কথা একদম ভুলিয়ে দিল।'

গল্পটি বলার পরে ইমাম গাজালি রাহিমাহুল্লাহ মন্তব্য করেছেন, 'সিংহটা হলো মৃত্যু যা নিয়তই আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। সাপটা হলো কবর যার মধ্যে সকল বনি আদমকে যেতে হবে। দড়িটা হলো মানুষের জীবন। সাদা ইঁদুর আর কালো ইঁদুর হলো দিন এবং রাত যা প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনটাকে সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে। আর মধুটা হলো দুনিয়া। দুনিয়ার মোহ, মিষ্টতা আমাদের মৃত্যু (সিংহ), কবর (সাপ) এবং সেই দিনের কথা ভুলিয়ে দেয় যেদিন আমরা সকলে আল্লাহর সামনে পুনরুত্থিত হব।

কত অর্থবহুল ভাবনা, দেখুন! মৃত্যু একটা সিংহের মতন। একটা ভয়ংকর, ভয়ার্ত বাস্তবতা। মৃত্যু নামক সেই সিংহের থাবা থেকে আমার-আপনার কারোরই নিস্তার

নেই। কবর হলো সাপের সেই হাঁ করা মুখ আর দড়িটা হলো আমাদের জীবন। সাদা আর কালো ইঁদুর হলো দিন আর রাত। একটি করে দিন আর রাত পার হচ্ছে মানে জীবনের সেই দড়ির কিছু অংশ ক্ষয়ে যাচ্ছে। ছিঁড়ে যাচ্ছে। হাসান আল বাসরি রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'মানুষ হচ্ছে সময়ের সমষ্টি। জীবন থেকে একটি দিন গত হওয়া মানে মানুষের একটা অংশ গত হয়ে যাওয়া।'[১]

এভাবে যেদিন সেই ইঁদুরেরা সম্পূর্ণ দড়িটাকে কেটে ফেলবে, ছিঁড়ে ফেলবে, সেদিন আমরা নিক্ষিপ্ত হব সাপের পেটে। অন্ধকার কবরে। কিন্তু এতসব বাস্তবতা রেখে, দুনিয়ার মোহের পেছনে আমরা ছুটে বেড়াই নিরন্তর। আমরা ভুলে যাই আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যের কথা। আমরা বিস্মৃত হই সেই জীবনের ব্যাপারে, যে জীবনটাই সত্য, অমোঘ।

[গ]

সময়ের সাথে সাথে ফুরিয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবন। অন্তিম মুহূর্তটা আস্তে আস্তে কাছে চলে আসছে। মৃত্যু যে অমোঘ, অবধারিত, এ ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। কুরআন দ্ব্যর্থ কণ্ঠে ঘোষণা করেছে—

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ

নিশ্চয় সকল প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।[২]

একদিন আমরা নিশ্চিতভাবে মারা যাব, ছেড়ে যাব এই রঙিন দুনিয়া। ছেড়ে যাব আমাদের সকল আত্মীয়তার বন্ধন। সমস্ত কিছু জেনেও আমরা কি মৃত্যুর জন্য পাথেয় সংগ্রহ করি? কোনো নাবিক কি জাহাজবিহীন সমুদ্রযাত্রা করে? কোনো যাযাবর খাদ্যপানীয়বিহীন মরুভূমির পথে রওনা করে কখনো? নাবিক খুব ভালো করেই জানে, জাহাজ ছাড়া সমুদ্রযাত্রায় তার ধ্বংস অনিবার্য। যাযাবর জানে খাদ্যপানীয় ছাড়া মরুভূমিতে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। অবশ্যম্ভাবী ফলাফল জেনেই তারা প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে নিজ নিজ যাত্রায় পাড়ি জমায়। কিন্তু আমাদের সামনে যে অনন্ত যাত্রা, যে অসীম সময়-সমুদ্রে আমাদের অবগাহন, সেই যাত্রার

---

[১] কিতাবুয যুহদ, পৃষ্ঠা : ২২৫

[২] সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮৫

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

জন্য কি আমরা কোনো রসদ মজুদ করি? সময়ের শেষ ঘণ্টা বেজে ওঠার আগেই কি আমাদের উচিত নয় যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে নেওয়া?

অতিশয় সত্য কথা হলো এই—মৃত্যুর ব্যাপারে আমরা চূড়ান্তরূপে উদাসীন। অথচ আমাদের সোনালি প্রজন্মের সোনার মানুষগুলো মৃত্যুকেই জীবনের লক্ষ্য বানাতেন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করাই ছিল তাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাপড়ের একটা অংশ ধরে বলেছেন, পৃথিবীতে আগন্তুকের ন্যায় জীবনযাপন করো।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু উমারকে আগন্তুকের ন্যায় বাঁচতে বলেছেন। আগন্তুকের মতো থাকা মানে হলো নিজেকে এই দুনিয়ায় থিতু মনে না করা। এমন না ভাবা যে, এই দুনিয়াই আমার সব। আমি কখনোই এই দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হব না; বরং দুনিয়ায় আমাদের থাকতে হবে আগন্তুকের মতো। এমনভাবে, যেন আমরা এখানে মুসাফির। এক সুদীর্ঘ সফরের মাঝে দুনিয়ার জীবন খুব অল্প কিছু সময় মাত্র!

দুনিয়ার জীবনে কীভাবে বাঁচতে হবে, সে ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'যখন সন্ধ্যা উপনীত হয়, তখন সকালের জন্য অপেক্ষা করো না। আর সকাল উপনীত হলে সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষায় থেকো না। তোমার সুস্থতা থেকে কিছু সময় তোমার অসুস্থতার জন্য বরাদ্দ রাখো এবং সময় থাকতে মৃত্যুর জন্য পাথেয় সংগ্রহ করে নাও।'[২]

সন্ধ্যায় জীবিত আছে এমন লোক যে পরের দিন সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে, সেই নিশ্চয়তা নেই। আবার সকালে জীবিত আছে এমন লোক যে সন্ধ্যা অবধি বেঁচে থাকবে, সেটাও অনিশ্চিত। আমাদের জীবন এতটাই ঠুনকো, ভঙ্গুর এবং অনিশ্চয়তায় ভরা।

আমাদের জন্মের ক্রমধারা আছে, কিন্তু মৃত্যুর কোনো ক্রমধারা নেই। মৃত্যু কোনো ক্রমধারায় বিশ্বাস করে না। আমার পিতা আমার আগে জন্মেছেন। তার আগে কখনোই আমি দুনিয়ায় আসতে পারি না। তবে, আমি যে আমার পিতার পরে মারা যাবো, সেই নিশ্চয়তাটুকু কেউ দিতে পারে না। মৃত্যুর ক্রমধারা নেই জেনেও, আমরা কি

আমাদের কৃত পাপ কাজ হতে নিবৃত্ত হতে পেরেছি? 'যে-কোনো মুহূর্তে, যে-কোনো অবস্থায় মৃত্যুকে আলিঙ্গান করতে হবে'—এই অমোঘ সত্য বুঝতে পেরেও আমরা কি আমাদের পরকালের পাথেয় সংগ্রহের ব্যাপারে আদৌ তৎপর? অথচ আমাদের সোনালি প্রজন্মের মানুষগুলো আল্লাহর ক্ষমালাভের জন্য কতটাই-না ব্যাকুল ছিলেন! ভুলে যদি পাপ হয়ে যেত, তাওবা করতে তারা এক মুহূর্ত দেরি করতেন না। পাপের ওপর অটল থাকতেন না এবং পাপকে লুকিয়ে লুকিয়ে বৃদ্ধি করতেন না। এমনকি পাপ থেকে পবিত্র হতে তারা মৃত্যুকেও বরণ করে নিয়েছিলেন হাসিমুখে।

ইসলামে যিনা তথা ব্যভিচারের শাস্তি হলো রজম। পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একবার এক ব্যভিচারিনি এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে পবিত্র করুন। আমি যিনা করেছি। যিনার দায়ে আমি এখন গর্ভবতী।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি কি সত্যিই গর্ভবতী?' মহিলাটি বলল, 'হ্যাঁ।' তখন আল্লাহর রাসুল মহিলাটিকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। বললেন, 'তুমি চলে যাও। তোমার গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তারপর এসো।' মহিলাটি চলে গেল। কয়েক মাস পরে যখন গর্ভের সেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো, তখন সেই মহিলা আবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে পবিত্র করুন। আমার গর্ভের সন্তান জন্মলাভ করেছে।' তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি চলে যাও। তোমার সন্তান দুধ ছাড়ার বয়সে উপনীত হলে এসো।' মহিলাটি সেবারও চলে গেল। এরপর যখন বাচ্চাটি দুধ ছাড়ার বয়সে পৌঁছাল, তখন সেই মহিলা বাচ্চার হাতে এক টুকরো রুটি ধরিয়ে দিয়ে পুনরায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো এবং ছেলের হাতে ধরে থাকা রুটির টুকরো দেখিয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, এই দেখুন, আমার ছেলে দুধ ছাড়ার বয়সে উপনীত হয়েছে। আপনি এবার আমায় পবিত্র করুন।' তখন মহিলাটিকে রজম অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যার আদেশ দেওয়া হলো। সেদিন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু একটা পাথর নিক্ষেপ করেন ওই মহিলার গায়ে। সেই পাথরের আঘাতে মহিলার মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত এসে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর গায়ে লেগে যায়। তিনি তখন মহিলাটিকে তিরস্কার করতে শুরু করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'খালিদ, থামো! তার ব্যাপারে কোনো খারাপ মন্তব্য করো না। আল্লাহর শপথ! সে এমন তাওবা করেছে, এ রকম তাওবা যদি কোনো বড়

[১] *জামি তিরমিযি : ২৩৩৩*

[২] *সহিহ বুখারি : ৬৪১৬*

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

জালিমও করে, তাহলে আল্লাহ তাকেও ক্ষমা করে দেবেন।'[১]

যিনার মতন গুরুতর পাপের বোঝা থেকে সময় অর্থাৎ হায়াত থাকতেই মুক্ত হতে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা ওই মহিলার! এমনকি বাচ্চার হাতে রুটি ধরিয়ে দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, তার বাচ্চা দুধ ছেড়ে দিয়েছে। এটা করার কারণ হলো, যাতে নবিজি তার কথা বিশ্বাস করেন। তাকে আর ফেরত না পাঠান। নবিজি চাইলে এখনই তার শাস্তি বাস্তবায়ন করতে পারেন। মহিলাটি জানত, সময় থাকতে আল্লাহর ক্ষমালাভ করতে না পারলে তার আখিরাতের অনন্ত জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই পাপের বোঝা থেকে মুক্ত হতে মৃত্যুকেও হাসিমুখে বরণ করে নিতে দ্বিধা করেননি ওই মহিলা। আমরা যারা আজ জীবিত আছি, আমাদের পাপগুলোর ব্যাপারে কখনো কি আমরা এভাবে ভেবেছি? কখনো কি নিভৃতে আল্লাহর কাছে অশ্রু ঝরিয়েছি? কখনো কি রাতের তাহাজ্জুদে দুহাত তুলে বলেছি— 'পরওয়ারদিগার! জীবনটাকে আপনার অবাধ্যতায় ভরে ফেলেছি। জমিনের ওপরে এমন কোনো পাপের অস্তিত্ব নেই যা আমার দ্বারা হয়নি। আজ লজ্জিত মুখে, অবনত মস্তকে, আকুল চিত্তে আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। আপনি ব্যতীত আমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। নেই কোনো আশ্রয়স্থল। আপনিই আমাদের আশা, ভরসা এবং নির্ভরতার প্রথম আর শেষ জায়গা। আপনি যদি ক্ষমা না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। আপনার সীমাহীন দয়ার ভান্ডার থেকে আমার জন্য কিছু দয়া বরাদ্দ করুন।'

জীবন হলো সময়ের সমষ্টি। কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে আমরা 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়ি। আমাদের জীবন থেকে প্রতিদিন একটি করে মূল্যবান দিন হারিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, জীবন থেকে হারাতে থাকা এই সময়গুলোর জন্য আমরা কি কখনো ইন্নালিল্লাহ পড়ি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন একশো বার তাওবা করতেন।[২] আমরা কতবার তাওবা করি প্রতিদিন? অথবা প্রতি সপ্তাহে? কিংবা প্রতি মাসে?

সময় থাকতে তাওবা না করায়, ঈমান না আনায় নবিজির সুমহান সুহৃদ, নবিজির প্রিয়তম চাচা আবু তালিবের স্থান হবে জাহান্নামে। এমনকি তার জন্য নবিজিকে দুআ করার অনুমতিটুকুও দেওয়া হয়নি। ভাবুন তো, বেলা ফুরাবার আগে যদি আমরা নিজেদের

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৪৪৪৪, হাদিসটি সহিহ

[২] সহিহ মুসলিম : ২৭০২

কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হই, ক্ষমা না চাই, না শুধরাই—আখিরাতে আমাদের স্থান কোথায় হবে? সময় থাকতে যারা আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে ফিরে আসেনি, যারা নিজেদের জীবনকে জাহিলিয়াতের ওপরেই সমাপ্ত করেছে, আখিরাতে তারা বারংবার আফসোস করতে থাকবে। যারা দুনিয়ায় বসে নিজেদের আখিরাত ধ্বংস করে ফেলবে, মৃত্যুর পর তারা বলবে, 'হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!'[১] দুনিয়ার জীবন নিয়ে মৌজ-মাস্তিতে ব্যস্ত আছি আমরা। ভাবছি, যৌবন তো উপভোগেরই সময়! জীবন যদি এখন না উপভোগ করি তো কবে? অথচ আমরা ভুলে যাই, মৃত্যু যৌবন বোঝে না। বোঝে না বৃদ্ধাবস্থা কিংবা শৈশব। আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহ ব্যতীতই যদি আমাদের পাড়ি জমাতে হয় আখিরাতের পথে, তাহলে সেদিন আফসোস করে বলব, 'হায়! যদি আমি পরকালের জন্য কিছু করতাম!'[২] নিজেদের পাপে ভরা আমলনামা দেখে সেদিন আমি ভয়ে চমকে উঠব। কারণ, এ যে আমার পাপের খতিয়ান। জীবনের সকল মুহূর্ত, সকল কৃতকর্ম তাতে লিপিবদ্ধ। সেই আমলনামা দেখে আমি বলব, 'হায়! আজকে আমাকে যদি আমার আমলনামা দেওয়া না হতো!'[৩]

[ঘ]

কেউ যদি বলে যে সে কারও দাসত্ব করে না, তার কোনো প্রভু নেই, নিয়ন্ত্রক নেই, তাহলে সে মিথ্যা বলেছে। প্রতিটা মানুষ অবশ্যই কারও-না-কারও দাস। হয় সে আল্লাহর দাসত্ব করে, নয়ত সে তার নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে। এজন্যেই ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, 'হে আদম সন্তান! তুমি যদি এই দুনিয়াকে আখিরাতের বিনিময়ে বিক্রি করো, তাহলে নিশ্চিত থাকো, তুমি দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ই লাভ করবে। আর যদি তুমি আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করো, তাহলে তুমি দুটোই হারাবে।'

ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহকে বলা হলো, 'আপনার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার কোনটি?' তিনি বললেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, যখন দেখি একজন মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে জানে, তথাপি সে আল্লাহর অবাধ্য হয়।'

[১] সুরা নাবা, আয়াত : ৪০

[২] সুরা ফজর, আয়াত : ২৪

[৩] সুরা হাক্কাহ, আয়াত : ২৫

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

ভাবুন তো! ফুযাইল ইবনু ইয়ায কি কথাগুলো আমাদের জন্য বলেননি? আমরা আল্লাহ সম্পর্কে ঠিকই জানি। আমরা জানি যে, আমাদের একদিন মৃত্যু হবে। একদিন মুখোমুখি হতে হবে বিচার দিবসের। আমরা কবর, হাশর-মিযান এবং কিয়ামত সম্পর্কেও সম্যক অবহিত। এরপরও আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে নিয়মিত না। এরপরও আমরা সুদ নিই, ঘুস খাই, লোক ঠকাই, মিথ্যা কথা বলি। আমরা আল্লাহকে চিনি ঠিকই, কিন্তু মানতে চাই না। এরচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার আর কিছু হতে পারে?

দুনিয়ার সবকিছুর জন্যই আমরা প্রস্তুতি নিই। চাকরির জন্য, ক্যারিয়ার, বিয়ে, এমনকি নিত্য বাজার-সদাই করার জন্যও আমাদের একটা প্রস্তুতি থাকে। কিন্তু আমাদের কেবল প্রস্তুতি নেই মৃত্যুর জন্য। ফরয সালাতের বাইরের সুন্নাত সালাতগুলো আমরা সময় থাকলেও আদায় করি না। অলসতা করি। অথচ কবরের জগতে এমন কত মানুষ আহাজারি করছে দুনিয়ায় ফিরে এসে একাগ্রচিত্তে আল্লাহকে একটা সিজদা করার জন্য। তারা আফসোস করছে কেন তারা দুনিয়ার সময়গুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগায়নি।

يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

হায়! যদি আমাদের পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো হতো, আর আমরা আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করতাম এবং আমরা হতাম ঈমানদারদের শামিল।[১]

আমরা কি জানি আমাদের জীবনের শেষ দিন কোনটি? শেষ অংশ আর শেষ আমল কোনটি হবে? জানি না। আজকের দিনটাও তো আমার জীবনের শেষ দিন হতে পারে। আজকের অংশটুকুই হতে পারে আমার জীবনের শেষ অংশ। আজকের আমলটুকুই হতে পারে আমার জীবনের শেষ আমল। আজকেই যদি আমার জীবনের শেষ দিন হয়, তাহলে আজকের দিনটিকে আমার জীবনের সেরা দিন বানাতে হলে আমাকে ঠিক কী করতে হবে? আমার আজকের আমলটাই যদি জীবনের শেষ আমল হয়, তাহলে আমার আজকের দিনের আমলগুলো ঠিক কেমন হতে হবে?

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ২৭

বেলা ফুরিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আসন্ন হচ্ছে আল্লাহর প্রতিশ্রুত সময়। আল্লাহ বলেছেন—

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

মানুষের হিসেব-নিকেশের সময় আসন্ন। অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।[১]

জীবনের বেলা একেবারে ফুরিয়ে যাওয়ার আগে আমাদের জীবনতরীকে নির্বিঘ্নে কূলে ভেড়াতে হবে। সেই কূল, যে কূলে আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। নেই কোনো মন খারাপের গল্প।

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ০১

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

[ক]

'মানুষ' শব্দের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'নাস'। প্রসিদ্ধ মতানুসারে শব্দটি 'নিসইয়ান'(نسيان) ধাতুমূল থেকে আগত—যার অর্থ ভুলে যাওয়া। আমরা সঠিক পথ ভুলে যাব, বিস্মৃত হব, বিচ্যুত হব বলেই আমাদের নাম নাস তথা মানুষ। সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই এই ধারা চলে আসছে। জান্নাতে আমাদের পিতা আদম আলাইহিস সালাম এবং মাতা হাওয়া আলাইহাস সালামও নিজেদের কৃত ওয়াদা থেকে খানিক সময়ের জন্য বিস্মৃত হয়েছিলেন। ভুল করে তারা সেই গাছের ফল ভক্ষণ করে ফেলেছিলেন যা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তাই 'ভুল করা' আমাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য।

আমরা ভুল করব জেনেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দুটো গুণবাচক নাম গাফুর ও রাহীম। ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু। এই বিশ্বচরাচরে তার মতন ক্ষমার অধিকারী দ্বিতীয় আর কেউই নেই। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সকল আদম সন্তানই গুনাহগার। তবে তাদের মধ্যে উত্তম সে, যে তাওবা করে।'[১]

আরেকটি হাদিস থেকে জানা যায়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যদি গুনাহ না

[১] জামি তিরমিযি : ২৪৯৯, হাদিসটি সহিহ

করতে, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদের জায়গায় এমন এক জাতি সৃষ্টি করতেন যারা গুনাহ করত এবং তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করত। ফলে আল্লাহও তাদের ক্ষমা করতেন।'[১]

যে বান্দা ভুল করে, যে বান্দা আগাগোড়া পাপে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তার জন্যও তিনি রহমতের দরজা বন্ধ করে দেন না। কোনো গুনাহগার বান্দার জন্য তিনি বাতাসের অক্সিজেন থামিয়ে দেন না, আকাশের বৃষ্টি থামিয়ে দেন না, থামিয়ে দেন না সূর্যের আলো, মেঘ, রাতের জোছনা। বান্দা অনবরত ভুল করে আর তিনি অবিরত সুযোগ দিয়ে যান। অপেক্ষায় থাকেন বান্দার রাজকীয় প্রত্যাবর্তনের। কখন বান্দা নিজের কৃত ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে, কখন সে তাওবা করে পাপের দরিয়া থেকে উঠে আসবে, কখন সে তার রবের নির্দেশিত পথের দিকে যাত্রা করবে।

আমরা মনে করি, যে কঠিন কঠিন পাপ আমরা করে বসেছি তার হয়তো-বা কোনো ক্ষমা হতে পারে না। আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, আমাদের কৃত পাপের হয়তো-বা কোনো ক্ষমা নেই। অথচ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিয়ম কিন্তু এটা নয়। তিনি ক্ষমার পসরা নিয়ে আছেন বান্দাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করার জন্য। তিনি বলছেন—

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

হে আমার বান্দাগণ, তোমরা যারা নিজেদের ওপর যুলুম করে বসেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে কখনোই নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।[২]

এই যে এই আয়াতটা, মনে হচ্ছে এই আয়াত যেন আমার জন্যই নাযিল করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলছেন, 'হে আমার বান্দা! সেদিন রাতের অন্ধকারে তুমি অমুক অমুক পাপে লিপ্ত ছিলে। স্মরণ করো তোমার সালাত কাযা করার দিনগুলো। মনে করার চেষ্টা করো ইন্টারনেটের অন্ধকার গলিতে

[১] সহিহ মুসলিম : ২৭৪৯

[২] সুরা যুমার, আয়াত : ৫৩

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

ডুব দেওয়ার মুহূর্তগুলোকে। ভুলে গেছ সেই দিনগুলোর কথা, যখন তুমি দিনের পর দিন মসজিদমুখী হওনি? তুমি নিজের ওপর, নিজের আত্মার ওপর যুলুম করেছ। হিমালয়-সমান পাপের বোঝা নিয়ে আজ তুমি আমার সামনে উপস্থিত। তুমি কি ভাবছো আজ আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবো? তুমি কি ভাবছো আজ আমি তোমাকে তিরস্কার করব? তুমি কি ধরে নিচ্ছ আজ আমি তোমার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেব? আমার বান্দা, তুমি ভুল ভাবছ! তুমি নিজের ওপর যত যুলুম, যত অত্যাচারই করো না কেন, আমি সর্বদা তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। তুমি কখনোই আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। ভেবো না যে আমি তোমাকে ক্ষমা করব না, তোমার ডাক শুনব না, তোমার আহ্বানে সাড়া দেবো না। কক্ষনো এমনটি ভাববে না। তোমার কৃত পাপ কখনোই আমার ক্ষমার চাইতে বড় নয়। তুমি কেবল আমার দিকে ফিরে এসো। আমার দিকে ঝুঁকে পড়ো। হাত তুলে আমাকে বলো তোমাকে ক্ষমা করার জন্য। দু-ফোঁটা অশ্রুর বিনিময়ে আমার কাছে চাও। আমি অবশ্যই তোমার ডাকে সাড়া দেবো।'

আমাদের পাপসমূহ মাফ করার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে আয়োজন সাজিয়েছেন, সেই আয়োজন সম্পর্কে জানি না বলেই আমরা তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে পড়ি। আমরা যদি জানতাম যে, ক্ষমালাভের জন্য আমাদের অন্তরের একটু ব্যাকুলতা, হৃদয়ের খানিক আকুলতাকে আল্লাহ কীভাবে মূল্যায়ন করেন, তাহলে আমরা কখনোই হতাশ হতাম না।

একদিন সাহাবিদের কাছে, পূর্বযুগের এক লোকের কথা বলেছিলেন নবিজি। লোকটা ছিল অত্যন্ত সম্পদশালী। তার বিশাল সম্পদের ভান্ডার থেকে সে কোনোদিন আল্লাহর রাস্তায় এক কানাকড়িও খরচ করেনি। উপরন্তু, আল্লাহর ইবাদত থেকেও নিজেকে সে গুটিয়ে রেখেছিল। যখন সে মৃত্যুশয্যায় উপনীত হলো, যখন জীবনের সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছাল সে, তার মনে আল্লাহর ভয় এসে চেপে বসল। সে তার ধনসম্পদের কথা মনে করল। সম্পদের এই পাহাড় থেকে কোনোদিন একটা পয়সা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার তাড়না সে অনুভব করেনি। নিজের জীবনের এতগুলো সময় থেকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য বরাদ্দ রাখেনি কোনো মুহূর্ত। জীবনকে উপভোগ করেছে খেয়ালখুশিমতো। মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়াতেই আজ তার এত ভয়, এত শঙ্কা!

লোকটা তার সন্তানদের ডেকে বলল, 'বাবারা, বলো দেখি পিতা হিশেবে আমি কেমন ছিলাম?'

তারা বলল, 'ভালো।'

'আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার জন্য যার ঝুলিতে কিছুই নেই, সে আবার ভালো হতে পারে কীভাবে? তার জন্য তো ধ্বংস ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই।'

ছেলেরা নিশ্চুপ হয়ে থাকল। লোকটা আবার বলল, 'তোমরা এক কাজ করবে। আমি মারা গেলে আমাকে কবর দিয়ো না, বরং আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো। এরপর সে ছাইয়ের কিছু অংশ বাতাসে উড়িয়ে দেবে এবং কিছু অংশ সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে।'

ছেলেরা বুঝতে পারল না, তাদের পিতা এমন কথা কেনই-বা বলছেন। জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে কি তার ভীমরতি হয়েছে? কিন্তু লোকটা তার সংকল্পে অটল। সন্তানদের এই ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাও করাল। তারা রাজি হলো এবং লোকটার মৃত্যুর পর সন্তানেরা তাকে পুড়িয়ে সেই ছাই বাতাসে ও সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল।

নবিজির ভাষ্য থেকে জানা যায়, কিয়ামতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বাতাস ও সমুদ্রকে বলবেন তাদের কাছে এই লোকের যা যা অংশ আছে তা বের করে দিতে। বাতাস ও সমুদ্র তা বের করে দেবে। লোকটাকে আল্লাহ ওঠাবেন। বলবেন, 'কেন তুমি এই কাজের নির্দেশ দিয়েছিলে সেদিন?'

লোকটা বলবে, 'আপনার ভয়ে। আমার মনে হয়েছিল, আমার গুনাহের কারণে আপনি আমাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। আমি ভেবেছি, এভাবে নিজেকে ছাই করে ফেললে, বোধকরি, আপনার শাস্তি থেকে বেঁচে যাব।'

এই কথা শুনে আল্লাহ বলবেন, 'যাও, আমি তোমায় ক্ষমা করে দিলাম।'[১]

আল্লাহর ক্ষমার পরিধিটা এতই বিশাল! কেবল একটু অনুশোচনা, একটু আন্তরিকতা, হৃদয়কোণে একটু ভয়ের কারণে মুহূর্তেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ রকম একজন পাপীকেও ক্ষমা করে দেন। অথচ আমরা ভাবছি, আমাদের গুনাহগুলো হয়তো ক্ষমা করা হবে না।

গুনাহ করার পরে ভুল বুঝতে পেরে আমরা যখন তাওবা করি, তখন আল্লাহর চাইতে বেশি খুশি আর কেউ হয় না। নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

[১] *সহিহ বুখারি* : ৬৪৮১; এছাড়া বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে ঘটনাটি কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন শব্দে এসেছে।

Download New Pdf- www.PorogEducation.com

বলেছেন, 'মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া উট পুনরায় ফিরে পেয়ে উটের মালিক যতটা খুশি হয়, বান্দা গুনাহের পরে তাওবা করে ফিরে এলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার চাইতে বেশি খুশি হন।'[১]

ভাবুন তো! খাঁখাঁ মরুভূমি। দৃষ্টিসীমানায় নেই কোনো জনবসতির চিহ্ন। যেদিকে দুচোখ যায় কেবল বালি আর বালি। মাথার ওপর গনগনে সূর্য। এমনই এক পরিবেশে আপনি আপনার সাথে থাকা উটটা হারিয়ে বসেছেন। নিশ্চিত মৃত্যু ব্যতীত আপনার জন্য দ্বিতীয় আর কোনো পথ খোলা নেই! কারণ, পায়ে হেঁটে এই মরুভূমিপ্রান্তর পার হওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। এই তপ্ত মরুভূমিতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর অনাহারে আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়বে আপনার শরীর। নিদারুণ পিপাসায় কাতর হয়ে পড়বেন আপনি। ধীরে ধীরে ঢলে পড়বেন মৃত্যুর কোলে। এমন অবস্থায়, যদি চোখের পলকে হারিয়ে যাওয়া উট আপনার কাছে ফিরে আসে, আপনার চেয়ে সুখী জগতে তখন আর কে হতে পারে?

আমরা যখন পাপ করে আল্লাহর কাছে আন্তরিক তাওবা করি, মাফ চাই, চোখের জল ফেলে করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করি, আল্লাহ ওই হারিয়ে যাওয়া উট ফিরে পাওয়া ব্যক্তির চাইতেও বেশি খুশি হন। নবিজির হাদিস থেকে জানা যায়, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, 'আদম সন্তান! যদি তুমি আমাকে স্মরণ করো এবং আমার থেকে আশা করো, তাহলে তোমার কৃতকর্মগুলো (গুনাহ) আমি অবশ্যই ক্ষমা করে দেবো। ওহে আদম সন্তান! তোমার গুনাহের পরিমাণ যদি আকাশের মেঘমালাও ছোঁয় এবং এরপর তুমি আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, আমি অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। আদম সন্তান! আমার সাথে কাউকে শরিক করা ব্যতীত পৃথিবী-পরিমাণ গুনাহের বোঝা নিয়েও যদি আমার সামনে দাঁড়াও, আমি অবশ্যই তোমাকে ক্ষমা করে দেবো।'[২]

এই কথাগুলোর চাইতে উত্তম ভরসার বাণী আমাদের জন্য আর কী হতে পারে? এর চাইতে বেশি স্বস্তিদায়ক আর কারও কথা হতে পারে কি? পাপের অতল সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার পরেও যদি হৃদয়ের কোথাও জিইয়ে রাখি এক টুকরো বিশ্বাস, যদি হৃদয়গহীনে সুপ্ত রাখি রাহমানের ওপর একটু ভরসা, একটু আস্থা এবং একদিন যদি

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৬৩০৮; *সহিহ মুসলিম* : ২৬৭৫

[২] *জামি তিরমিযি* : ৩৫৪০, হাদিসটি সহিহ

জিইয়ে রাখা সেই বিশ্বাস, সেই সুপ্ত ভরসাতে ভর করে আমরা সত্যি সত্যিই তার সামনে নত হয়ে দাঁড়াই, যদি জীবনের সব ভুল, সব অপরাধ, সব অবাধ্যতার জন্য তাঁর কাছে অশ্রুসিক্ত নয়নে, অনুনয় ভরা বদনে, কাতর হৃদয়ে ক্ষমা চাইতে পারি, তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন, তিনি ভরসা দিচ্ছেন, তিনি ওয়াদা করছেন—তিনি আমাদের সকল পাপ, সকল গুনাহ, সকল অপরাধ, অবাধ্যতা, ভুলভ্রান্তি মাফ করে দেবেন। আমাদের পাপ যদি আকাশের মেঘমালাও স্পর্শ করে, যদি আমাদের অবাধ্যতার পরিমাণ পৃথিবীতেও সংকুলান না হয়, তবু ভয় নেই। আরশের মালিক তবুও আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আমাদের ঢেকে দেবেন তাঁর পরম মমতার চাদরে।

[খ]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু তালিবের কথা মনে আছে? সেই ব্যক্তি যার ঘরে নবিজি পার করেছিলেন শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনেরও অর্ধেক সময়। আবু তালিব সেই ব্যক্তি যিনি ছিলেন নবিজির একজন পরম অভিভাবক। একজন সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী। মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে নবিজির ওপরে যখনই কোনো বিপদ এসেছে, সেই বিপদের সামনে সবার আগে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন আবু তালিব। নবিজির শৈশবে আবু তালিব ছিলেন একজন পিতার মতন দয়ার্দ্র। কৈশোরে নবিজির মাথার ওপরে ছিলেন একটি বটবৃক্ষের ছায়ার মতন। আর যৌবনে তিনি হয়ে উঠেছিলেন নবিজির একজন সত্যিকার অভিভাবক।

আবু তালিব নবিজিকে কখনোই ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞান করেননি। কখনো নিজের সন্তান থেকে আলাদা চোখে দেখেননি। বাবা-মা এবং দাদাকে হারানোর পর আবু তালিবের হাতেই তো নবিজির বেড়ে ওঠা। সেই আবু তালিবের জন্য নবিজির হৃদয়েও ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু খুবই দুঃখজনক ব্যাপার হলো, যে চাচার হাতে নবিজির অর্ধেক জীবন অতিবাহিত হয়ে গেল, যার ছায়া মাথায় নিয়ে নবিজি পথ চলছিলেন, যার গৃহে নবিজি পেয়েছিলেন থাকার স্থান, যার কাঁধে নবিজি লাভ করেছিলেন পিতৃসম স্নেহ—সেই আবু তালিব কিনা পান করতে পারেননি ইসলামের অমৃত সুধা! ইসলামের ঝান্ডাধারী নবিকে যিনি জীবন দিয়ে আগলে রেখেছিলেন, সেই আবু তালিবই কিনা শেষ পর্যন্ত মুশরিক থেকে গেলেন। তিনি জানতেন তার ভ্রাতুষ্পুত্র আল্লাহর প্রেরিত নবি। তিনি জানতেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ কোনো মানুষ নন, একজন নবি। আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য আসা একজন বার্তাবাহক। তথাপি আবু তালিবের বংশমর্যাদা, তার পূর্বপুরুষদের

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

ধর্ম, রীতিনীতি তার সামনে সত্যের চেয়েও প্রবল হয়ে দাঁড়াল। সত্যকে আলিঙ্গন করার পরিবর্তে, বংশীয় গৌরবই তার নিকট প্রাধান্য পেল।

যখন আবু তালিবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, যখন বিছানায় জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো অতিক্রম করছিলেন রাসুলের প্রাণাধিক প্রিয় চাচা, যখন জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে ছটফট করছিলেন তিনি, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশে দাঁড়ানো ছিলেন। অশ্রুজলে বুক ভাসিয়ে তার হাত ধরে বারে বারে অনুরোধ করছিলেন কালিমা উচ্চারণ করার জন্য। কিন্তু নাহ। আবু তালিবের সেই সৌভাগ্য ছিল না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুমূর্ষু আবু তালিবের বিছানার পাশে বসে তার মুখ দিয়ে তাওহিদের ঘোষণা উচ্চারণ করাতে চাচ্ছিলেন, ঠিক তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন আরও একজন ব্যক্তি। তার নাম আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চাচা আবু তালিবকে শাহাদাহ পাঠ করাতে তৎপর, ব্যতিব্যস্ত, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া ব্যস্ত ছিলেন আবু তালিবকে কুমন্ত্রণা দেওয়ার কাজে। আব্দুল্লাহ বলছিলেন, 'ওহে আবু তালিব, শেষ সময়ে এসে তুমি কি তোমার পিতৃধর্ম ত্যাগ করে বসবে? ওহে আবু তালিব, জীবনের সন্ধিক্ষণে এসে তুমি কি সত্যিই পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে? মুহাম্মাদের প্ররোচনায় জীবনসায়াহ্নে তুমি কি আমাদের উপাস্যদের অস্বীকার করে বসবে?'

সেদিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা আবু তালিবের মন গলাতে পারেননি। আবু তালিব শাহাদাহ পাঠ না করে মুশরিক অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেন। তবে সেই আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া? যে কিনা আবু তালিবকে ফুসলিয়ে ছিলেন শাহাদাহ পাঠ না করার জন্য, তার কী হলো শেষে? হ্যাঁ, সেই আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া শেষে ইসলামের অমৃত সুধা পান করেছিলেন। যিনি একদিন আবু তালিবকে পিতৃধর্ম ত্যাগ না করার জন্য, পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ না করার জন্য, তাদের উপাস্যদের অস্বীকার না করার জন্য তাড়না জুগিয়েছিলেন, সেই তিনিই কিনা পিতৃধর্ম, পূজিত বংশীয় উপাস্যদের পায়ে ঠেলে ঘোষণা দিয়ে বসলেন এক ইলাহর, এক মাবূদের, এক আল্লাহর! সেই আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া পরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তায়েফের যুদ্ধে অংশ নিয়ে শহিদ হয়েছিলেন।[১]

[১] আল-ইস্তিআব ফি মা'রিফাতিল আসহাব, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬১; আর-রাহিকুল মাখতুম, পৃষ্ঠা : ১৫৮

ভাবুন তো! মৃত্যুর বিছানায় যিনি আবু তালিবকে কুমন্ত্রণা, কুপরামর্শ জুগিয়েছিলেন, সেই তিনিই পরে শাহাদাহ পাঠ করে হয়ে গেলেন একজন সোনার মানুষ! শুধু তা-ই নয়, জিহাদে অংশগ্রহণ করে তিনি লাভ করেছেন শহিদ হবার মর্যাদাও! সুবহানাল্লাহ! সেই আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়লেন শহিদদের মিছিলে। আর আবু তালিবের জন্য দুহাত তুলে আমরা যে একটু দুআ করব, সেই সুযোগটাও রইল না। আল্লাহর দিকে ফিরে আসার এই যে দৃষ্টান্ত—এখান থেকে আমরা কোন জিনিসটা উপলব্ধি করব? আমরা যারা নিজের আত্মার সাথে, নিজের নফসের সাথে, নিজের শরীরের সাথে যুলুম করেছি, আমরা যারা ভাবছি যে, আমাদের সেই যুলুমের, সেই পাপের কোনো ক্ষমা হয়তো নেই, তাদের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে সম্মানিত করেছেন। তাকে শহিদদের কাতারে স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ যদি তাকে ক্ষমা করতে পারেন, আপনাকে কেন করবেন না? আপনার রব আর আব্দুল্লাহ ইবনু আবি উমাইয়ার রব তো একই। আপনারা দুজনে তো একই মনিবের দাস। একই ইলাহর বান্দা। যিনি আব্দুল্লাহকে ক্ষমা করতে পারেন, তিনি আপনাকেও ক্ষমা করবেন। শুধু আশা রাখুন। ফিরে আসুন তার কাছে যিনি সমস্ত ক্ষমার আধার।

[গ]

পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সুরাটা হলো সুরাতুল ফাতিহা। সুরা ফাতিহা হলো উম্মুল কুরআন তথা কুরআনের মা। প্রতিদিনের ফরয সালাতে আমরা ১৭ বার সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করি। এই সুরার শুরুটা হয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসাবাক্য দিয়ে। আমরা ঘোষণা দিই—আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সমস্ত প্রশংসা তার জন্যে যিনি বিশ্বজাহানের রব। এরপর আমরা বলি—আর রাহমানুর রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদদ্বীন। 'আর রাহমানুর রাহীম' মানে হলো 'যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু'। আর 'মালিকি ইয়াওমিদদ্বীন' মানে হলো 'যিনি বিচার দিনের মালিক'।

এখানে আল্লাহর দুটো গুণের কথা পরপর উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে আল্লাহ হচ্ছেন পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। এরপর বলা হলো তিনি হলেন বিচার দিনের মালিক। আচ্ছা, কখনো কি মনে এই ভাবনার উদয় হয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কেন তাঁর 'আর রাহমানুর রাহীম' গুণটাকে 'মালিকি ইয়াওমিদদ্বীন' গুণের আগে স্থান দিয়েছেন? তিনি তো চাইলে বলতে পারতেন, মালিকি ইয়াওমিদদ্বীন। আর রাহমানুর রাহীম। কিন্তু তিনি সেভাবে বলেননি। কেন বলেননি?

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

বিচারক তিনিই যিনি আপনার ভালোমন্দ দুটো কাজেরই হিশেব চাইবেন। বিচার করার জন্য তার দুটোরই পরিপূর্ণ হিশেব দরকার। আর সেই বিচারক যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, তখন ব্যাপারটা কেমন হবে? তার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কি কোনো পাপ লুকোনো যাবে? তার কাছ থেকে গোপন করা যাবে কোনো গুনাহ, কোনো অবাধ্যতা? জীবনের পরতে পরতে আমরা যে অহরহ পাপ করছি, তাঁর অবাধ্য হচ্ছি, সেসবের কোনো হিশেবই কি আল্লাহর কাছ থেকে লুকোনোর সুযোগ আছে? বিচারের মাঠে তিনি যদি কঠোর হওয়া শুরু করেন, তাহলে আমাদের কেউই তাঁর ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারব না।

কিন্তু তিনি যে 'বিচারক', সেই গুণের কথা উল্লেখ করার আগে তিনি বলেছেন তিনি হলেন 'পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু'। তার রয়েছে অসীম দয়ার ভান্ডার। তিনি বিচারকের আগে দয়ালু। এর অর্থ হলো—আমরা যারা প্রতিনিয়ত নিজেদের প্রবৃত্তির ধোঁকায় হাবুডুবু খাচ্ছি, যারা দিনের পর দিন তাঁর অবাধ্য হচ্ছি, গুনাহের অথৈ সাগরে মজে রয়েছি, আমরা যদি আন্তরিকতার সাথে তাঁর দিকে ফিরে আসি, যদি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চাই, তাহলে তিনি আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। বিচারকের ভূমিকার আগে যে তিনি দয়ালু হবার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি আপনার বিচার করার আগে আপনাকে দয়া করবেন যদি আপনি বলেন, হে রাহমানুর রাহীম! প্রতিনিয়ত গুনাহের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি। হেন কোনো পাপ নেই যা আমি করছি না। রাতের অন্ধকারে, দিনের আলোতে আমি একজন পাপী। আমার শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা আজ পাপের কালিমায় দূষিত। আমার হৃদয়-মন আজ গুনাহের ভারে জর্জরিত। তবুও, মালিক আপনি তো রাহমানুর রাহীম। গাফুরুর রাহীম। আমি আজ নত মস্তকে, বিনীত চিত্তে, আকুল হৃদয়ে আপনার ক্ষমাপ্রার্থনা করছি, আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন।'

তিনি আমাদের জন্য সুযোগ বরাদ্দ রেখেছেন। ফিরে আসার সুযোগ। ক্ষমা লাভের সুযোগ। ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার সুযোগ। তাই তিনি সুরা ফাতিহায় 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' গুণের আগে 'আর রাহমানুর রাহীম' গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। এখন আমাদের উচিত সেই সুযোগ লুফে নেওয়া। তাঁকে বিচারক হিশেবে পাওয়ার আগে রাহমানুর রাহীম হিশেবে পেয়ে যাওয়া।

[ঘ]

আপনি ভাবছেন আপনার পাপের কোনো ক্ষমা নেই। অথচ, আপনার স্মরণ করা উচিত সেই উদ্ধত, অহংকারী ফিরাউনের কথা যে নিজেকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে নিয়েছিল। যে প্রতাপশালী ফিরাউন নিজেকে দাবি করেছিল মানুষের রব হিশেবে, যে হত্যা করেছিল বনি ইসরাইলের হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে, সেই ফিরাউনের কাছে যখন সত্যের দাওয়াত-সহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুসা আলাইহিস সালাম এবং তার ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে পাঠাচ্ছেন, তখন তিনি বললেন—

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

তোমরা দুজন তার সাথে নরম সুরে কথা বলবে। হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা আমাকে ভয় করবে।[১]

ফিরাউনের মতো উদ্ধত, অহংকারী, সীমালঙ্ঘনকারী জালিমের সাথে কথা বলার সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন যেন তার সাথে নরম সুরে, কোমল গলায় কথা বলা হয়। ফিরাউনের মতো অবাধ্য জালিমের ক্ষেত্রে যদি আল্লাহর অবস্থান এ রকম হয়, আপনার সাথে কীরকম হবে ভাবুন তো? আপনি তো তাঁকেই সিজদা দেন, তাঁর কাছেই সাহায্য চান, আপনার মঙ্গল-অমঙ্গল সবকিছুর জন্য তাঁর ওপরই ভরসা করেন। মাঝে মাঝে শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পড়ে পাপ করে ফেলেন। আপনার পাপের পরিমাণ তো ফিরাউনের পাপের সমান নয়। ফিরাউনের জন্যে যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুযোগ বরাদ্দ রাখেন, তাকে উদ্দেশ্য করে যদি আল্লাহ বলতে পারেন 'হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে', আপনার বেলায় রাব্বুল আলামিনের মহত্ত্ব, ক্ষমা আর দয়ার পরিমাণ কেমন হবে ভাবতে পারেন? তাই, সুযোগ হারাবেন না। আপনি পাপ করবেন জেনেই তিনি তাঁর ক্ষমার ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। আপনি যদি পাপ করে তাওবাই না করেন, তিনি ক্ষমা করবেন কাকে বলুন তো? রাতের গভীর কালো অন্ধকারে আল্লাহর কাছে কাঁদুন। তিনি আপনার জীবনকে আলো ঝলমলে দিনে পরিণত করে দেবেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চমৎকার, আশা জাগানিয়া এই হাদিসটির কথাগুলো শুনুন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

---

[১] সুরা ত-হা, আয়াত : ৪৪

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমাকে যেমন ভাবে, আমি তেমন। সে যখন আমার কথা স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথে থাকি। সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও মনে মনে তাকে স্মরণ করি। সে যদি কোনো সভায় আমাকে স্মরণ করে, আমি তারচেয়েও ভালো সভায় তার কথা উল্লেখ করি। সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে এলে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি এক হাত এগোয়, আমি দু-হাত এগিয়ে যাই। সে আমার দিকে হেঁটে এলে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।'[১]

আপনার আমার সকল অবাধ্যতা, সকল ঔদ্ধত্যের পরেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের জন্য সুযোগ তুলে নেননি। আমাদের জন্য বন্ধ করে দেননি ফিরে আসার রাস্তা। তিনি জানিয়ে রাখছেন, আমি যদি তাকে স্মরণ করি, তিনিও আমাকে স্মরণ করবেন। কত বড় একটা ব্যাপার এটা, ভাবুন তো! আমি দুনিয়ায় বসে আল্লাহকে স্মরণ করলে তিনি সাত আসমানের ওপর থেকে আমাকে স্মরণ করবেন! কোনো টেলিফোন নয়, কোনো ইমেইল, চিঠি কিংবা বায়বীয় কোনো মাধ্যম নয়। কেবল অন্তরের গভীর থেকে তাকে একটুখানিই স্মরণ! আমি যদি আল্লাহকে আমার কোনো আড্ডায় স্মরণ করি, আমার আড্ডার বন্ধুরা যখন দুনিয়াবি আলাপে মেতে উঠতে চায়, তখন যদি আমি তাদের সুমহান আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিই, যদি বলি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, মিথ্যে বলো না, আল্লাহর অবাধ্য হয়ো না, অসৎ পথে পা বাড়িয়ো না, তখন আসমানের অধিপতি ফেরেশতাদের সমাবেশে আমার কথা স্মরণ করেন। আমার নাম উত্থাপন করেন। সম্মানিত ফেরেশতাদের সামনে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমার কথা বলছেন, আমার নাম নিচ্ছেন, চোখ দুটো বন্ধ করে এই দৃশ্যটা একটু ভাবুন তো!

মহান রব, যিনি হলেন গাফুরুর রাহীম, অসীম, অনিঃশেষ দয়ার সাগর, তিনি আপনার-আমার ফিরে আসার চেষ্টাগুলোকে এতটাই মূল্যায়ন করেন। আমরা যদি পাপের রাস্তা ছেড়ে তাঁর দিকে এক বিঘত হেঁটে যাই, তিনি আমাদের দিকে এক হাত হেঁটে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমরা এক হাত গেলে তিনি দু-হাত এগিয়ে আসেন। আমরা যদি তার দিকে হেঁটে যাই, তিনি আমাদের দিকে দৌড়ে আসেন। তিনি কতভাবেই-না আমাদের ক্ষমা করতে চান। কত উপায়েই-না তিনি খোলা রেখেছেন অপার ক্ষমার দুয়ার।

তিনি তাঁর পরিচয় মেলে ধরেছেন 'গাফুরুর রাহীম' হিশেবে। অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন। তাঁর ক্ষমা সবসময় তাঁর ক্রোধের ওপর বিজয়ী হয়। আমাদের গুনাহর পরিমাণ যদি আকাশ ছুঁয়ে যায়, পৃথিবী যদি আমাদের গুনাহগুলোকে সংকুলান দিতে ব্যর্থ হয়, যদি আকাশ আর জমিনের মাঝে আমিই সবচেয়ে বড় গুনাহগার, সবচেয়ে বড় পাপী, সবচেয়ে নিকৃষ্ট, অথর্ব, অপদার্থ হয়ে থাকি, তবুও হতাশ হবার কিছু নেই। আকাশের মেঘ কখনো সূর্যকে ঢেকে দিতে পারে না। মেঘ ফুঁড়ে সূর্যের আলো ঠিকই ঠিকরে বেরিয়ে আসে। অন্তরে পাপের যে মেঘ ঘনীভূত হয়ে আছে, সেগুলোও ধুয়েমুছে যাবে। সেই মেঘের কোলেও সূর্য হাসবে। হৃদয়ের অন্দরমহলে কেবল একটু জায়গা খালি রাখি যেখানটায় উচ্চারিত হবে, 'আল্লাহুম্মাগ-ফিরলি! আল্লাহুম্মাগ-ফিরলি! হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন। ও আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দিন!'

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

বসন্ত এসে গেছে

হৃদয়ে যে বসন্ত আসে, সেই বসন্তের নাম দ্বীন। এই বসন্তের আগমনে হৃদয়কাননে ফোটে শুদ্ধতার ফুল। অন্তরমননে জাগে শুভ্রতার শিহরন। এই বসন্ত অন্তরে জ্বেলে দেয় আলোর মশাল। সেই আলোতে দূর হয় হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার। জেগে উঠে ম্রিয়মাণ বৃক্ষরাজি। এই বসন্ত অন্তরে বইয়ে দেয় খুশির কল্লোল। হৃদয়গহীনে প্রস্ফুটিত করে নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন।

দ্বীনটাকে জীবনে বাস্তবায়ন করা এক অর্থে খুব সহজ, আবার অন্য অর্থে খুব বেশি সহজ নয়। যারা সত্যিকার অর্থে দ্বীনে প্রবেশ করতে চায়, যাদের অন্তর আপাত বিস্মৃত থাকলেও ইসলামের ভালোবাসা হৃদয় থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, তাদের জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, নিজের নফসের ধোঁকা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা, সর্বোপরি দ্বীনকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে বাস্তবায়ন করাটা সহজ হয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি যখন জাহিলিয়াতের আবরণ ছেড়ে ইসলামের দিকে ধাবমান হতে চায়, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই তার জন্য সিরাতুল মুস্তাকিমের রাস্তা খুলে দেন। পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করে দেন। অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন। এ বিষয়ে কুরআনে চমৎকার একটি আয়াত আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন—

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۝٢ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (সমস্যা থেকে উত্তরণের) রাস্তা বের করে দেন। আর তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক প্রদান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।[১]

'আল্লাহকে ভয় করা' মানে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা এড়িয়ে চলা। এই একটি বিষয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে একজন মুমিনের গোটা জীবনপ্রণালি। তার অন্তরে হয় তাকওয়া তথা 'আল্লাহভীতি' থাকে, নয়তো তার অন্তর হয় তাকওয়াশূন্য। যার অন্তরে তাকওয়া থাকে, সে কখনোই আল্লাহর অবাধ্য হতে পারে না। সে কখনোই সালাত ছেড়ে দেয় না, সিয়াম ছেড়ে দেয় না। তার দুনিয়ার জীবনের পরতে পরতে থাকে আল্লাহভীতির ছাপ। সে যখন নির্জনে, একাকী অবস্থায় থাকে, যখন পাপের সাগরে নিশ্চিন্তে ডুব দেওয়ার অবাধ সুযোগ তার সামনে আসে, যখন দুনিয়ার কোনো চোখ তাকে দেখতে পায় না, কোনো কান তাকে শুনতে পায় না, ঠিক তখনো সে গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় না। সে বিশ্বাস করে, দুনিয়ার সকল চোখ আর কানকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আসমানে যিনি আছেন তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তিনি সর্বাবস্থায় সব দেখেন, সব শোনেন। গভীর সাগরতলে পাথরের ওপর হাঁটতে থাকা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব থেকে শুরু করে কোটি আলোকবর্ষ দূরের গ্রহাণু—সবকিছুর ওপর রয়েছে তাঁর সমান সজাগ দৃষ্টি। এই বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করার নামই হলো তাকওয়া। এটাই হলো আল্লাহভীতি। এই বৈশিষ্ট্য যার হৃদয়-মননে প্রোথিত, সে কখনোই আল্লাহর আদেশ অমান্য করতে পারে না। পারে না আল্লাহর নিষেধকে জীবনে জড়িয়ে নিতে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, যে আল্লাহকে ভয় করে, অর্থাৎ যার অন্তরে তাকওয়া আছে তার জন্য বিপদ থেকে উত্তরণের পথ আল্লাহ নিজেই তৈরি করে দেন। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাওয়া মানুষের জন্য এরচেয়ে খুশির সংবাদ আর কীই-বা হতে পারে? আমার মনে পড়ে, আমি যখন দাড়ি রাখা শুরু করি, তখন নানান লোক আমাকে নানান কথা শোনাত। এলাকার মুরব্বি গোছের লোকগুলো চোখের কোণা দিয়ে তীব্র অবহেলা মিশ্রিত চাহনি সহকারে বলত, 'মাথায় ভীমরতি চেপেছে নাকি? তোমার বাপে মোছ রাখে নাই, তুমি বানাইছ একহাত লম্বা দাড়ি।'

---

[১] সুরা তালাক, আয়াত : ২-৩

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

তখন দ্বীনে একেবারেই নতুন। কেবল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে ভালোবেসেই দাড়ি রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিশেবে এলাকার মানুষগুলোর তির্যক মন্তব্য, এমনকি আমার পরিবারের সদস্যদের নানান কটু কথায় আমি তখন খণ্ডবিখণ্ড প্রায়। একে তো বেকার অবস্থা, তার ওপর হঠাৎ করে এমন পরিবর্তন! চারদিক থেকে আমার ব্যাপারে নানান আলাপ, নানান গুঞ্জন চাউর হতে লাগল। এমন বিপদের দিনে আমার ওপর বর্ষিত হয়েছিল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অপার দয়া। তিনি আমার জন্য সহজ করেছেন বিপদসংকুল যাত্রা। আমার অন্তরকে তিনি ভরে দিয়েছেন ঈমানী জযবাতে। দ্বীনের বুঝটাকে আমার জন্য খুব সহজ করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষের কথায় আমি কষ্ট পেতাম না, হতাশ হতাম না। দাড়িতে নিজেকে কখনো পশ্চাৎপদ মনে হতো না। বরং অন্তরে এক অন্য রকম স্নিগ্ধতা বিরাজ করত সর্বদা। মনে হতো আমি আল্লাহর রাস্তায় আছি। এই পথেরই তো সন্ধান করে বেড়াই প্রতি রাকআত সালাতে। ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকীম। এটাই তো সেই আরাধ্য জীবন যার স্বপ্ন বুকে বুনে চলেছি প্রতিনিয়ত। তাহলে এই জীবনে কেন আমি আশাহত হব? কেন ভাবব, আমি অন্যদের চেয়ে অসুন্দর আর পশ্চাৎপদ? আমার এই যে চিন্তার শক্তি, এই শক্তিটুকু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই আমার অন্তরে দান করেছিলেন। ফলে দ্বীনে ফেরার প্রথম দিকের সেই দিনগুলোতে আমি সংযমী হতে শিখেছি। ধৈর্যধারণের প্রাথমিক পাঠ আমি তখনই লাভ করেছি। বুঝতে শিখেছি, আল্লাহর রাস্তায় চলতে গেলে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার দরকার হয়।

যারা সত্যিকারঅর্থেই আল্লাহর জন্যই বদলাতে চায়, তাদের জন্য এই আপাত অসম্ভব খুব সহজেই সম্ভব হয়ে যায়। ফিরাউন বাহিনীর কবল থেকে মুসা আলাইহিস সালামকে উদ্ধারের জন্য নদীর মাঝে আল্লাহই তো রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন। তিনিই তো ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য নমরুদের আগুনকে শান্ত করে দিয়েছিলেন। মাছের পেটে ইউনুস আলাইহিস সালামকে তিনিই রক্ষা করেছেন। যখন ইহুদিরা ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে আসে, তখন আল্লাহই পরম মমতায় তাকে দ্বিতীয় আসমানে তুলে নেন। হিজরতের দিন যখন গুহামুখে অত্যাচারী কুরাইশরা ঘুরঘুর করছিল, তখন মহামহিম আল্লাহই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করেছিলেন। এসব হলো তাকওয়ার ফল। তাদের অন্তরে এমন উঁচু স্তরের তাকওয়া বিদ্যমান ছিল।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেছেন, 'তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক প্রদান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।' এই অংশটার খুব সুন্দর উদাহরণ আছে নবি মুসা আলাইহিস সালামের জীবনে। ফিরাউনের রাজ্য থেকে পালিয়ে তিনি যখন মাদইয়ান নগরে চলে আসেন, তখন তিনি স্রেফ একজন আগন্তুক। ঘরহারা পথিক। মাথা গোঁজার এতটুকু ঠাঁই নেই কোথাও। কিন্তু অন্তরভরা ঈমান আছে। দিল-ভরতি তাকওয়া। সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর আছে অগাধ আস্থা, বিশ্বাস। আল্লাহর প্রতি এমন নতজানু হৃদয় যার, তার কি রিযিকের ব্যাপারে কোনো চিন্তা থাকতে পারে? মুসা আলাইহিস সালামকেও চিন্তিত হতে হয়নি। একেবারে অপরিচিত আগন্তুক হয়েও তিনি মাদইয়ানে পেয়ে গেলেন আশ্রয়ের সন্ধান। দুজন মহিলার বকরিকে পানি পান করিয়ে দেওয়ার পর তিনি হাত তুলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবেন, আমি তারই মুখাপেক্ষী।'[১]

তার এই দুআর মধ্যে ভাববার মতন অনেক উপকরণ রয়েছে আমাদের সামনে। মহিলাদের উপকার করে তিনি তাদের কাছে আবদার করে বলেননি, 'আমাকে আজ দুপুরে কিছু খেতে দেবেন?' উপকারের প্রতিদান তিনি মানুষের কাছে চাননি। চেয়েছেন আল্লাহর কাছে। এটাই তাকওয়া। এটাই ঈমান। আল্লাহর কাছে চাইতে গিয়েও তিনি বলেননি, 'আল্লাহ, আমি তো মেয়ে দুটোর উপকার করলাম। এখন আপনি আমাকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।' তিনি এভাবেও চাননি। বরং তিনি বলেছেন, 'হে আমার রব! আমার প্রতি যে অনুগ্রহ আপনি নাযিল করবেন, আমি তারই মুখেপেক্ষী।' তিনি আল্লাহর কাছে নির্দিষ্ট করে কিছু চাননি। 'কী দেবেন' সেই ব্যাপারটা আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ যা-ই দিবেন তাতেই তিনি খুশি। তিনি নির্ভর করেছেন আল্লাহর ওপরে। আর যারা আল্লাহর ওপরে নির্ভর করে তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যান। মুসা আলাইহিস সালামের বেলাতেও তা-ই ঘটল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কন্যাদ্বয়ের বাবার মাধ্যমে তাদের বাড়িতে নবি মুসার থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এটাই আল্লাহর অনুগ্রহ। এটাই আল্লাহর অপার দয়া। মুসা আলাইহিস সালাম খানিক পূর্বেও জানতেন না, মাদইয়ানে তিনি কোথায় থাকবেন, কী খাবেন, কী করবেন। একটু পরেই আল্লাহ তার জন্য রিযিকের সমস্ত দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন। যারা আল্লাহর ওপরে ভরসা করে, আল্লাহর রাস্তায় থাকতে চায়, আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে চায়, তাদের জন্য এভাবেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবকিছুকে সহজ করে দেন।

---

[১] সুরা কাসাস, আয়াত : ২৪

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন খুব ছোট। মাত্রই ১৩ বছরের বালক। সেই ছোট্ট বয়সেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হৃদয়ে বসন্ত আনয়নের জন্য কিছু কার্যকরী উপদেশ দিয়েছিলেন। হৃদয়কাননে বসন্ত বাহার চাষের সেই গল্পটা আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাসের মুখ থেকেই শুনতে পাই। তিনি বলেছেন—

একদিন আমি ঘোড়ায় চেপে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছন পেছন যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আব্দুল্লাহ, আজ আমি তোমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দেবো। তুমি সর্বদা আল্লাহকে স্মরণে রেখো, তাহলে আল্লাহ তোমার ব্যাপারে যত্নশীল হবেন। তুমি তাঁকে স্মরণে রেখো, তাহলে তাঁকে তোমার পাশে পাবে। যখন কিছু চাইবে তখন কেবল আল্লাহর কাছেই চাও। যখন তোমার সাহায্যের দরকার হবে, তখন কেবল তাঁরই মুখাপেক্ষী হও। বাবা, মনে রেখো, যদি গোটা দুনিয়াও তোমার কল্যাণার্থে একত্র হয়, তথাপি আল্লাহ তোমার কল্যাণ না চান, তাহলে কারও সাধ্য নেই যে, তোমার একবিন্দু পরিমাণ কল্যাণ করে। আবার, যদি গোটা দুনিয়াও তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্র হয়, তথাপি আল্লাহ তোমার কল্যাণ চান, তাহলে কারও সাধ্য নেই যে, তোমার একবিন্দু পরিমাণ ক্ষতি করে।'[১]

চমৎকার এই উপদেশগুলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছিলেন বালক ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে। নিজের জীবনে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে উপাদান দরকার, তার সবটুকুই এই হাদিসের মধ্যে বিদ্যমান। তিনি বলেছেন আল্লাহর হকগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে। যদি আল্লাহর হকের ব্যাপারে সতর্ক থাকা যায়, তাহলে আল্লাহ আমাদের প্রতি যত্নশীল হবেন। আমরা আল্লাহকে আমাদের পাশে পাব। আমাদের সুখে-দুখে, সর্বদা। আল্লাহর হকগুলো কী? ইবাদতই হলো আল্লাহর হক। আমাদের সালাত, আমাদের সিয়াম, হজ, যাকাত এবং কুরবানি। আমরা যদি এগুলোর ব্যাপারে যত্নশীল হই, তাহলে আল্লাহও আমাদের ব্যাপারে যত্নশীল হবেন। তিনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন। আমাদের রিযিক বাড়িয়ে দেবেন। তিনি বলেছেন যদি কিছু চাইতে হয়, তাহলে কেবল আল্লাহর কাছেই চাইতে। আমরা মনে করি, আল্লাহর কাছে কেবল পরকালের বিষয়াদিই চাইতে হয়। দুনিয়ার কোনো কিছুই মনে হয় চাওয়া যায় না কিংবা চাওয়া ঠিক না। এটা নিতান্ত ভুল ধারণা। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দুনিয়ার

[১] জামি তিরমিযি : ২৫১৬, হাদিসটি সহিহ

উত্তম জিনিসও চাওয়ার জন্য বলেছেন। আমরা দুআর মধ্যে পড়ি, 'রাব্বানা আতিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানাহ।' দুনিয়ার উত্তম বস্তু চাওয়াতে কোনো মানা নেই। জীবনে বসন্তের ছোঁয়া আনতে এগুলোই হলো বুনিয়াদি ব্যাপার। ইবনু আব্বাসকে দেওয়া নবিজির এই উপদেশগুলো উম্মাহর সকল যুবকের জন্যই প্রযোজ্য।

আপনি যখন দ্বীনের পথে হাঁটতে শুরু করবেন, তখন আপনার মনে অন্য রকম এক খুশির কল্লোল প্রবাহিত হবে। সেই খুশি হারাম থেকে বেঁচে থাকতে পারার খুশি। সেই খুশি আল্লাহর আনুগত্য করতে পারার খুশি। সেই খুশি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহকে, তার শিক্ষাকে জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারার খুশি। মোবাইল-কম্পিউটার থেকে আপনি যখন গান আর মুভির ফোল্ডারটা এক ক্লিকে ডিলেট করে দেবেন, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই আপনি যখন এতদিনের হারাম রিলেশানশিপকে এক মুহূর্তে ত্যাগ করে ফেলবেন, আল্লাহর আদেশ মানার জন্যই যখন আপনি হারাম টাকার লোভনীয় বেতনের চাকরিটা চোখ বন্ধ করে ছেড়ে আসবেন, তখন আপনার মন এক অনুপম আনন্দে নেচে উঠবে। সেই আনন্দ পবিত্রতার আনন্দ। সেই আনন্দ হারাম থেকে নিজেকে মুক্ত করার আনন্দ। সেই আনন্দ রবের কাছে আত্মসমর্পণের আনন্দ। 'পাছে লোকে কিছু বলে'—কথাটাকে তোয়াক্কা না করে যখন আপনি মুখে দাড়ি রেখে দেন, তথাকথিত আধুনিকতার বলয় ছেড়ে যখন আপনি নিজেকে হিজাবে আবৃত করে নেন, যখন জীবনের প্রতিটি কাজে, কথায়, চিন্তায় আপনি সৎ থাকেন, তখন আপনার মনে দোলা দিয়ে যায় বসন্তের হাওয়া। হাজারো প্রতিকূলতায় আপনি দিশেহারা হন না। শত ঝড়-ঝঞ্ঝাটেও আপনি ভেঙে পড়েন না। আপনার হৃদয়ে বয়ে চলা বসন্ত বাতাসের স্নিগ্ধতার কাছে এ সমস্ত সংকট নিতান্তই তুচ্ছ। হৃদয়মননে যে বসন্ত এসে গেছে তা ধরে রাখুন। আল্লাহর কাছে আকুল ফরিয়াদ করে বলুন, 'ইয়া মুকাল্লিবাল কুলুব, সাব্বিত ক্বালবি আলা দ্বীনিক।' এই দুআটা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন যার অর্থ—'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার অন্তরকে দ্বীনের ওপর দৃঢ় রাখুন।'[১]

[১] জামি তিরমিযি : ২১৪০, হাদিসটি সহিহ

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

দ্বীনে প্রবেশের অর্থই হলো একটা যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া। সেই যুদ্ধটা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বলবৎ। সেই যুদ্ধটা নিজের সাথে। নিজের নফসের সাথে। শয়তানের ওয়াসওয়াসার সাথে। এই যুদ্ধে লড়তে গিয়ে আমরা বারবার পিছিয়ে পড়তে পারি। ভেঙে পড়তে পারি। আশাহত হতে পারি। তাই এ রকম অবস্থাতেও যেন আমাদের পদস্খলন না ঘটে, যাতে আমরা সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ থেকে বিচ্যুত না হই, এজন্যেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুআ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন।

সালাতে আমার মন বসে না

[ক]

যে মানুষটা নিজের কাজে খুব ধীরস্থির, খুব ভেবেচিন্তে, গুছিয়ে কাজ করতে ভালোবাসে, মসজিদে এলে সেই মানুষটাও কেমন যেন তাড়াহুড়ো শুরু করে। দুনিয়ার কাজকর্মে যিনি 'মান' ধরে রাখতে খুবই তৎপর, মসজিদে এলে তাকেও খুব অগোছালো পাওয়া যায়। খুব অদ্ভুত আমাদের আচরণ! আমরা আমাদের ব্যবসায়ে বারাকাহ চাই, আমাদের হায়াত বৃদ্ধি হোক চাই, আমাদের বিপদ দূর হোক চাই, আমরা চাই যে, আমাদের ধনসম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক। কিন্তু, এই যে ব্যবসায়ে বারাকাহ, হায়াত বৃদ্ধি, বিপদ দূরীকরণ কিংবা ধনসম্পদের উপর্যুপরি বৃদ্ধি পাওয়া—এসবকিছুই যার হাতে, যার নিয়ন্ত্রণে এবং যার অধীন—সেই মহান রবের সান্নিধ্য পাবার সবচেয়ে কার্যকরী মুহূর্ত হচ্ছে সালাত। অথচ, সেই সালাতেই আমাদের রাজ্যের উদাসীনতা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সালাত জিনিসটা যেন আমাদের ওপর খুব জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোনো বস্তু। কোনো রকমে দুটো সিজদা দিয়ে কাজ সারতে পারলেই যেন আমরা দিব্যি বেঁচে যাই।

দুনিয়ায় খ্যাতি লাভ করেছে এমন কিছু মানুষের সান্নিধ্যে যাওয়ার অল্প কিছু সুযোগ আমার হয়েছে। দেখেছি, তারা যখন কথা বলেন তখন তাদের আশপাশে থাকা মানুষগুলো গভীর মনোযোগ আর স্থিরতা নিয়েই তাদের কথা শুনতে থাকে। কোনো অক্ষর, কোনো শব্দ, কোনো বাক্য তারা বাদ দিতে চায় না। হৃদয়-মননে যেন সবটুকু গেঁথে নিতে পারলেই ভক্তকূল ধন্য হয়। দুনিয়ার সেলিব্রিটিদের সান্নিধ্য আর

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

তাদের কথা শোনার জন্য আমাদের ব্যাকুলতার কমতি নেই। অথচ, যিনি রাব্বুল আলামিন, বিশ্বজাহানের মালিক—তাঁর সাথে কথা বলতেই যেন আমাদের রাজ্যের অনীহা, অনিচ্ছা, অনাগ্রহ। সালাতে দাঁড়ালেই আমাদের মন উথালপাথাল করে ওঠে। অফিসে রেখে আসা আমার অর্ধসমাপ্ত হিশেব, মিস করে যাওয়া বিকেলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট, রাতের খোশগল্পের আড্ডা—সবকিছুই আমাদের হৃদয়পটে ভেসে উঠতে থাকে। বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে আমরা তখন যন্ত্রের মতন উঠবস করি মাত্র। এই অনীহা, অনাগ্রহের কারণ হলো, আমরা সালাতকে কেবল আনুষ্ঠানিক 'ইবাদত' মনে করি। চাপিয়ে দেওয়া কোনো বোঝা মনে করি বলেই সালাতে আমাদের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। যখনই আমরা সালাতকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম মনে করতে পারব, যখনই আমরা বুঝতে পারব যে, সালাতই আল্লাহর নৈকট্য লাভের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম। যখন মনের মধ্যে আল্লাহর জন্য অপরিসীম ভালোবাসা জমা করতে পারব, তখনই আমাদের সালাতগুলো মধুময় হয়ে উঠবে। সালাত হচ্ছে সেই মূহূর্ত, যে মূহূর্তে বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটে চলে যায়। সালাত হচ্ছে সেই মূহূর্ত, যে মুহূর্তে বান্দার সাথে তার রবের কথোপকথন হয়। সালাত হচ্ছে সেই সময়, যে সময় বান্দা তার রবের কাছে সকল সমস্যার ঝুলি, বিপদের বিবরণ, চাওয়া-পাওয়ার বাসনা নিয়ে উপস্থিত হয়। এই সালাত হতে হয় মধুর। বান্দা তার সমস্ত প্রেম, সমস্ত ধ্যান এই সালাতেই ঢেলে দেবে।

[খ]

যুগের বিবর্তনের ফলে আমাদের সমস্যা সমাধানে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। ডিপ্রেশানে ভুগলে আমরা এখন কানে হেডফোন গুঁজে দিয়ে গান শুনি। প্রিয় কবির লেখা বিরহের কবিতা আওড়াই। যারা এসবের ধারেকাছে ঘেঁষে না, তারা সিগারেট ফুঁকে কিংবা নেশা করে। অথচ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সালাতে আমার চোখের প্রশান্তি রাখা হয়েছে।'[১] চোখ আর মনের প্রশান্তি আসার কথা ছিল সালাতে। কিন্তু আমরা প্রশান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি গান-কবিতা, সিগারেট আর নেশাদ্রব্যে। মূলত সালাতের মধ্যে কীভাবে ডুব দিতে হবে, কীভাবে সালাত আদায় করলে চোখের আর মনের প্রশান্তি লাভ করা যাবে, সেসব বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা না থাকায় আমরা আজ সালাতের আসল উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা থেকে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। সালাতকে আমরা বন্দি করে ফেলেছি কতিপয় শারীরিক ব্যায়ামের মধ্যে। সালাত আমরা কেন পড়ছি, কী উদ্দেশ্যে পড়ছি, সালাতে আমরা কী বলছি বা কী বলা উচিত—এ সকল ব্যাপারে উদাসীন থাকার দরুন আজ আমাদের সালাতগুলোর এমন করুণ অবস্থা।

[গ]

সালাতে মনোযোগ ধরে রাখার কিছু কার্যকরী উপায় রয়েছে। এই উপায়গুলো নিয়ে আমাদের সালাফগণ কথা বলেছেন। আমরা যদি আমাদের সালাতে সেই উপায়গুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে আশা করা যায়, আমাদের সালাতগুলো প্রাণ ফিরে পাবে, ইন শা আল্লাহ।

সালাতে মনোযোগ স্থাপনের একেবারে শুরুর উপায় হলো নিয়ত। না, আমি আসলে মুখে উচ্চারিত সালাতের নিয়তের কথা বলছি না। 'নিয়ত' বলতে আমি মূলত সালাত আদায় করার জন্য আপনি যে মনস্থির করলেন, সেটাকেই বোঝাতে চাইছি। কোনো কাজ করার জন্য আমরা যখন মনস্থির করি, তখন সেটাকেই নিয়ত বলা হয়। ইসলামে নিয়তের রয়েছে ব্যাপক গুরুত্ব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।'[১] মানে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি কাজটা শুরু করবেন, তার ফলাফল দিনশেষে তা-ই হবে।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে। ধরুন, রাতে ঘুমানোর আগে আপনি নিয়ত করলেন যে ফজরের সালাত আপনি অবশ্যই জামাআতে আদায় করবেন। আপনি জামাআতে আদায় করতে চাচ্ছেন কেন? কারণ, জামাআতে আদায় করলে একাকী আদায়ের চাইতে ২৭ গুণ বেশি সাওয়াব।[২] এ ছাড়াও জামাআতে সালাত আদায়ের আরও বিভিন্ন ফজিলত আছে। সেই ফজিলতগুলো লাভের জন্যই আপনি জামাআতে সালাত আদায় করার নিয়ত করলেন। তাহলে, আপনার নিয়ত এখানে শুদ্ধ।

---

[১] সহিহ বুখারি : ১

[২] সহিহ বুখারি : ৬৪৫; সহিহ মুসলিম : ৬৫০। সহিহ বুখারি-র অন্য আরেকটি হাদিসে (৬৪৬) এসেছে, 'জামাআতে সালাত আদায় করলে একাকী আদায়ের চাইতে পঁচিশগুণ বেশি সাওয়াব।' এ দু-হাদিসের মাঝে সমন্বয় হচ্ছে, সালাত আদয়কারীর সালাতে একাগ্রতা, মনোযোগ, সঠিক পদ্ধতিতে সালাত আদায়ও নিয়তের ওপর ভিত্তি করে নেকি কমবেশি হবে। ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'সাতাশগুণ সাওয়াব সরবে কিরাআত বিশিষ্ট সালাতে আর পঁচিশগুণ সাওয়াব নীরবে কিরাআত বিশিষ্ট সালাতে।'

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আবার ধরা যাক, আপনি গভীর রাত অবধি ফেইসবুকিং করেন। ফেইসবুকিং করে ঘুমোতে ঘুমোতে আপনার রাত অর্ধেকের বেশি শেষ হয়ে যায় প্রায়। দেরিতে ঘুমোনোর ফলে আপনি সচরাচর ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করতে পারেন না। আপনার যখন ঘুম ভাঙে তখন জামাআত শেষ। ঘড়িতে সময় দেখে আপনি চমকে যান। সূর্যোদয়ের আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি! এই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আপনাকে ফজরের সালাত পড়ে নিতে হবে। না হয় সালাতটা কাযা হয়ে গেল বলে! ব্যস, আপনি একলাফে উঠে, ধুড়ুমধাড়ুম করে ওযু করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। কেবল ফরযটুকু পড়ার সময় হাতে আছে আপনার। সালাত শেষ করে দেখলেন সূর্যোদয়ের আরও এক মিনিট বাকি! মানে—ঘুম থেকে ওঠা, ওযু করা আর সালাত পড়া নিয়ে আপনার খরচ হয়েছে মাত্র চার মিনিট! এটাই হলো গিয়ে আপনার নিত্যদিনকার রুটিন!

আরও ধরা যাক, আপনার বাসায় একদিন আপনার কোনো বন্ধু অতিথি হয়ে এলো। আপনার বন্ধু খুব আল্লাহওয়ালা মানুষ। ফেইসবুকে আপনার দাওয়া প্রচার, বিভিন্ন দাওয়াতি লেখাজোখা দেখে তার ধারণা জন্মেছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আপনি অবশ্যই অবশ্যই জামাআতে আদায় করে থাকেন। এখন, আপনার আল্লাহওয়ালা বন্ধুটি যদি দেখে আপনি ফজরের সালাত সূর্যোদয়ের ঠিক পাঁচ মিনিট আগে আদায় করছেন, তাও আবার বাসায়—ব্যাপারটা কেমন দেখাবে? আপনি ভাবলেন যে, ব্যাপারটা আপনার এবং আপনার সোশ্যাল ইমেজের জন্য লজ্জাজনক! এহেন লজ্জার মুখে নিজেকে আপনি কোনোভাবেই ফেলতে পারেন না। তাই, ফজরের আযানের সাথে সাথে জাগার জন্য যত রকমের উপায় অবলম্বন করা যায়, তার সবকটির বন্দোবস্তই সেদিন রাতে আপনি করে রাখলেন। দু-দুটো ফোনে এলার্ম সেট করে রাখলেন। স্ত্রীকে বলে রাখলেন, ‘তুমি জাগতে পারলে আমাকে জাগিয়ে দেবে কিন্তু।’ এই যে ফজরের সালাত জামাআতে আদায়ের জন্য এত বন্দোবস্ত, এত আয়োজন আপনি করলেন, এগুলো কিন্তু ফজিলতলাভের আশায় নয়, বন্ধুর কাছে আপনার ইমেইজ বাঁচানোর তাগিদে। পাছে আপনার বন্ধু আপনার সম্বন্ধে কোনো নেগেটিভ ধারণা নিয়ে যাক, সেটা আপনি চান না। এখানে আপনার নিয়ত আল্লাহকে খুশি করে তার প্রিয় হওয়া নয়, বরং বন্ধুকে খুশি করে তার কাছে নিজেকে আরও বেশি ‘দ্বীনদার’ প্রমাণ করা। আপনার এই নিয়ত শুদ্ধ নয়। যেহেতু আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক কাজের ফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল, তাই আপনার অশুদ্ধ নিয়তের ফলও আপনি পাবেন। আপনার বন্ধুর চোখে আপনি ঠিকই আল্লাহওয়ালা, বুজুর্গ প্রমাণিত হবেন, যা আপনি চেয়েছেন। কিন্তু, এ রকম নিয়তের জন্য আখিরাতে আপনার লাভের খাতা শূন্য।

এটাই হলো নিয়তের ব্যাপার। তাই, আমরা যদি আমাদের সালাতগুলোকে সত্যিকার চোখ আর মনের প্রশান্তি লাভের মাধ্যম হিশেবে পেতে চাই, আমাদের উচিত সবার আগে আমাদের নিয়তকে বিশুদ্ধ করা। আমাদের ঠিক করতে হবে, কেন আমি সালাত আদায় করছি। আল্লাহকে রাজি-খুশি করা, তাঁর প্রিয়ভাজন হওয়া, তাঁর নৈকট্য অর্জনই কি আমার সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য? নাকি মানুষের কাছে নিজেকে ভালো প্রমাণ করা, পরহেজগার সাজাই উদ্দেশ্য?

শুরুতেই একটি বিশুদ্ধ নিয়ত নিয়ে আপনি সালাতে দাঁড়াবেন। ‘আল্লাহু আকবার’ বলে সালাতের শুরুতে নিজেকে এক গভীর ভাবনার জগতে তলিয়ে দেবেন। ‘আল্লাহু আকবার’ মানে কী? ‘আল্লাহু আকবার’ অর্থ হলো ‘আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।’ কথাটার নিগূঢ় যে অর্থ, সেটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন। ‘আল্লাহু আকবার’ বলে আপনি এমন এক সত্তার সামনে দাঁড়াচ্ছেন যিনি হচ্ছেন আসমান-জমিনের মধ্যে থাকা সবকিছুর ঊর্ধ্বে। তিনিই রাজাধিরাজ, অধিপতি। তার ওপরে আর কেউ নেই। আর কিচ্ছু নেই। ‘আল্লাহু আকবার’ বলার সাথে সাথে আপনি এই মর্মে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, আল্লাহ হলেন আপনার জ্ঞাত-অজ্ঞাত সকল সত্তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা। তাই, ‘আল্লাহু আকবার’ বলার সাথে সাথে একটি ব্যাপার মাথায় নিয়ে আসুন যে, আপনি এমন এক সত্তার সামনে দাঁড়িয়ে গেছেন, যার ক্ষমতার ওপরে দুনিয়ার আর কারও ক্ষমতা নেই। যার দয়ার ওপরে দুনিয়ার আর কারও দয়া নেই। আবার, যার শাস্তির ওপরে দুনিয়ার আর কারও শাস্তি নেই। আরও ভাবুন, নিজের অগণিত পাপের কথা, অবাধ্যতার কথা। আপনি ঠিক সে রকম অবস্থায় আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছেন, যে রকম অবস্থায় একজন অবাধ্য দাস তার মনিবের সামনে দাঁড়ায়। একজন দাস বা চাকর যেমন অন্যায় করার পরে খুব বিনীত ভঙ্গিতে, ভয়ার্ত চেহারায়, কাঁপা কাঁপা শরীর নিয়ে তার মনিবের সামনে ক্ষমাপ্রার্থনার আশা নিয়ে দাঁড়ায়, আপনিও সে রকম একজন। আল্লাহর ক্ষমালাভের আশায় আপনি শুরুতেই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে দাঁড়িয়ে গেছেন।

এরপর যখন আপনি সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবেন। মনে রাখতে হবে, সুরা ফাতিহা কেবল একটি সুরা নয়। এটা উম্মুল কুরআন। কুরআনের মা। এই সুরার সমতুল্য আর কোনো সুরা নেই। এটি সুরা তো অবশ্যই, পাশাপাশি এটি একটি চমৎকার দুআও। অথচ দেখুন, সুরা ফাতিহা যে একটা চমৎকার দুআ, এটা আমরা বুঝতে পারি না। কেন বুঝতে পারি না? কারণ, সুরা ফাতিহা কী বলতে চায় কিংবা সুরা ফাতিহায় আমরা আসলে কী পড়ি, সেটা আমরা কোনোদিন জানার চেষ্টা করিনি। এজন্যেই আমরা জানতে পারিনি কী অসাধারণত্ব বহন করছে সাত আয়াতের এই

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

সুরাটি। সাধারণত, সালাতে আমরা এত দ্রুত আর এত তাড়াহুড়োর সাথে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করে থাকি যে, আমরা কী বলছি আর কী পড়ছি তা বুঝতেও পারি না। উস্তায আলি হাম্মুদা হাফিযাহুল্লাহ একবার একটি কথা বলেছিলেন, 'সালাতে আপনি যেভাবে আর যে গতিতে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করেন, ঠিক সেই গতিতে আপনার প্রিয় কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলে দেখুন তো তাদের প্রতিক্রিয়াটা কী হয়?' ব্যাপারটা আসলে তা-ই। আমরা যত দ্রুত সালাতে সুরা ফাতিহা পড়ি, ঠিক একই গতিতে কি আমাদের অফিসের বসের সামনে আমরা কথা বলতে পারব? চাকরির বেহাল দশা হবে না? অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হলেন সম্মানিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। গুরুত্বপূর্ণদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সামনে দাঁড়ালে ঠিক কতটা ধীরস্থির, কতটা বিনয় আর নম্রতার সাথে সুরা ফাতিহা পড়া উচিত আমাদের?

সুরা ফাতিহা পাঠে আমাদের দ্রুততা কিংবা তাতে অমনোযোগিতার প্রধান কারণ হলো সুরা ফাতিহায় আমরা কী পড়ি সেটা অনুধাবনে আমাদের ব্যর্থতা। আমরা সুরা ফাতিহায় পড়ি—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

বিচার দিনের মালিক

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

আমাদের সরলপথে পরিচালিত করুন।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

তাদের পথে যাদের আপনি করুণা করেছেন।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ

তাদের পথে নয় যারা অভিশপ্ত হয়েছে।

সালাতে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াতের ব্যাপারে খুব সুন্দর একটি হাদিস আছে। ওই হাদিস থেকে জানতে পারি, সুরা ফাতিহা তিলাওয়াতের সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের কথাগুলোর জবাব দেন—

বান্দা যখন বলে, 'আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন', তখন আল্লাহ বলেন,

> আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।

বান্দা যখন বলে, 'আর রাহমানির রাহিম', তখন আল্লাহ বলেন,

> আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করছে।

বান্দা যখন বলে, 'মালিকি ইয়াওমিদদ্বীন', আল্লাহ তখন বলেন,

> আমার বান্দা আমার বড়ত্ব ঘোষণা করছে।

বান্দা 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন' বললে আল্লাহ বলেন,

> এ অংশ আমার ও আমার বান্দার জন্য। আমার বান্দা যা চাইবে আমি তাকে তা-ই দেবো।

মানে হলো বান্দা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করবেন।

বান্দার 'ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আন-আমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদ্বুবি আলাইহিম ওয়ালাদদ্ব-ল্লীন' বলার জবাবে আল্লাহ বলেন,

> আমার বান্দা আমার কাছে যা চেয়েছে সে তা-ই পাবে।[১]

[১] সহিহ মুসলিম : ৩৯৫, সুনানুন নাসায়ি : ৯০৯

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

কী চমৎকার, তাই না? আমরা আল্লাহকে ডাকছি আর আল্লাহ আমাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন! কেবল ওই মুহূর্তটার কথা চিন্তা করুন তো! এটা কিন্তু কথার খাতিরে বলা কোনো কথা নয় কিংবা আমার বানানো কোনো আবেগী বর্ণনাও নয়। এটা নবিজির হাদিস। নবিজির বলা কথা কি কখনো মিথ্যে হতে পারে? আমরা যখন বুঝে বুঝে, অনুধাবন করে, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঢেলে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করব, আল্লাহ তখন ঠিকই আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন। তাই, আজ থেকে আর গৎবাঁধাভাবে সুরা ফাতিহা পড়া নয়। আজ থেকে আমরা এক ভিন্নভাবে, ভিন্ন প্রেরণা, ভিন্ন ভাবনা নিয়ে সুরা ফাতিহা পড়ব। এমনভাবে পড়ব যেন আল্লাহ আমাদের কথাগুলো শুনছেন আর জবাব দিচ্ছেন। আমরা তাঁর দেওয়া জবাবগুলো শুনতে পাব না। কিন্তু তাতে কী! আমরা বিশ্বাস করব যে, তিনি আমাদের তিলাওয়াত শুনছেন এবং জবাব দিচ্ছেন।

সুরা ফাতিহা পড়া শেষ হলে কুরআনের যে অংশ আমার জন্য সহজ, সেই অংশ থেকে তিলাওয়াত করব। সেটা হতে পারে সুরা ইখলাস, নাস, ফালাক, লাহাব, কাফিরুন, সুরা আসর কিংবা অন্য যেকোনো ছোট বা বড় সুরা। সম্ভব হলে এই সুরাগুলোরও অর্থ শিখে নেব। তাহলে পড়ার সময় বুঝতে পারব আমরা আসলে আরবিতে কী বলছি। যদি বুঝতে পারি, তাহলে সালাতে মনোযোগ ধরে রাখা খুব সহজ হয়ে যায়। মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয় না।

তিলাওয়াত শেষ করার পরে আমরা 'আল্লাহু আকবার' বলে রুকুতে চলে যাব। 'আল্লাহু আকবার' বলার সময় মনের ভাবনায় কোন দৃশ্যপট আঁকতে হবে তা তো আগেই বলেছি। এবার রুকু এবং সিজদা নিয়ে চমৎকার আরেকটি হাদিস উদ্ধৃত করি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন তার গুনাহগুলো তার শরীর থেকে তার কাঁধ এবং মাথায় চলে আসে। এরপর, সে যখন মাথা নিচু করে রুকুতে যায়, তখন সেই গুনাহগুলো তার কাঁধ এবং মাথা থেকে ঝরে নিচে পড়ে যায়।'[১]

কী চমৎকার একটি সুযোগ! কতই-না সুন্দর একটি দৃশ্য! আমরা যখন একাগ্রচিত্তে সালাতে দাঁড়াই, অমনি আমাদের সকল গুনাহ পুরো শরীর থেকে কাঁধ এবং মাথায় চলে আসে। তিলাওয়াত শেষ করে যখন আমরা রুকুতে যাই, তখন আমাদের গুনাহগুলো ঝরে পড়ে যায়!

---

[১] *সহিহ ইবনু হিব্বান : ১৭৩৪; সিলসিলাতুল আহাদিসিস*

এই কথাটা পৃথিবীর কোনো সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ কিংবা অর্থশাস্ত্রবিদের নয়। এই কথা যিনি বলেছেন তিনি হলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ—রাহমাতুল্লিল আলামিন। তাহলে এই কথায় কি কোনো খাদ থাকতে পারে? এই কথা নিয়ে আমাদের কারও মনে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? অবশ্যই নয়। তিনি যখন বলেছেন, রুকুতে গেলে বান্দার গুনাহ ঝরে পড়ে, তখন সেটা অবশ্যই অবশ্যই সত্য।

বিশ্বাস করুন, এই হাদিসটির ওপর অন্তর থেকে আমল করে আমরা যদি খাঁটি নিয়ত আর বিশুদ্ধ ইখলাস নিয়ে সালাত পড়ি, আমাদের মনই চাইবে না রুকু থেকে মাথা ওঠাতে। মন চাইবে, থাকি না আরও কিছুক্ষণ। গুনাহগুলো সব ধুয়েমুছে ঝরে যাক। আমাদের মনে এই ব্যাপারটি বদ্ধমূল হয়ে গেলে রুকুতে আমরা অন্য রকম একটা মজা পেয়ে যাব।

রুকুতে আমরা আরও কিছু ব্যাপার মাথায় রাখতে পারি। যেমন—আমি এমন এক সত্তার কাছে মাথা নুইয়ে দিয়েছি যিনি এই সুবিশাল সৃষ্টিজগতের অধিপতি। মালিক। যার কাছে আমি নিতান্ত তুচ্ছ। আমি হলাম দাস আর তিনি মালিক। আমি মাথা নুইয়ে তাঁকে বলছি, 'মালিক, আপনি মহান। মালিক, আপনি মহান।'

এরপর গভীর মনোযোগের সাথে রুকুর তাসবিহ পাঠ শেষে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে মাথা ওঠাব। এই 'সামিআল্লাহু লিমান হামীদাহ' অর্থ কী? এর অর্থ হলো 'আমার রব সেই ব্যক্তির প্রশংসা শোনেন, যে তাঁর প্রশংসা করে।' কী দুর্দান্ত একটি কথা! আমি যখন আমার রবের প্রশংসা করি, আমার রব তখন সেই প্রশংসা শোনেন। একটু ভাবুন তো—আমরা যখন ফুটবলার মেসির প্রশংসা করি, মেসি কি আমাদের সেই প্রশংসা শোনে? আমরা যখন কোনো অভিনেত্রী, কোনো গায়ক, কোনো শিল্পী বা পৃথিবী বিখ্যাত কোনো সেলিব্রিটির প্রশংসায় গদগদ হই, তাদের কেউ কি আমাদের সেই প্রশংসাবাক্য শোনে? আমাদের স্তুতিবাক্য, প্রশংসা আর গুণকীর্তনের ফুলঝুরির বাক্যগুলো তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায়? অথচ এই আসমান-জমিন, এই মহাজগৎ, বিশ্বজাহানের যিনি মালিক, যার কাছে দুনিয়ার সেলিব্রিটিদের বালুকণা পরিমাণও মূল্য নেই, সেই সুমহান সত্তা আমার প্রশংসা শোনেন, যখন আমি তাঁর প্রশংসা করি। তিনি আমার স্তুতি শোনেন, যখন আমি তাঁর স্তুতি গাই। আমি যখন ঠোঁট নেড়ে বলি, আল-হামদু লিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর), তখন আমার সেই শব্দ, সেই স্তুতিবাক্য সাত আসমানের পর্দা ভেদ করে সোজা আরশে আযিমে পৌঁছে যায়। তাতে কোনো বিমান দরকার হয় না, দরকার হয় না কোনো সুপার পাওয়ারের রকেট। তাতে দরকার হয় না কোনো মাধ্যম, কোনো ওয়াসিলা।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

দরকার হয় কেবল আমার একাগ্রতা, বিনয় আর ইখলাস। ব্যস, আর কিছু না। এই যে, রাজাধিরাজ আল্লাহ আমার প্রশংসা শুনছেন—এই ব্যাপারটাই তো অন্য রকম!

রুকু শেষ করে আমরা সিজদায় যাই। সিজদা হলো আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যকার সম্পর্কের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতম মুহূর্ত। বান্দা সিজদায় আল্লাহর সবচাইতে নিকটবর্তী হয়ে যায়। আমরা যখন সিজদায় যাব, তখন আমরা আরও কিছু ব্যাপার মানসপটে এঁকে নেব। আগের মতো এবারও আমরা স্মরণ করব নিজেদের পাপের কথা, অবাধ্যতার কথা। মনিবের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে একজন দাস কী করে? হাউমাউ করে কেঁদেকুটে মনিবের পা জড়িয়ে ধরে বলে, 'মাফ করে দেন হুজুর। আমি অন্যায় করেছি। আমি জানি আমি ঠিক করিনি। আমি আপনার কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন। আপনি মাফ না করলে কে আমাকে মাফ করবে, বলুন? আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে?'

হ্যাঁ, সত্যিই আল্লাহ ব্যতীত আমাদের আসলে আর কেউই নেই। আল্লাহর চাইতে উত্তম অভিভাবক আমাদের জন্য আর কেউ হতেই পারে না। সিজদায় আমরা সেই সত্তার কাছে লুটিয়ে পড়ব, যিনি আমাদের লালনপালন করেছেন আমাদের মায়ের পেটে, যিনি আমাকে দুনিয়ার আলো-বাতাস দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমি পাপী, গুনাহগার। নিজের আত্মার সাথে নিত্য যুলুম করে চলা এক জালিম আমি। আমাকে ক্ষমা করতে পারে শুধু আল্লাহ। সেই আল্লাহর কাছেই সিজদায় আমি লুটিয়ে পড়েছি। আমার এখন কাজ কী? আমার কাজ হচ্ছে যেভাবেই হোক ক্ষমা আদায় করে নেওয়া। বাচ্চা যেভাবে মায়ের কাছ থেকে বুকের দুধ আদায় করে নেয়। ক্ষুধা পেলে সে যেমন হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দেয়, ঠিক সেভাবে গুনাহের ভারে নুইয়ে পড়া এই আত্মাকে জাহান্নামের লেলিহান আগুনের শিখা হতে বাঁচাতে আমাকেও কাঁদতে হবে। হুহু করে কান্না! চোখের জল ফেলতে হবে। বলতে হবে, 'আল্লাহ, পাপ করতে করতে নিজেকে পাপের অতল সাগরে ডুবিয়ে ফেলেছি। নিঃশ্বাসজুড়ে কেবল পাপ আর পাপ। শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে পাপের অবাধ প্রবাহ। আমার পাপের স্তূপের কাছে হিমালয় পর্বতও নস্যি। কিন্তু আপনি তো রাহমানুর রাহিম, দয়ালু। আপনি ক্ষমা না করলে কে এমন আছে যে আমাকে ক্ষমা করবে? রাস্তা দেখাবে? কেউ নেই। আমায় ক্ষমা করে দিন। আমাকে সরল-সহজ পথে পরিচালিত করুন।'

সিজদায় আন্তরিক হতে হবে। মনপ্রাণ এক করে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। যা কিছু চাওয়ার, যা কিছু পাওয়ার সব সবিস্তারে আল্লাহর কাছে খুলে বলতে হবে। আল্লাহর বড়ত্বের কাছে নিজের তুচ্ছতা অন্তরে এনে আল্লাহকে মন থেকে ডাকতে হবে। যদি সালাতের সাথে আমাদের মন জুড়ে যায়, যদি আমাদের সালাতগুলো প্রাণ ফিরে পায় নতুন করে, তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, সালাতের জন্য আমাদের মন সর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকবে। প্রিয়জনের দর্শনলাভের জন্য যেমন করে ব্যাকুল, অস্থির হয়ে থাকে মন, ঠিক সেভাবে সালাতের জন্য, সালাতে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার জন্যও আমরা ব্যাকুল হয়ে পড়ব।

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢

সে সকল মুমিন সফলকাম হয়ে গেছে, যারা তাদের সালাতে বিনয়ী।[১]

[১] সুরা মুমিনুন, আয়াত : ১-২

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব...

মানুষের একটি স্বভাব হলো—সে তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি, সবচাইতে মূল্যবান বস্তুটি সবচেয়ে সুরক্ষিত জায়গায় রাখতে চায়। এজন্যেই প্রিয় কোনো উপহার আমরা আমাদের প্রিয় জায়গায় সাজিয়ে রাখি। মূল্যবান জিনিসটি সুরক্ষিত স্থানে এনে রাখি যাতে করে সেটা হারিয়ে না যায়। চুরি হয়ে না যায়। এভাবেই প্রিয় লেখকের অটোগ্রাফওয়ালা বই, প্রিয় মানুষের সাথে তোলা ছবি, প্রিয়জনের পাঠানো চিরকুটকে আমরা পরম যত্নে আগলে রাখি।

প্রিয় মানুষ, প্রিয় মুখ, প্রিয় মুহূর্ত, প্রিয় ছবি, প্রিয় জিনিসের প্রতি আমাদের দুর্বার আকর্ষণ। সেই আকর্ষণকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে লেখা হয়েছে অসংখ্য কবিতা। লেখকদের কলমের কালিতে সেই আকর্ষণ হয়ে উঠেছে গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু। শিল্পীর রং-তুলির আঁচড়ে সেগুলো হয়ে উঠেছে আরও জীবন্ত, আরও আগ্রহোদ্দীপক।

প্রিয় মানুষটাকে আমরা কখনোই চোখের আড়াল হতে দিতে চাই না। তার একটু অনুপস্থিতি আমাদের হৃদয়কে অশান্ত করে তোলে। তার একটু অভিমান আমাদের হৃদয়ে ঘটায় রক্তক্ষরণ। তার সাথে একটু দূরত্ব আমাদের হৃদয়পারে ভাঙনের প্লাবন তৈরি করে। আমরা তাকে কখনোই হারাতে চাই না। দূরে রাখতে চাই না। আমরা সবসময় তাকে কাছে কাছে চাই। চোখে চোখে চাই। চাই অন্তরে অন্তরে।

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও একটি জিনিসকে সর্বদা, সর্বক্ষণ বুকের সাথে বেঁধে রাখতে বলেছেন। অন্তরে গেঁথে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

রাখতে বলেছেন হৃদ মাঝারে এবং এই কাজের জন্য তিনি এমন এক মহাপুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তিনি সাতজন ব্যক্তিকে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। সেই মহাদুর্যোগাপন্ন দিন! যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না। একটু ছায়ার জন্য যেদিন সব মানুষ হাহাকার-হাপিত্যেশ করবে। এমন বিভীষিকাময় দিনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাত শ্রেণির ব্যক্তিকে ভালোবেসে, পরম মমতায়, অপার অনুগ্রহে তাঁর আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় দেবেন। সেই সাত শ্রেণির মধ্যে একটি শ্রেণি হলো ওই সকল লোক, যাদের অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে।[১] অর্থাৎ, যাদের হৃদয় মসজিদেই পড়ে থাকে। ওই সকল লোক, যারা মসজিদকে হৃদয়ের সাথে বেঁধে রাখে, যারা মসজিদকে তাদের অন্তরের সাথে গেঁথে রাখে।

ভাবছেন মসজিদকে আবার অন্তরের সাথে বেঁধে রাখে কীভাবে, তাই না? আসলে এটি একটি উপমা। এই উপমার মাধ্যমে নবিজি হৃদয়ের কাকুতি, অন্তরের ব্যাকুলতা বুঝিয়েছেন। যে কাকুতি হবে সালাতের জন্য। যে ব্যাকুলতা হবে আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দেবার জন্য। তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করার জন্য হৃদয়গভীরে যে উদ্বেলতা কাজ করবে, সেটাকেই উদ্দেশ্য করেছেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মসজিদে এক ওয়াক্ত সালাত পড়ে আসার পর আপনার অন্তর আবার ছটফট করতে থাকবে পরবর্তী ওয়াক্তের জন্য। আপনার হৃদয় তড়পাতে থাকবে পুনরায় মসজিদে যাওয়ার জন্য। আবার সালাতে শামিল হওয়ার জন্য আপনার মন সবসময় উদগ্রীব থাকবে। প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও আপনার কান সর্বদা সজাগ থাকবে যেন পরবর্তী সালাতের আযান মিস না হয়। আপনি বারবার ঘড়ির দিকে তাকাবেন সালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেল কি না বা ওয়াক্ত হতে আর কতক্ষণ সময় বাকি আছে সেটা দেখার জন্য। সেই মোতাবেক আপনি আপনার কাজকর্মগুলোকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করে আনবেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই ওযু করে রাখবেন অথবা ওযু করার সময়টুকু হাতে রেখেই মসজিদে যাবেন। মসজিদে জামাআত হয় এমন সময়ে আপনি কখনোই মিটিং রাখবেন না। জরুরি কাজে ব্যস্ত থাকবেন না। আপনার কাজ আর ব্যস্ততার মাঝেও মনের মধ্যে একটা তাড়না কাজ করবে, 'জামাআতেই আমাকে সালাত আদায় করতে হবে।' এটাই হলো মসজিদকে বুকের সাথে বেঁধে রাখা। অন্তরের সাথে গেঁথে ফেলা। হৃদ মাঝারে স্থান দেওয়া। এই জিনিসটা যারাই রপ্ত করতে পেরেছে, তাদের জন্যই

---

[১] সহিহ বুখারি : ৬৬০; সহিহ মুসলিম : ১০৩১

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

হাদিসের ওই মহা সুসংবাদ। তাদেরই হাশরের ময়দানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর আরশের নিচে ছায়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কিন্তু এই অভ্যাস রপ্ত করার কৌশল কী? কৌশল হচ্ছে—অন্তরের যে ব্যাপারগুলোতে আল্লাহর স্থানে নিজেদের নফসকে প্রাধান্য দিয়ে রেখেছি, সেগুলো সংশোধন করে নেওয়া। তাকওয়ার বদলে যেখানে প্রবৃত্তি শেকড় গেঁড়ে বসেছে, সেসব জায়গা থেকে প্রবৃত্তিকে শেকড়-সহ উপড়ে ফেলা। নিজের কৃত পাপের একটা তালিকা তৈরি করা। সেই তালিকা ধরে ধরে নিজেকে প্রশ্ন করা যে, এসব পাপ থেকে আমি বেরুতে পেরেছি কি না বা আদৌ বের হওয়ার চেষ্টা করেছি কি না। যদি বের হতে না পারি, তাহলে এখন আমার ঠিক কী করা উচিত?

আরেকটু সহজ করা যাক। আচ্ছা, নিজেকে প্রশ্ন করি তো, 'আমি কি সিনেমা দেখি?' যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে কখনো কি জানার চেষ্টা করেছি, সিনেমা দেখা আমার জন্য হালাল না হারাম? এটা কি আমার জন্য বৈধ না অবৈধ? যেখানে অর্ধনগ্ন মহিলারা অভিনয় করে, যেখানে একজন পুরুষ আর একজন নারীর পরকীয়া প্রদর্শিত হয়, অবাধ মেলামেশাকে প্রদর্শন করা হয়—এমন জিনিস কি একজন মুসলিম হয়ে আমি দেখতে পারি? আল্লাহ কি আমার জন্য এটা অনুমোদন করেছেন?

নিজেকে প্রশ্ন করি, 'আমি কি গান শুনি?' গানে একজন নারীর প্রতি আসক্তির কথা থাকে। তার জন্য হৃদয় হাহাকার করার কথা থাকে। আরও অনেক অশ্লীল কথাবার্তা গানের মধ্যে পাওয়া যায়। এই গান শোনা কি আমার জন্য শরিয়ত-সম্মত? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি এটা আমার জন্য বৈধ করেছেন? গান শুনলে কি আমার পুণ্য হয় না পাপ?

নিজের কাছে এভাবে প্রশ্নের ডালা মেলে বসি, চলুন। নিজেকে একের পর এক প্রশ্নে জর্জরিত করি—আমি কি হারাম রিলেশানশিপে আছি? আমি কি মিথ্যে কথা বলে মানুষ ঠকাই? আমি কি অন্যের হক নষ্ট করে চলি? পিতা-মাতার ব্যাপারে যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাকে দিয়েছেন, তা কি আমি পালন করছি? আমি কি কোনোভাবে আমার পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির কারণ? আমার দ্বারা কি আল্লাহর কোনো বান্দা কিংবা সৃষ্টির ক্ষতি সাধিত হচ্ছে? আমি কি আমার সহপাঠী মেয়ের দিকে কুনজরে তাকাই?

নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তরগুলো একের পর এক সাজাতে হবে। যদি আমরা এই ধরনের পাপে সত্যি সত্যিই নিমজ্জিত থাকি, তাহলে আজকে, এই মুহূর্ত থেকেই

তাওবা করে ফিরে আসতে হবে। বদলে যেতে হবে নিজেকে। পাল্টে ফেলতে হবে অভ্যাস। এভাবে কৃত পাপগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেই আমরা সহজে আমাদের অন্তরকে মসজিদের সাথে সংযুক্ত করতে পারব।

পাপের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার দরুন আমরা ভালো কাজ থেকে দূরে সরে যাই। পাপ কাজগুলো কখনোই আমাদের আল্লাহর কাছাকাছি আসতে দেয় না। পাপের সাগরে আমগ্ন অবগাহনের ফলে আমাদের অন্তর তাওবার দিকে ঝুঁকে আসে না। তখন আমাদের সালাত ভালো লাগে না, সিয়াম ভালো লাগে না। রামাদান মাসকে তখন আমাদের কাছে বাড়তি একটা বোঝা মনে হয়। কেবল চক্ষুলজ্জা এড়াতেই আমরা তখন সিয়াম রাখি আর মসজিদে গিয়ে থাকি।

এ প্রসঙ্গে খুব চমৎকার একটি কথা বলেছেন হাসান আল বাসরি রাহিমাহুল্লাহ। একবার একলোক তার কাছে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, আপনি তো বলেন, পাপ কাজ করলে নাকি আল্লাহ তাঁর নিআমতগুলো থেকে বান্দাকে বঞ্চিত করেন। আমি কিন্তু প্রচুর পাপ কাজ করি এবং ভালো কাজ একদম করিই না বলা চলে। কিন্তু দেখুন, আমার খুব সুন্দর একটি স্ত্রী আছে। সন্তানসন্ততি আছে। আমার রয়েছে প্রচুর টাকা ও ধনসম্পদ। বলা চলে, আল্লাহ আমাকে কোনো কিছু থেকেই বঞ্চিত করেননি। তাহলে আপনি কীভাবে এই কথা বলেন যে, পাপ কাজ করলে আল্লাহ বান্দাকে তাঁর নিআমত থেকে বঞ্চিত করেন?'

লোকটার কথা শুনে হাসান আল বাসরি রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'আচ্ছা, তুমি কি রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে পারো? আন্তরিকতার সাথে কখনো আল্লাহর কাছে দুআ করতে পারো? তুমি কি তৃপ্তি সহকারে কখনো সালাত আদায় করতে পারো? কুরআন পড়তে পারো? এসবই তো আল্লাহর নিআমত থেকে বঞ্চিত হবার জন্য যথেষ্ট।'

হাসান আল বাসরি রাহিমাহুল্লাহর সুন্দর এই জবাবটির মাঝে অনেক উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের জন্য। বাহ্যিকভাবে, আমরা আমাদের চারপাশে এমন অনেক লোককে দেখি যারা আগাগোড়া পাপের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। সুদ খাচ্ছে, ঘুস খাচ্ছে। দুর্নীতি করছে, মানুষ ঠকাচ্ছে। অশ্লীল কাজে জড়িয়ে আছে। কিন্তু তারপরও তাদের ধনসম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। এই ধরনের মানুষের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন তো, শেষ কবে তারা আল্লাহর কাছে আন্তরিকতার সাথে কাঁদতে পেরেছে, মনে আছে কি না। শেষ কবে তারা কেবল আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য সালাত আদায় করেছে,

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

মনে আছে কি না। শেষ কবে সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ ধরে রাখতে পেরেছে, মনে পড়ে কি না। পাপের মধ্যে ডুবে থাকার ফল এমনই। আপনার সাথে দুনিয়ার সম্পর্ক বেড়ে যাবে, কিন্তু আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্কের দূরত্ব কেবল বাড়তেই থাকবে। আপনি পাপের মধ্যে আমগ্ন ডুবে থাকলে কখনোই সালাতে মনোযোগ দিতে পারবেন না। রুকু এবং সিজদার তাসবিহগুলোতে কী বলছেন সেটা বুঝতে পারবেন না। আপনার সালাত তখন আপনার কোনো কাজেই আসবে না। তা কেবল শারীরিক ব্যায়ামে পরিণত হবে। আযান হলেই আপনার বিরক্ত লাগবে। চেয়ার ছেড়ে মসজিদে যেতে মন চাইবে না। তবুও, আমার সহকর্মীরা মসজিদে যাচ্ছে, আমি না গেলে কেমন দেখায়—এমন চক্ষুলজ্জা এড়াতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে মসজিদে যেতে হবে। গৎবাঁধাভাবে কিয়াম, রুকু, সিজদা করতে হবে। এসবের কোনো কিছুতেই আপনি মজা পাবেন না। বরং আপনি ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠবেন। মনে হবে, যেন সালাত থেকে পালাতে পারলেই আপনি বেঁচে যান। অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, আমাদের অন্তরজুড়ে এক মহামারি চলছে। সেখানে পাপের বীজগুলো একেকটা মহিরুহে পরিণত হয়ে আছে। সেই মহিরুহগুলোকে উপড়ানো না গেলে তা একদিন আমার সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

সুতরাং, আমাদের অন্তরকে মসজিদের সাথে বেঁধে ফেলার একটি শর্ত হলো পাপ থেকে মুক্ত থাকা। যখনই আমি মিথ্যে বলা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করব, যখনই অন্যের হকের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকব, যখনই অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখব, যখনই নিজের জীবন থেকে আমি সমস্ত অশ্লীলতা ও তার নিয়ামকসমূহকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেবো, তখনই সেখানে প্রতিস্থাপিত হবে একটি নুর। সেই নুর হলো হিদায়াতের নুর। সেই নুরের ঝলকানিতে ঝলমল করে উঠবে আমাদের দেহ-মন। তখন সালাতের জন্য আমরা সারাক্ষণ উদ্গ্রীব থাকব। কবে আযান হবে, কবে মসজিদমুখী হব—এমন চিন্তায় বিভোর থাকবে আমাদের অন্তর। যাদের অন্তরে মসজিদের জন্য এমন মায়া, এমন টান, এমন ভালোবাসা বিদ্যমান, তাদের জন্যই তো সুসংবাদ দিয়েছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারাই হবে সেই ছায়ার নিচে আশ্রয়প্রাপ্ত সৌভাগ্যবানের দল। যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন এই ছায়ার নিচে থাকতে হলে আমরাও কি মসজিদকে আমাদের অন্তরের সাথে বেঁধে রাখতে পারি না? পারি না আমাদের হৃদ মাঝারে মসজিদকে সত্যিকার স্থান দিতে?

যুদ্ধ মানে শত্রু-শত্রু খেলা

আমাদের জীবনে আমরা নানা সময়ে নানান অঙ্গীকার করে থাকি। সেই অঙ্গীকারগুলোর কোনোটা আমরা পূরণ করতে পারি, কোনোটা পারি না। কোনোটা পূরণে আমরা উদ্গ্রীব, আবার কোনোটার বেলায় আমরা চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করি। ধরা যাক আমার কোনো এক শত্রুর কথা। সে অঙ্গীকার করেছে যে, জীবনে সে আমাকে কখনোই সফল হতে দেবে না। আমার সফলতার পথে সবসময় সে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। যখনই আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাইব, তখনই সে আমার পা টেনে ধরবে। আমি দাঁড়াতে চাইলে আমাকে বসিয়ে দেবে। আমি দৌড়াতে চাইলে আমাকে থামিয়ে দেবে। আমি বলতে চাইলে আমাকে চুপ করিয়ে দেবে। মোদ্দাকথা, সে আমার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যাবে। আমার ক্ষতি করার জন্য দুনিয়ায় যা যা করতে হয়, তার সবটাই সে করবে। তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হবে আমার ক্ষতি করা। আমাকে বিপথগামী করা। আমাকে আমার সফলতার রাস্তা থেকে বিচ্যুত করা। আমাকে পথভ্রষ্ট করে ফেলা।

আরও ধরা যাক, সেই শত্রুকে আমি চিনে ফেলেছি। কোনো-না-কোনোভাবে তার সমস্ত পরিকল্পনা আমি জেনে গেছি। তার চেহারা, তার কাজ, তার গতিবিধি, তার অগ্রপশ্চাৎ—সবকিছুই আমার সামনে দিনের আলোর মতন পরিষ্কার। এমতাবস্থায়, তার ব্যাপারে আমার অবস্থান কী হবে? তাকে ঠেকানোর জন্য আমি কি কোনো উপায়ান্তর খুঁজব না? তাকে থামানোর জন্য আমি কি কোনো পদক্ষেপই নেব না? তার শত্রুতা থেকে বাঁচতে, তার ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা থেকে নিজেকে বাঁচাতে আমি কি মরিয়া হয়ে উঠব না? আমি কি আমার সমস্ত শক্তি, সমস্ত কলা-কৌশল, সমস্ত

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে তাকে পরাস্ত করতে চাইব না? সচেতন বুদ্ধিমান লোকের জবাব হবে, অবশ্যই! এ রকম প্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়াই তো একজন সত্যিকার সচেতন ও দূরদর্শী মানুষের কাজ।'

তাহলে, এবার আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিই আপনার জীবনের এমন এক শত্রুর সাথে, যার চাইতে বড় শত্রু আপনার জন্য আর কেউ নেই। যে আপনার জীবনের সফলতার পথে বাধা। অনন্ত জীবনের যে মহাসাফল্যের কথা আপনাকে আপনার রব শুনিয়েছেন, যুগে যুগে নবি-রাসুলগণ যে মহাসাফল্যের কথা আপনাকে শুনিয়ে গেছেন, সেই সফলতার দরজায় আপনার জন্য দুর্গসমান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে শত্রু, তাকে আপনি চিনতে চান না? আপনাকে আপনার রব চিনিয়ে দিচ্ছেন এভাবে—

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

নিশ্চয় সে (শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১]

এবার আপনি আপনার প্রকাশ্য, আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু, আপনার সফলতার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতাকে চিনে ফেলেছেন। শুধু শত্রুকে চিনে ফেললেই তার শত্রুতা থেকে বাঁচা যায় না। তার কলা-কৌশল, তার পরিকল্পনা, তার দুরভিসন্ধি, তার অসৎ অভিপ্রায় সম্পর্কে জানতে না পারলে শত্রু চিহ্নিতকরণের যে সাফল্য, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। আপনার রব আপনাকে এখানেও হতাশ করেননি। তিনি কখনো তার প্রিয় বান্দাদের হতাশ করেন না। তিনি আপনাকে ভালোবাসেন। তাই, তিনি কেবল আপনাকে শত্রু চিনিয়ে দিয়েই থেমে যাননি। বলেননি, 'শত্রুকে চিনিয়ে দিলাম। এবার তার পরিকল্পনা জেনে নিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে নাও।' তিনি শত্রু চিনিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি শত্রুর পরিকল্পনাও আপনার সামনে তুলে ধরেছেন। আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু আপনাকে নিয়ে কী ফন্দি আঁটছে। আপনাকে ঘিরে আপনার শত্রুর মহাপরিকল্পনা তিনি ফাঁস করে দিয়েছেন এজন্যই যে, তিনি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসেন। আপনি যাতে নির্বিঘ্নে শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে পারেন, শত্রুকে পরাস্ত করতে পারেন, শত্রুর পরিকল্পনা জেনে তাকে ঠেকানোর যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১৪২

হ্যাঁ, শয়তান আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু। প্রকাশ্য শত্রু। আপনাকে ঘিরে শয়তানের রয়েছে কয়েকটা নীল নকশা। সেই নীল নকশাগুলোর ফাঁকফোকর জেনে আপনাকে সামনে আগাতে হবে। আপনাকে মনে রাখতে হবে, সামান্য একটু পা ফসকালেই আপনি অতল গহ্বরে হারিয়ে যেতে পারেন। তাই অতি সাবধানে, খুব সতর্কতার সাথে আপনাকে পথ চলতে হবে। আপনাকে আরও মনে রাখতে হবে, শয়তান কখনোই আপনার মহান রবের চেয়ে বড় নয়। শয়তানের শক্তি কখনোই আপনার প্রতিপালকের শক্তির ওপর বিজয়ী হতে পারে না। তবে, এটা নিশ্চিত, শয়তান আপনার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। শয়তানের চক্রান্তের কাছে আপনি নিতান্তই শিশু। শয়তানের পরিকল্পনার সামনে আপনার পরিকল্পনা স্রেফ খড়কুটোর মতন উড়ে চলে যাবে। তাই কখনোই এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, আপনি নিজ যোগ্যতায় শয়তানকে পরাস্ত করে ফেলতে পারবেন। এটা একেবারেই অসম্ভব। এমনকি আল্লাহর শক্তিশালী কালাম কুরআন মাজিদ পাঠের সময়ও আমরা বিতাড়িত শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। বলি, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম।

আপনাকে ঘিরে আপনার প্রকাশ্য শত্রু, আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় দুশমন শয়তানের চার-চারটে মাস্টারপ্ল্যান রয়েছে। কুরআনের সুরা নিসার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই চারটে পরিকল্পনা, সেই চারটে মাস্টারপ্ল্যান বিবৃত করেছেন। শয়তান যখন তার দোষে আসমান থেকে বিতাড়িত হলো, যখন সে অভিশপ্তদের কাতারে নাম লেখাল, তখন সে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সামনে চারটে অঙ্গীকার তথা শপথ করে। সেই চারটে শপথ সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে। জাহান্নামের লেলিহান শিখা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যই আপনাকে জানতে হবে।

শয়তানের প্রথম অঙ্গীকার ছিল—

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ

এবং আমি তাদের অবশ্যই পথভ্রষ্ট করব।[১]

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

শয়তান এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, সে আপনাকে পথভ্রষ্ট করবে। সে আপনাকে আপনার আসল পথ থেকে বিচ্যুত করবে। সে আপনাকে বিপথগামী করবে। শয়তান কীভাবে আপনাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে, সে ব্যাপারটা বোঝার জন্য আমরা সৃষ্টির একেবারে শুরুর দিকের একটা ঘটনায় আলোকপাত করতে পারি। আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহাস সালামকে শয়তান কীভাবে জান্নাত থেকে বিচ্যুত করেছিল সেই ঘটনা আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, শয়তান যে জিনিসটা সবচাইতে ভালো বোঝে সেটা হলো মানুষের সাইকোলোজি। সে জানে মানুষ কীসে প্রলুব্ধ হয়, কীসে তার আগ্রহ। মানুষের সাইকোলোজি বুঝেই শয়তান টোপ ফেলে। যেমন—আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহাস সালামকে সৃষ্টি করার পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের জান্নাতে থাকতে দিয়েছিলেন। তবে, সাথে জুড়ে দিয়েছেন একটা শর্ত, একটা নিষেধাজ্ঞা। জান্নাতের সবখানে তারা বিচরণ করতে পারবে, ঘুরে বেড়াতে পারবে, সবকিছুই ভোগ করতে পারবে, তবে নির্দিষ্ট একটা গাছের কাছে তারা যেতে পারবে না। এই নিষেধাজ্ঞা মেনেই আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহাস সালাম জান্নাতে থাকতে শুরু করলেন। এই নিষেধাজ্ঞার ভেতর থেকেই শয়তান নিজের চালটা বের করে আনল।

জান্নাতের পরমানন্দে অভিভূত হয়ে যান আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহাস সালাম। আহা! স্বপ্নও তো এত সুন্দর হয় না! সেই অপরূপ নৈসর্গিক স্বর্গোদ্যানে তারা খুব আনন্দের সাথেই দিন কাটাতে লাগলেন। এমনই আনন্দমুখর একটা দিনে, একদিন ইবলিস শয়তান তাদের কাছে এলো। বলল, 'আল্লাহ যে তোমাদের ঐ গাছটির নিকটে যেতে বারণ করলেন, তার কারণ জানো? তার কারণ হলো—তোমরা যদি ঐ গাছটার কাছে যাও এবং ঐ গাছের ফল খাও, তাহলে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে, নয়তো তোমরা এখানে চিরঅমর হয়ে যাবে। যাতে তোমরা ফেরেশতা বনে যাওয়া কিংবা চিরঅমর হওয়ার সুযোগ না পাও, সে জন্যেই কিন্তু আল্লাহ তোমাদের ঐ গাছের কাছে ঘেঁষতেও নিষেধ করেছেন।'[১]

বলা বাহুল্য, সৃষ্টিগতভাবেই নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের রয়েছে দুর্বার আকর্ষণ। তারা হয়তো ভাবল, 'এত পরমানন্দের সবখানে যাওয়ার, সবকিছু ছোঁয়ার, সবকিছু করার অনুমতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়েছেন, তাহলে কেবল ওই

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ২০

গাছটার নিকটেই-বা কেন যেতে বারণ করলেন? কী এমন আছে ঐ গাছটায়?'

বুদ্ধিতে শয়তান মানুষের চেয়ে আরও কয়েক কাঠি সরেস। সে আরও বলল, 'আমি কিন্তু তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। তোমাদের ভালো চাই বলেই কিন্তু কথাগুলো বললাম।'[১] শয়তান যার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে যায়, তার কি আর নতুন করে শত্রুর দরকার পড়ে? আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহাস সালামেরও নতুন শত্রুর দরকার পড়েনি। শয়তানের এহেন প্ররোচনায় প্রতারিত হয়ে তারা দুজনে শেষ পর্যন্ত ওই গাছের ফল খেয়ে বসেন এবং জান্নাত থেকেই বিচ্যুত হন।

শয়তানের প্ররোচনার ব্যাপারটা খেয়াল করুন। সে কিন্তু খুব সাদাসিধে, স্পষ্টভাষী, এবং হিতাকাঙ্ক্ষী সেজেই আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহাস সালামের কাছে এসেছিল, এবং তাদের সাইকোলোজি বুঝেই তাদের জন্য টোপ ফেলেছিল। একটা নিষিদ্ধ জিনিসকে আকর্ষণের বস্তু বানিয়ে সেটার সাথে এমন দুটো জিনিসকে সে জুড়িয়ে দিয়েছে যা ক্ষণিকের জন্য আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহাস সালামের মনে জায়গা করে নিয়েছিল। ফেরেশতা হয়ে যাওয়া কিংবা চিরঅমর হয়ে থাকা। মুহূর্তেই এই দুটোর জন্য প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে তাদের মন। ফলে, তারা তাদের কৃত ওয়াদা ভুলে যান এবং ওই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে বসেন।

বাস্তব জীবনে শয়তানের চালগুলো এমনই। সে মানুষকে এভাবেই বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট করে থাকে। আপনার শত্রু বেশে শয়তান আপনার সামনে হাজির হবে না কখনোই। আপনার চিরহিতৈষী, চিরশুভাকাঙ্ক্ষী সেজেই সে আপনার সামনে উপস্থিত হবে। প্রথমেই সে আপনার মন বুঝে নেবে। আপনি কোন জিনিসের প্রতি আসক্ত, আকর্ষিত সেটা জেনে নিয়ে, সেই মোতাবেক শয়তান আপনার জন্য টোপ ফেলবে। আপনার মনে শয়তান এই ধারণার উদয় করিয়ে দেবে যে, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।' আপনাকে সে বোঝাবে, 'দেখ বাপু! হতে পারে দুর্গাপূজা হিন্দুদের উৎসব। সেই উৎসবে গেলে তুমিও যে হিন্দু হয়ে যাবে, এমনটি কিন্তু কোথাও লেখা নেই। তুমি সেখানে গেলেই যে তোমার মুসলমানিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়বে, তাও না। এটাকে তুমি হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব হিশেবে না দেখে কেবল একটা সাধারণ উৎসব হিশেবেই দেখো। তোমার বাড়ির পাশের একটা উৎসবই মনে করো। মনে করো সেখানে একটা মেলা হচ্ছে। তোমার সাদা মনে তো আর কোনো কাদা নেই, তাই না? ওই

[১] সুরা আরাফ, আয়াত : ২১

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

দেবীকে তো তুমি পূজোও করছ না, তার পায়ে মাথাও ঠেকাচ্ছ না। কেবল একটু চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যেই যাচ্ছ। আরও কতজনই তো যায়। এতে কি তাদের জাত যাচ্ছে, না ধর্ম লোপ পাচ্ছে?'

অথবা শয়তান আপনাকে ওয়াসওয়াসা দিতে পারে এই বলে যে, 'পহেলা বৈশাখে মঙ্গাল শোভাযাত্রায় বাঘ-ভাল্লুক আর প্যাঁচার প্রতিমূর্তি মাথায় নিয়ে মিছিল করার মধ্যে খারাপ কিছু নেই; বরং এগুলো তোমাকে দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শেখাবে। তোমার মতন কত মুসলিমই তো এসব উৎসবে যায়, তাদের কি ধর্ম চলে গেছে?'

নতুবা শয়তান আপনাকে বলবে, 'একজন পরনারীর সাথে বসে দু-দণ্ড গল্প করলে, একটু সুখ-দুখের কথা বললে, দুজনে কোথাও ঘুরতে গেলে, হাত ধরে পার্কে হাঁটলে পাপ হয় না। তুমি তো আর তার সাথে অনৈতিক কাজে জড়াচ্ছ না। তোমার মনে তো এ রকম কোনো অসৎ অভিপ্রায় নেই। তুমি তো তাকে কেবল বন্ধুই ভাবো। ছোটবোনের মতোই দ্যাখো। তাহলে, তার সাথে এহেন সম্পর্ক রাখতে দোষ কী?'

শয়তানের টোপগুলো এমনই। আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে, আপনাকে আপাত 'ভালো বুদ্ধি' দিয়ে সে আপনাকে দুর্গাপূজোয় নিয়ে ছাড়বে। পহেলা বৈশাখের বাঘ-ভাল্লুক আর প্যাঁচার মূর্তি মাথায় পরিয়ে আপনাকে দিয়ে মঙ্গাল শোভাযাত্রা করাবে। আপনাকে সে পরনারীর কাছাকাছি, পাশাপাশি নিয়ে যাবে আপনার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা বুঝে। এভাবেই শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করে যার ওয়াদা সে আল্লাহর সাথে করেছিল—'এবং আমি অবশ্যই তাদের পথভ্রষ্ট করব।'

শয়তানের কৃত দ্বিতীয় ওয়াদা হলো—

وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ

আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে কামনা-বাসনা বাড়িয়ে দেবো।[1]

খুবই ভয়ংকর একটা ওয়াদা। শয়তান বলছে সে মানুষের মধ্যে কামনা-বাসনা বাড়িয়ে দেবে। যদি আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের দিকে তাকাই, তাহলে

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১১৯

আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করব যে, দৈনন্দিন জীবনে কোনো-না-কোনোভাবে শয়তান আমাদের মধ্যে দুনিয়াবি কামনা-বাসনা বাড়িয়ে দিয়ে তার ওয়াদা পূর্ণ করে বসে আছে। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় আমরা এতটাই বিভোর আর প্ররোচিত যে, তার চক্রান্তগুলোকে বুঝে ওঠার জন্য যথেষ্ট সংবিৎটুকু হারিয়ে বসে আছি।

আমি এমন অনেককেই চিনি যারা দরকারে ঘুস দিয়ে হলেও চাকরি করতে প্রস্তুত। লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুস দিতে হবে জেনেও সেই চাকরির জন্য তারা হা-হুতাশ করতে থাকে। এই যে, ঘুস দেওয়া-নেওয়ার নামে একপক্ষ প্রতারণা করে আর অন্যপক্ষ প্রতারণার আশ্রয় নেয়, কেন তারা এমনটা করে? জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, এ রকম চাকরি মানেই জীবনের একটা পরম নিশ্চয়তা। একজীবনে যে সুখ দরকার, তার সবটাই দিতে পারে এমন চাকরি। অবৈধ পন্থায় জীবিকা নির্বাহের এই যে মোহ, এই যে বাসনা, দুনিয়ার জীবনে কেবল একটু আরাম আয়েশের জন্য এই যে প্রবঞ্চনা—এটাই হলো শয়তানের চাল। সে বুঝিয়েছে, এই জীবনে ভালো থাকতে হলে ভালো চাকরি দরকার। সেই চাকরির জন্য যদি ঘুস দিতে হয়, তাতে কোনো সমস্যা নেই। জীবনে বড়লোক আর টাকাওয়ালা হওয়াটাই মুখ্য। কীভাবে আর কোন উপায়ে হতে হবে সেটা নিতান্তই গৌণ।

মানুষ যখন শয়তানের ফাঁদে পড়ে আল্লাহকে ভুলে যায়, তখন তার কাছে দুনিয়াটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। পরকালের জীবনের কথা তার হৃদয়ের মানসপট থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেই স্থান দখল করে নেয় দুনিয়ার চাকচিক্য। সেখানে ভালোমন্দ বিচারের বদলে আরাম-আয়েশ হয়ে ওঠে প্রধান বিবেচনার বিষয়। এভাবেই শয়তান তার কৃত ওয়াদা পূরণে বিজয়ী হয়।

আমাদের জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ক্যারিয়ার ভাবনাকে সামনে নিয়ে ভাবতে বসলেই বোঝা যাবে যে, আমাদের জীবনের প্রতিটা কর্মই দুনিয়ামুখী। আমরা এমনভাবে বাঁচি যেন মৃত্যু কখনোই আমাদের স্পর্শ করবে না। আমাদের সন্তানদের আমরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানানোর স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখি তাদের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, একটি সুন্দর আগামীর। সেই সুন্দর আগামীর রূপরেখাটা কেমন? তারা অনেক বড় হবে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। উঁচু দালান আর আলিশান বাসায় থাকবে। এমন স্বপ্নের হাত ধরে, আমাদের সন্তানদের আমরা দুনিয়ার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করি ঠিকই, কিন্তু আমরা টেরই পাই না যে, দুনিয়ার অভিলাষ পূরণ করতে গিয়ে তাদের আমরা আখিরাতের জীবন থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছি।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

শহুরে জীবনের যে মা তার সন্তানকে ভোরবেলায় ঘুম থেকে তুলে হারমোনিয়াম-সমেত গান শিখতে বসায়, যে বাবা সন্তানকে স্পোর্টস স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়—তারা কি কখনো ভাবে যে, এই ক্ষণিকের দুনিয়ার পরে তাদের সামনে পড়ে রয়েছে এক অনন্তকালের জীবন? তারা কি কখনো উপলব্ধি করতে পারেন, এই সন্তানের জন্য একদিন আল্লাহর কাঠগড়ায় তাদের দাঁড়াতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে? সম্ভবত পারেন না। পারেন না কারণ, শয়তান দুনিয়ার এক রঙিন চশমা তাদের চক্ষুযুগলে পরিয়ে দিয়েছে। সেই রঙিন চশমায় দুনিয়াটা বড্ড উপভোগের। সেই উপভোগের দুনিয়ায় হৃদয় থেকে আখিরাতের ভাবনা বিস্মৃত করে দিয়ে শয়তান তাতে দুনিয়ার কামনা-বাসনা প্রতিস্থাপন করে রাখে। এভাবেই জিতে যায় শয়তান। হেরে যায় মানুষ। হেরে যাই আমরা।

শয়তানের তৃতীয় ওয়াদা ছিল—

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ

এবং আমি তাদের নির্দেশ দেবো, ফলে তারা জন্তু-জানোয়ারদের কান ছেদন করবে।[1]

এই আয়াতটির ব্যাপারে তাফসিরগুলোতে বেশ সুন্দর ব্যাখ্যা এসেছে। তাফসিরে বলা হয়েছে, প্রাক-ইসলামি যুগে প্যাগানদের মধ্যে একটি ভারি অদ্ভুত সংস্কৃতি চালু ছিল। প্যাগানরা জন্তু-জানোয়ারদের ধরে, তাদের কান কেটে, বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে সেগুলোকে বেঢপ বানিয়ে ফেলত এবং পরে সেগুলোর পূজো করত। সেগুলোকে স্রষ্টার দূত, বিভিন্ন দেবদেবীর দূত বলে প্রচার করত। মূলত, ধর্মের বিকৃতিসাধন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। শয়তান এমন ব্যাপারকেই উদ্দেশ্য করে বলছে, সে মানুষকে দিয়ে ধর্মের বিকৃতি ঘটিয়ে ছাড়বে।

আজ কি আমরা ধর্মকে বিকৃত করছি না? 'সেক্যুলারিজম'-এর নামে আমরা কি বলছি না, 'ধর্ম যার যার, উৎসব সবার?' অসাম্প্রদায়িকতার নাম ভাঙিয়ে আমরা কি অমুসলিমদের পূজোপার্বণে যোগ দিচ্ছি না, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট করে আমাদের জন্য হারাম করেছেন? পহেলা বৈশাখে

[1] সুরা নিসা, আয়াত : ১১৯

মঙ্গল শোভাযাত্রার মতন ব্যাপারগুলোকে 'ধর্মের সাথে অসাংঘর্ষিক' ভাবছি। নিজেদের যা ভালো লাগছে, নিজেদের খেয়ালখুশিকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে দিনশেষে আমরাই আবার ফাতওয়া তালাশ করছি, 'অমুক জিনিস করা যাবে না, তা কুরআনের কোথায় বলা আছে?'

শুধু কি তা-ই? নতুন নতুন বিদআত চালু করেও ধর্মকে আমরা বিকৃত করে চলছি রোজ। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য নির্ধারণ করেননি, এমনসব কাজ আমরা করি যা প্রকারান্তরে ধর্মকে বিকৃত করা।

শয়তান তার চতুর্থ এবং শেষ ওয়াদায় বলেছে—

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

এবং আমি অবশ্যই তাদের নির্দেশ দেবো, ফলে তারা সৃষ্টির বিকৃতিসাধন ঘটাবে।[1]

শয়তানের এই ওয়াদার বাস্তবায়ন আজ আমরা অহরহ দেখতে পাই আমাদের সমাজে। বেশ কিছুদিন আগে, কোনো এক দরকারে টিএসসি গিয়েছিলাম। ফেরার পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি অতিক্রম করার সময় আমি লম্বা চুল এবং সেই চুলে ঝুঁটি বাঁধা একজনকে দেখতে পেলাম। পরনে জিন্স আর টি-শার্ট। ঢাকা শহরের আল্ট্রামডার্ন আধুনিক মেয়েরা এ ধরনের পোশাক পরে বিধায় আমি তাকে সে রকম কোনো এক মেয়ে ভেবেছিলাম। পরে দেখা গেল, ওটা আসলে কোনো মেয়ে ছিল না। দাড়ি-গোঁফওয়ালা একজন পুরুষ!

নারীর মতো বেশভূষা ধরা শুরু করেছে আমাদের পুরুষেরা। শুধু তা-ই নয়, পশ্চিমা বিশ্বে এখন খুব হট্টোগোলের একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে 'ট্রান্সজেন্ডার' কাহিনি। ছেলেদের যদি নারী হতে মন চায়, তাহলে তারা সার্জারী করে নারী হয়ে যাচ্ছে। নারীদের যদি পুরুষ হতে মন চায়, তাহলে তারাও একই কায়দায় পুরুষ বনে যাচ্ছে। আল্লাহর সৃষ্টির সাথে কত জঘন্য এই মশকরা, ভাবতে পারেন?

[1] সুরা নিসা, আয়াত : ১১৯

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

নারীরা চুল ছেঁটে ছোট করে ফেলছে, পুরুষরা মাথার চুল নারীর মতন লম্বা করছে। নারীরা শার্ট-প্যান্ট গায়ে তুলছে, পুরুষ হাতে-কানে তুলছে বালা আর দুল। মেয়েরা ভ্রু প্লাগ-সহ নানানভাবে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটিয়ে চলছে হরহামেশাই।

শয়তান তার মিশনে সর্বৈব বিজয়ী। আমাদের দাবার গুটি বানিয়ে সে নিজের কৃত ওয়াদা পূরণে বদ্ধপরিকর। সে নিজে তো ধ্বংসপ্রাপ্ত আর অভিশপ্ত, তবে সে একা ধ্বংস হতে চায় না, একাই অভিশপ্ত থাকতে চায় না। সে চায় আল্লাহর বান্দাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে তাদেরও অভিশপ্ত আর ধ্বংসপ্রাপ্ত করে ছাড়তে। তাই আল্লাহ বলেছেন—

وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে শয়তানকে বন্ধু হিশেবে গ্রহণ করে, সে স্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত।[১]

শয়তান আমাদের শত্রু, প্রকাশ্য শত্রু। সে আমাদের সাথে এক মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ। আর যুদ্ধ মানেই হলো শত্রু-শত্রু খেলা। সেই খেলায় আমাদের জিততে হবে। হারাতে হবে শত্রুকে। পর্যুদস্ত করতে হবে শয়তানের সমস্ত চক্রান্ত। আমাদের বাঁচানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শত্রুর পরিকল্পনা আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন। বলে দিয়েছেন কোন কোন উপায়ে, কোন কোন কৌশলে, কোন কোন রঙে, ঢঙে শত্রু আমাদের সামনে আসতে পারে। এবার আমাদের পালা! শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে আমাদের হতে হবে সংকল্পবদ্ধ। সর্বোতভাবে পরাজিত করতে হবে তাকে। নয়তো আমরা হারিয়ে যাব, এক নিকষকালো অন্ধকারের মাঝে।

[১] সুরা নিসা, আয়াত : ১১৯

মেঘের ওপার বাড়ি

[ক]

নাগরিক জীবনের ব্যস্ততাকে ফাঁকি দিয়ে একান্ত এক টুকরো অবসরে যাওয়া দেহ আর মনের জন্যে খুব দরকারি হয়ে উঠেছিল। কোলাহলময় ঢাকার দেয়াল ভেদ করে একটু নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশ, নির্মল হাওয়া আর সবুজ প্রকৃতির কোলে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল খুব করে। কত দিন হয় অরণ্যে হারাই না। শিশিরে ভিজাই না পা। ফড়িংয়ের পেছনে ছুটতে ছুটতে ঠিকানা হারাই না অনেক দিন। দুরন্ত কৈশোরের আবছা স্মৃতিগুলো মনে পড়লেই কেমন যেন স্মৃতিকাতুরে হয়ে পড়ি। আমাদের ঘুড়ি উৎসব, লাটিম আর কানামাছি খেলার দিনগুলো সময়ের সাথে সাথে কোথায় যেন হারিয়ে গেল!

গাজীপুর সাফারী পার্কে যাওয়ার জন্য মনস্থির করা হলো। সেখান থেকে হুমায়ূন আহমেদের স্মৃতিবিজড়িত নুহাশপল্লী। আমরা চার বন্ধু মিলে রওনা করলাম। নাগরিক কোলাহলকে পেছনে রেখে এক টুকরো অবসর পানে ছুটে চলল আমাদের দেহগুলো। পেছনে রেখে যাচ্ছি একঝাঁপি ব্যস্ততা, ছুটোছুটি, নিরানন্দ, নিষ্প্রাণ সময়। আজ আমাদের ছুটি।

দিনের বেশিরভাগ সময়ই কেটে গেল সাফারী পার্কের হাতি, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, ময়ূর, কুমির, মাছ, প্রজাপতি আর ধনেশ পাখির সাথে। আসরের আগে আগে সাতপাঁচ না ভেবে একটা সিএনজিতে চেপে সোজা পার্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসি।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

চলে এলাম নুহাশপল্লীতে। নুহাশপল্লীর গেইটের কোণায় থাকা ছোট্ট মসজিদটায় ঢুকে আসরের জামাআতে দাঁড়িয়ে গেলাম। সালাত শেষ করে সবার আগে দেখতে গেলাম হুমায়ূন আহমেদের কবর।

শ্বেত পাথরে আচ্ছাদিত কবরটাতে শুয়ে আছেন বাংলা সাহিত্যের একজন কিংবদন্তি। নুহাশপল্লীর লিচু তলাতেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। তিনটে বিশাল আকৃতির লিচু গাছ তার কবরটাকে ঘিরে আছে। এই লিচুতলা ছিল হুমায়ূন আহমেদের প্রিয় জায়গাগুলোর একটি। তার কিছু কিছু রচনায় সেটার উল্লেখ পাওয়া যায়।

কবরটার দিকে অপলক তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। একটা মানুষ। যশ-খ্যাতি ছিল, নাম-ডাক ছিল। বাংলা সাহিত্যে তার সমান জনপ্রিয়তা খুব কম লেখকই পেয়েছে। বইমেলায় তার বই কেনার জন্যে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ত। একজন মানুষের একজীবনে যা যা পাওয়ার থাকে, সম্ভবত তার সবটাই হুমায়ূন আহমেদ পেয়েছিলেন। অথচ জীবনের কী নির্মম বাস্তবতা! নিজ হাতে গড়া নুহাশপল্লী, আকাশসমান যশ-খ্যাতি-কীর্তি রেখে তাকে চলে যেতে হলো। পাকা ইমারত, দৃষ্টিনন্দন সৃষ্টি—সবকিছু ছেড়েছুড়ে মাটির বিছানাকে সঙ্গী করতে হলো। মিশে যেতে হলো মাটির সাথে। মাটির সাথে মানুষের সে কী এক গভীর মিতালি!

আজও নুহাশপল্লীতে জোছনা নামে। আজও নুহাশপল্লীর ঘাস শিশিরে ভিজে ওঠে। আজও 'বৃষ্টিবিলাস' থেকে শোনা যায় বৃষ্টির রিমঝিম রিমঝিম শব্দ। কিন্তু, এই জোছনা, এই শিশির, শান-বাঁধানো পুকুর ঘাট, ঝুম বৃষ্টির আওয়াজ—সবকিছু থাকলেও হুমায়ূন নেই। হুমায়ূন এখন অন্য জগতের বাসিন্দা। জগতের সকল খ্যাত-অখ্যাতর জন্যে এটাই ধ্রুব সত্য যে, পৃথিবীতে আগমন আর বিদায়ের পদ্ধতি সবার জন্যে একই রকম।

হুমায়ূন আহমেদের কবর দর্শন শেষে চলে এলাম তার বৃষ্টিবিলাসে। টিনের চালা দেওয়া এই বাড়িটিতে বসে তিনি বৃষ্টি উপভোগ করতেন। ইট-পাথরের আবরণ ভেদ করে বৃষ্টির শব্দ ভেতরে ঢুকতে পারে না। তাই এই ব্যবস্থা। জায়গায় জায়গায় চা-কফি পানের জন্যে তৈরি করা গোল টেবিল, দোল খাওয়ার দোলনা, বাহারি গাছ, গাছের মগডালে চৌচালা গাছঘর দেখে অনুমান করা যায় মানুষ হিশেবে কতটা শৌখিন ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। চারদিক ঘুরে যখন লীলাবতী দিঘির পাড়ে আসি, তখন সূর্যটা ডুবে গেছে। চারদিক থেকে জেঁকে আসতে শুরু করেছে অন্ধকার। শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধানো এই দিঘির ঘাটের অযত্ন আর অবহেলার ছাপ থেকেই হুমায়ূন

আহমেদের অনুপস্থিতি টের পাওয়া যায়। দিঘির মাঝখানে দ্বীপের মতো একটা জায়গা। পাড় থেকে সাঁকো পার হয়ে যেতে হয় ওখানে। আমরা সেখানে গেলাম। সেই কৃত্রিম ছোট্ট টিপিটার ঘাসে বসে পড়লাম আনমনে। সবাই চুপচাপ। চারদিকে এক গা ছমছমে নীরবতা। ভাব আর ভাবনার জন্যে এ রকম নীরবতা খুব উপকারী।

দিঘির অপর প্রান্তে আরও দুটি দোলনা। সম্ভবত বাচ্চাদের জন্যেই বানানো। ওদিকে যাওয়ার জন্যে উঠে পড়লাম। তার আগে একনজর ঢু মারলাম 'ভূতের বাড়িতে'। ঢু মারতেই ভূত দেখে আমরা সবাই খুব চমকে উঠলাম। উঁহুঁ, ওটা আসলে ভূত ছিল না। একজন কেয়ারটেকার। অন্ধকার ঘরে ঘাপটি মেরে ছিল। আমাদের দেখে সহাস্যে বলল, 'কী খুঁজছেন?'

'কিছু না। আসলে, এটা নাকি ভূতের বাড়ি, তাই একটু কৌতূহল থেকে ঢু মারলাম। আচ্ছা, এখানে কি আসলেই ভূত আছে?'

লোকটা বেশ ত্বরিত উত্তর দিল। বলল, 'নাহ। এটা আসলে আমাদের স্যারের কল্পনা ছিল।'

'ওহ, আচ্ছা।'

এই ভূতের বাড়িতে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় কি না জানতে চাইলে তিনি বললেন, একবার নাকি পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নুহাশপল্লীতে বেড়াতে এসে এই ভূতের বাড়িতেই রাত্রিযাপন করেছিলেন।

[খ]

হুমায়ূন আহমেদের কবরের ওপরে শ্বেত পাথরে কিছু কথা লেখা ছিল। কথাগুলো তার 'কাঠপেন্সিল' বই থেকে নেওয়া।

'কল্পনায় দেখেছি নুহাশপল্লীর সবুজের মধ্যে ধবধবে শ্বেত পাথরের কবর। তার গায়ে লেখা—চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে।'

সত্যি সত্যিই হুমায়ূন আহমেদ নুহাশপল্লীর সবুজ প্রকৃতির মাঝে, শ্বেত পাথরে আচ্ছাদিত কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত হতে পেরেছেন। দুনিয়ার অনেক সাধ-আহ্লাদের মধ্যে তার শেষ আহ্লাদটাও পূরণ হয়েছে। একটি আয়াতে পড়েছিলাম সম্ভবত,

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

দুনিয়ার জীবনে কেউ যদি কোনো জিনিস চায়, কখনো কখনো তাকে সেই জিনিস কানায় কানায় পূর্ণ করে দেওয়া হয়।[১] হুমায়ূন আহমেদও সম্ভবত সেই পূর্ণতা পাওয়া লোকদের একজন।

[গ]

নুহাশপল্লীতে গিয়ে আমার দুটো উপলব্ধি হয়েছে। প্রথমত, হুমায়ুন আহমেদের কবরটা আমাকে খুব ভাবিয়েছে। একসময়ের তুমুল জনপ্রিয় একজন লেখক এখন মাটির সাথে মিশে আছেন—এই ধ্রুব সত্যটা বারবার আমাকে আমার শেষ পরিণতির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। নাম, যশ, খ্যাতি কোনো কিছুই আমাদের মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে না। মৃত্যুই আমাদের জীবনের নির্মম নিয়তি। 'জন্মিলে মরিতে হবে'—এটাই জগতের সবচেয়ে কঠিন সত্য। কবরের পাশে দাঁড়ালে অন্তর নরম হয়। আখিরাতের কথা মনে পড়ে। নিজের শেষ গন্তব্যস্থলের ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে মন। এজন্যেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কবরস্থান জিয়ারত করতে বলেছেন।[২]

নুহাশপল্লীর দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা আমাকে খুব বিস্মিত করেছে তা হলো—দুনিয়ার জীবনকে আপন আর উপভোগ করার জন্য হুমায়ুন আহমেদের ঐকান্তিক চেষ্টা-তদবির। ছোট্ট আয়তনের নুহাশপল্লীকে তিনি বানাতে চেয়েছিলেন এক টুকরো স্বর্গ। সেই স্বর্গে কৃত্রিম হ্রদ আছে, দিঘি আছে। মানুষের বানানো ঝরনা, কৃত্রিম অরণ্য-সহ জীবন উপভোগের নানান উপাদান তাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেই উপাদানগুলোতে তিনি সুখ খুঁজতে চেয়েছেন। বসন্তে কোকিলের গান, শরতের উড়ু উড়ু মেঘ, পৌষের হাড়কাঁপানো শীত এবং পূর্ণিমার অপরূপ জোছনা—সবকিছু নিয়েই তিনি বাঁচতে চেয়েছিলেন।

সাধারণ যে-কেউ প্রথম দেখাতেই তার এই ইচ্ছেটার প্রেমে পড়ে যাবে। মনে হবে, ইশ! আমার যদি হুমায়ূন আহমেদের মতো অনেক অনেক টাকা হতো, আমিও দূরে কোথাও, নির্জন অরণ্যের পাশে গিয়ে এ রকম একটা নুহাশপল্লী বানাতাম। সেখানে থাকত কেবল সুখ আর সুখ! সেখানে একটা 'দিঘি লীলাবতী' হবে, একটা

[১] এটি একটি আয়াতের অংশবিশেষ। আয়াতটি হলো—
مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ
যারা দুনিয়ার জীবন ও চাকচিক্য চায়, আমি দুনিয়াতেই তাদের কৃতকর্ম পরিপূর্ণভাবে দিয়ে দিই, কোনো কমতি করা হয় না। [সুরা হুদ, আয়াত : ১৫]

[২] সুনানু আবি দাউদ : ৩২৩৭, হাদিসটি গ্রহণযোগ্য

'বৃষ্টিবিলাস' আর একটা 'ভূতের বাড়ি' হবে। পূর্ণিমার জোছনাতে থৈ থৈ করবে সেই নুহাশপল্লীর মাঠঘাট। বর্ষার ঝুম বৃষ্টিতে ভেজা কাকের মতন হয়ে উঠবে চারপাশ।

এ রকম একটা নুহাশপল্লী বানাতে হলে কী পরিমাণ টাকা লাগবে? নিশ্চয় অনেক অনেক টাকা, তাই না? আচ্ছা, যদি আপনাকে বলা হয় একদিন আপনি সত্যি সত্যিই নুহাশপল্লীর চেয়েও হাজার কোটি গুণ সুন্দর, অপরূপ, অকল্পনীয়, অভাবনীয় প্রাসাদের মালিক হবেন, বিশ্বাস করবেন? ইট আর পাথর দিয়ে নয়, সেই প্রাসাদ হবে মণি-মুক্তোর তৈরি। দৃষ্টিসীমা যতদূর বিস্তৃত হবে, ততদূর আলোকিত হয়ে পড়বে সেই মণি-মুক্তোর ঝলকানিতে। প্রাসাদের নিচে থাকবে ঝরনা। সেই ঝরনার কলকল ধ্বনি আপনি শুনতে পাবেন। সামনে থাকবে অনিন্দ্য সুন্দর ফুলের বাগান। সেই ফুলগুলো এর আগে আপনি আর কখনো দেখেননি। ফুলের গন্ধে ম-ম করবে আপনার চারিপাশ। আপনি চাইলেই সেখানে জোছনা নামবে। বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দেবে আপনাকে। চাইলেই কোকিলের গান, নদীর কলতান আর অরণ্যের সবুজ—সবকিছুই আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে। অনন্তকালের জন্য আপনি হয়ে যাবেন এই অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদের মালিক। সেই প্রাসাদের সামনে দুনিয়ার নুহাশপল্লীকে তখন আপনার নস্যি মনে হবে। চাকচিক্যে ঘেরা সেই প্রাসাদ দেখে আপনি এতই বিমোহিত, চমৎকৃত আর বিস্ময়াভিভূত হবেন যে, দুনিয়ার নুহাশপল্লীর কথা আপনার মনেই থাকবে না।

আপনি এতক্ষণে বুঝে গেছেন আমি কীসের কথা বলছি। পরম আরাধ্য জান্নাত। প্রত্যেক মুমিন মুসলিমের অন্তরে লালিত স্বপ্ন। এ রকম একটি অনিন্দ্য সুন্দর প্রাসাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া আলাইহাস সালাম। তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করে বলেছিলেন—

رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

হে আমার প্রতিপালক, জান্নাতে আপনার সন্নিকটে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন।[১]

[১] সুরা তাহরিম, আয়াত : ১১

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

কত অপূর্ব সুন্দর এই দুআ! এই দুআতে তিনি বলেননি, ‘হে আমার মালিক! ফিরাউনের প্রাসাদে এটা-ওটা আছে, জান্নাতেও আমার জন্য সেগুলোর ব্যবস্থা করে দিন। ফিরাউনের প্রাসাদ দামি পাথর দিয়ে বানানো। জান্নাতেও এই পাথর দিয়ে তৈরি একটি প্রাসাদ আমি চাই।’ তিনি সে রকম কিছুই চাননি। তিনি কেবল আল্লাহর কাছাকাছি থাকতে চেয়েছেন। তাই তো বলেছেন, ‘মালিক! আপনার সন্নিকটে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন।’ আল্লাহর কাছাকাছি থাকতে পারার সৌভাগ্যের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। কিচ্ছু না।

জান্নাতে বাড়ি বানাতে হলে কিন্তু লাখ লাখ টাকার দরকার নেই। দৌড়ঝাঁপ দিয়ে জোগাড় করা রাজউকের সার্টিফিকেটও আপনার লাগবে না। এই বাড়ি নির্মাণের জন্য আপনাকে নিতে হবে না মিথ্যার আশ্রয়। অন্যের হক নষ্ট করে, অন্যকে ধোঁকা দিয়ে নিজের ইমারত তৈরির যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদের চারপাশে, আপনাকে সেই প্রতিযোগিতাতেও নামতে হবে না। কেবল দরকার একটুখানি চেষ্টা। একটু সদিচ্ছা আর একটু আন্তরিকতা। জান্নাতে বাড়ি নির্মাণের কৌশল তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। সেই কৌশল অবলম্বন করে আমরা চাইলেই অনায়েশে জান্নাতের অনিন্দ্য সুন্দর প্রাসাদের মালিক হতে পারি।

আমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়েছে। ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব এবং ইশা। এই ওয়াক্তগুলোতে ফরয সালাতের বাইরে সাধারণত আমরা আরও কিছু সালাত পড়ে থাকি। সেগুলোকে বলা হয় সুন্নাত এবং নফল সালাত। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১২ রাকআত সুন্নাত আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন। সেই ১২ রাকআত সুন্নাতগুলো হলো—ফজর সালাতের পূর্বে দুই রাকআত, যোহরের আগে চার রাকআত এবং পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পরে দুই রাকআত এবং ইশার পরে দুই রাকআত। আমরা যদি নিয়মিত এবং যত্নের সাথে এই সালাতগুলো আদায় করি, তাহলে জান্নাতে একটি বাড়ি পাওয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কত সহজ, তাই না? লাখ লাখ টাকা লাগছে কি? লাগছে কোনো পরিশ্রম কিংবা নিতে হচ্ছে কোনো অসততার আশ্রয়?

ফরয সালাতের বাইরের এই ১২ রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করে জান্নাতে মনোরম একটি বাড়ি নিশ্চিত করার এই প্রতিযোগিতা আমাদের সালাফে-সালিহিনের মাঝে খুব দৃঢ়ভাবে প্রচলিত ছিল। এই ১২ রাকআত আদায় করলে জান্নাতে যে

একটি বাড়ি পাওয়া যাবে, এই হাদিস নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে সর্বপ্রথম শুনেন উম্মু হাবিবা রাযিয়াল্লাহু আনহা। এরপর, তিনি বলেন, ‘যেদিন নবিজির মুখ থেকে আমি এই হাদিস শুনেছি, সেদিন থেকে জীবনে আর একটিবারের জন্যও আমি এই ১২ রাকআত সালাত ছেড়ে দিইনি।’

এই হাদিস উম্মু হাবিবা রাযিয়াল্লাহু আনহার কাছ থেকে শুনেছেন তার ভাই আনবাসা রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বলেন, ‘যেদিন উম্মু হাবিবার মুখ থেকে এই হাদিস আমি শুনেছি, সেদিন থেকে জীবনে আর কখনোই আমি এই ১২ রাকআত সালাত ছেড়ে দিইনি।’

আনবাসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে এই হাদিস শুনেছিলেন আমর ইবনু আউস রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন, ‘যেদিন আমি আনবাসার মুখে এই হাদিস শুনেছি, সেদিন থেকে জীবনে আর কোনোদিন আমি এই ১২ রাকআত সালাত ছেড়ে দিইনি।’

আমর ইবনু আউস রাহিমাহুল্লাহ থেকে এই হাদিস শুনেন নুমান ইবনু সালিম রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেন, ‘যেদিন আমর ইবনু আউস রাহিমাহুল্লাহর মুখ থেকে আমি এই হাদিস শুনেছি, সেদিন থেকে আর কখনোই আমি এই ১২ রাকআত সালাত ছেড়ে দিইনি।’[১]

একবার গভীরভাবে ভাবা যাক তারা কতটা নিষ্ঠাবান ছিলেন। কতটা তৎপর ছিলেন নিজেদের পুণ্যের পাল্লা ভারি করার প্রতিযোগিতায়। নবিজির মুখ থেকে উম্মু হাবিবা রাযিয়াল্লাহু আনহা এই হাদিস শোনার পর থেকে আমৃত্যু তার ওপর আমল করেছেন। তার কাছ থেকে যিনি শুনেছেন তিনিও এবং তার কাছ থেকে যিনি শুনেছেন তিনি, এভাবে পরম্পরায় যাদের পর্যন্তই এই হাদিস পৌঁছেছে, তারা সকলেই সেটাকে দৃঢ় প্রত্যয়ে, গভীর অনুরাগ এবং জান্নাতের অসীম প্রাপ্তির আশায় নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। জান্নাতে একটি বাড়ি লাভের এই সুবর্ণ সুযোগ তারা হেলায় নষ্ট করেননি। কখনো অলসতায়, ব্যস্ততার অজুহাতে কিংবা অবহেলার দরুন এই আমল থেকে তারা বিরত হোননি। আমাদের অনেকেই হয়তো এই হাদিসটি আগে অনেকবার শুনেছি, কিন্তু কখনো কি একটিবার তৎপর হয়েছি উম্মু হাবিবার মতো? কিংবা আনবাসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো? অথবা, আমর ইবনু আউস রাহিমাহুল্লাহহ আর নুমান ইবনু সালিম রাহিমাহুল্লাহর মতো? হয়তো

[১] সহিহ মুসলিম : ৭২৮

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আমরা হইনি কিংবা হতে পারিনি। তবে, দুঃখের কোনো কারণ নেই। এতোদিন হয়তো পারিনি, কিন্তু আজ তো আমরা আবার নতুন করে শুনলাম এই হাদিস। নতুন করে জানলাম এর মাহাত্ম্য। আজ থেকে কি তবে নতুন করে শুরু করা যায় না? একেবারে শুরু থেকে? টলটলে জলের, কলকল ঝরণার স্বচ্ছ, শুভ্র, সফেদ সেই অনন্ত অসীম জান্নাতে একটি বাড়ির জন্য আজ থেকে আমরা কি এই হাদিসখানাকে জীবনের সাথে জড়িয়ে নিতে পারি না?

আবার ধরুন, কোনো এক বন্ধুর সাথে কথা বলতে বলতে তর্কে জড়িয়ে পড়লেন। কথা কাটাকাটি, বাড়াবাড়ি শুরু হলো। আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, আপনি যা বলছেন বা বলতে চাইছেন তা একদম ঠিক ও নির্ভুল। অপরদিকে আপনার বন্ধু যা বলতে চাইছে বা বলছে তা সঠিক নয়। এই মুহূর্তে আপনার করণীয় কী? তর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়া? নাহ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বলেননি। এমন মুহূর্তে তিনি আপনাকে থেমে যেতে বলেছেন। তাই, থেমে যান। চুপ করে থাকুন। তর্ক বেশিদূর গড়ানোর সুযোগ দেবেন না। এতে ফিতনা ছড়ানোর ভয় থাকে এবং ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। এই যে আপনি সঠিক হওয়া সত্ত্বেও চুপ করে গেলেন, এর বিপরীতে আপনার জন্য কী পুরস্কার অপেক্ষা করছে জানেন? এর বিপরীতে জান্নাতে আপনার জন্য বরাদ্দ হয়েছে একটি অপরূপ সুন্দর বাড়ি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের প্রান্তে একটি বাড়ির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যে সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তর্কে লিপ্ত হয় না।'[১]

জান্নাতে আস্ত একটি বাড়ি লাভের কত সহজ উপায়, তাই না? কেবল নিজে সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তর্কে লিপ্ত না হলেই জান্নাতে আমরা পেয়ে যাব আস্ত একটা বাড়ি। সেই বাড়িটা হবে স্বর্ণ-রৌপ্য দিয়ে তৈরি। মণি-মুক্তো খচিত সেই বাড়িতে থাকবে না বিন্দু পরিমাণ খুঁত।

এ ছাড়াও নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি—যে ব্যক্তি দুনিয়ার বুকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কোনো মসজিদ নির্মাণ করবে, হোক সেটা চড়ুই পাখির বাসার সমান, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন।[২] আমাদের আশপাশে

এমন কত গ্রাম আছে যেখানে হয়তো একটা মসজিদ নেই। মসজিদের অভাবে কত মুসলিম জামাআত সহকারে সালাত আদায় করতে পারে না। দেশের উত্তরাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি জায়গাগুলোতে এ রকম প্রচুর গ্রাম আছে। আমরা উদ্যোগ নিয়ে এমন জায়গাগুলোতে মসজিদ নির্মাণ করতে পারি। একা যদি না পারি, তাহলে কয়েকজন মিলে করতে পারি। আমাদের উদ্দেশ্য হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি। ব্যস। বিনিময়? জান্নাতে একটি সুউচ্চ, মনোরম সুন্দর অট্টালিকা!

দুনিয়ায় একটা নুহাশপল্লী বানানোর জন্য আমাদের কত কাঠখড়ই-না পোড়াতে হয়। লাখ লাখ টাকা উপার্জন করতে হয়। সেই টাকার জন্য বিসর্জন দিতে হয় নিজেদের জীবন-যৌবন। এরপর ধীরে ধীরে যখন সেই নুহাশপল্লী তৈরি হয়, টুপ করেই আমরা মারা যাই। খুব বেশিদিন সেই নুহাশপল্লীর মাঠে শুয়ে জোছনা উপভোগ করা হয় না। কয়টা শ্রাবণ বর্ষার জলেই-বা আর গা ভেজাতে পারি আমরা? সেই দিঘি লীলাবতী, সেই বৃষ্টিবিলাস আর সেই ভূতের বাড়ি। সবকিছু পেছনে ফেলে আমাদের পাড়ি জমাতে হয় অনন্তের পথে। যে অনন্ত জীবনের পথে আমরা পা বাড়াই, সেই জীবনের জন্য মেঘের ওপারে অগ্রীম একটা বাড়ি বুকিং দিয়ে রাখতে ক্ষতি কী, বলুন?

চলুন, সালাতের মধ্যে, একান্ত মুনাজাতে রবের কাছে আসিয়া আলাইহাস সালামের মতো দুহাত তুলে ফরিয়াদ করি। বলি, 'হে আমার রব! জান্নাতে আপনার সন্নিকটে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন।'

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আমি হব সকাল বেলার পাখি

[ক]

আমাদের শৈশবের সাথে যেন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে কাজী নজরুল ইসলামের 'আমি হব সকাল বেলার পাখি' কবিতাটি। 'সূয্যি মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে' লাইনটা কত হাজার বার আওড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সূয্যি মামা জাগার আগে জেগে ওঠার সাথে যে একটা নৈসর্গিক ব্যাপার জড়িয়ে আছে, সেটা বুঝে উঠতে পেরেছি আরও অনেক পরে। সূয্যি মামা জাগার আগের সময়টুকুই তো সুবহে সাদিকের সময়। পৃথিবীর পবিত্রতম মুহূর্ত। শান্ত-সজীব, নির্জন-নিষ্কলুষ মুহূর্তই সুবহে সাদিক। কবিতায় বারবার সকাল বেলার পাখি হবার সাধের কথা বললেও আমরা ক'জন হতে পারি সুবহে সাদিকের ভ্রমর? আমাদের রাতগুলো কেটে যায় মৌজ-মাস্তিতে। আর সুবহে সাদিকে আমরা বেঘোর ঘুমে থাকি অচেতন। আমাদের চৈতন্যহীনতায় সকাল পার হয়ে দুপুর গড়ায়। আমরা না হতে পারি নজরুলের সকাল বেলার পাখি, না হয়ে উঠতে পারি সুবহে সাদিকের গুঞ্জরিত ভ্রমর।

মুসলিম হিশেবে আমাদের নিত্যদিনকার ব্যর্থতা শুরু হয় ফজর থেকে। ফজরের সালাতে শামিল হতে না পারার অর্থই হলো দিনের শুরুটা হয় শয়তানের কাছে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। 'পরাজয়' শব্দটা আমাদের কাছে অতীব অপছন্দের! আমরা পরাজিত হতে অপছন্দ করি। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হতে চাই না আমরা। জীবনের কোনো উপলক্ষ্যেই আমরা পরাজিত হতে রাজি নই। বহমান জীবনের স্রোতে কোথাও কোনো ছন্দপতন হোক—ব্যাপারটাই আমাদের কাছে অপ্রত্যাশার। কিন্তু

দিনের পর দিন আমরা যে শয়তানের কাছে পরাজিত হচ্ছি, হেরে যাচ্ছি, হেরে নাস্তানাবুদ হচ্ছি তা নিয়ে আমাদের কোনো ভাবান্তর নেই। নেই কোনো চিন্তার সময়। যেন আমরা শয়তানের কাছে পরাজিত হওয়ার জন্যই দুনিয়ায় এসেছি। অথচ শয়তান অভিশপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ—মানুষ হিশেবে আমাদের যোগ্যতাকে অস্বীকার করা, আর আমরা আশরাফুল মাখলুকাত! সৃষ্টির সেরা জীব! তথাপি জীবনের পদে পদে শয়তানের কাছে আমাদের নির্লজ্জ পরাজয় বরণ করতে হয়।

আরবিতে খুব চমৎকার একটি কথা আছে। বলা হয়, 'ফজর হলো শয়তানের বিরুদ্ধে মুমিনের প্রথম বিজয়।' সত্যিই তা-ই। ফজরের সালাতের জন্যে আরামের বিছানা ছেড়ে ওঠা আসলেই যুদ্ধজয়ের সমান। কষ্টের একটা কাজ। তবে কষ্টটা মুনাফিকদের জন্য। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুনাফিকদের জন্য ফজর এবং ইশার সালাতের চেয়ে কষ্টকর আর কিছুই নেই।'[১]

নবিজির দেওয়া মুনাফিক তকমা যার গায়ে লেগে যায়, তার আখিরাতে কেমন দৈন্যদশা হতে পারে? আখিরাতে সে কতটা দেউলিয়া হবে সেটা কি অনুমেয় নয়? শাইখ বদর বিন নাদের আল-মিশারি বলেছেন, 'আপনি যদি ফজরের সালাতের জন্য ঘুম থেকে জাগতে না পারেন, তাহলে নিজের জীবনের দিকে তাকান এবং জলদি নিজেকে সংশোধন করুন, কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফজর সালাতের জন্য কেবল তার প্রিয় বান্দাদেরকেই জাগ্রত করান। ঠিক এজন্যেই মুনাফিকদের জন্য ফজরের সালাত এত কঠিন!'

আমরা ফজরে জাগতে পারি না। কিন্তু কখনো কি একবার নিজের জীবনের দিকে তাকিয়েছি গভীরভাবে? কখনো কি ভেবেছি কেন আমি ফজরে উঠতে পারি না? কেন ফজরে মুয়াজ্জিনের সুমধুর সুর আমার কানে এসে লাগে না? আল্লাহর যে প্রিয় বান্দারা সুবহে সাদিকের প্রায়ান্ধকার ভেদ করে মসজিদের দিকে হেঁটে যায়, আমি কেন তাদের দলভুক্ত হতে পারি না? আমার কোন সে পাপ যা আমাকে হতে দেয় না ফজরের পাখি?

ফজরের সালাতের গুরুত্ব আমাদের মুমিন-জীবনে অপরিসীম। নবিজির আরেকটি হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি—তিনি বলেছেন, 'মানুষেরা যদি ফজর এবং

[১] সহিহ বুখারি : ৬৫৭; সহিহ মুস

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

ইশার সালাতের গুরুত্ব বুঝতে পারত, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ফজর আর ইশার সালাতে উপস্থিত হতো।'[১]

আচ্ছা, যদি বলা হয় যে, আপনাকে বিশ হাজার টাকা দেওয়া হবে, বিনিময়ে আপনি হামাগুড়ি দিয়ে ফজরের সালাতের জন্য মসজিদে আসবেন। আপনি কি রাজি হবেন? আমার ধারণা আপনি রাজি হবেন না। অথচ নবিজি বলছেন, যদি আমরা ফজর সালাতের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারতাম, যদি বুঝতে পারতাম যে কতটা মূল্যবান ফজরের সালাত, তাহলে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও সালাতের জন্য চলে আসতাম মসজিদে। ফজর আর ইশার সালাত কতটা গুরুত্ব বহন করলে নবিজি এমন উপমা ব্যবহার করতে পারেন, ভাবুন তো!

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন কোনো কিছু নিয়ে শপথ করেন, তখন বুঝতে হবে সেই জিনিসটা সাধারণ কোনো জিনিস নয়। আপনি কি জানেন ফজরের সময় নিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে শপথ করেছেন? এমনকি 'ফজর' নামে কুরআনে একটি পূর্ণাঙ্গ সুরা পর্যন্ত বিদ্যমান। আল্লাহ বলছেন, 'শপথ সুবহে সাদিকের।'[২] সেই সুবহে সাদিক যখন ফজরের ওয়াক্ত হয়। সেই সময়ের শপথ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা করছেন, যখন আপনি-আমি কম্বলের নিচে আরামের ঘুমে বিভোর!

অফিসের কাজের জন্য আমরা ভোরে জাগতে পারি। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার জন্য আমরা সকাল সকাল জেগে উঠতে পারি। বাস যাতে মিস না হয়, ট্রেন যাতে আমাদের রেখে চলে না যায়, সেজন্যে আমরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘুম থেকে জেগে প্রস্তুত হতে পারি। কিন্তু হায়! যে অনন্ত সময়ের পানে আমাদের যাত্রা করতে হবে, সেই যাত্রার প্রস্তুতির জন্য সুবহে সাদিকের সময়ে জেগে উঠে পনেরোটা মিনিট খরচ করতে আমাদের শরীর কুলোয় না। মন সায় দেয় না। আমরা চাকুরির প্রমোশান চাই, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল চাই, জীবনে সফল হতে চাই। কিন্তু যিনি এসব দানের মালিক, যার কাছে পৃথিবীর সমস্ত সম্মান, প্রাচুর্য আর সফলতার ভান্ডার, তাঁর কাছে চাওয়ার জন্য আমরা বিছানা ছাড়তে রাজি নই।

---

[১] *সহিহ বুখারি* : ৫৯০; *সহিহ মুসলিম* : ৪৩৭

[২] সুরা ফাজর, আয়াত : ১

ছোটবেলায় তোতাপাখির মতন পড়েছি, 'Early to bed and early to rise, makes a man healty, wealthy and wise'. এই কবিতার সাথে বহু আগে বলা নবিজির এই হাদিসের কোনো মিল পান কি না দেখুন তো। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজর সালাত পড়ল, সে আল্লাহর জিম্মায় চলে গেল।'[১] আল্লাহর জিম্মায় যাওয়া মানে বুঝতে পারছেন? আপনার ঈমান-আমল থেকে শুরু করে সবকিছুর সংরক্ষণের ভার তখন স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিয়ে নেন। যদি বলা হয় যে, আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স ফোর্সের সবচেয়ে চৌকশ বাহিনী দিয়ে আমাদের নিরাপত্তা দেওয়া হবে, ব্যাপারটা কেমন দেখাবে বলুন তো? নিশ্চয় খুব চমৎকার, তাই না? আপনি তখন নিজেকে দুনিয়ার অন্যতম সেরা সেলিব্রিটি ভাববেন। আপনাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে চৌকশ সৈন্যের দল—এটা ভাবতেই আপনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন। তাহলে একবার ভাবুন, আপনাকে যদি স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই নিরাপত্তা দেন, আপনার মাথার ওপর সমস্ত দিন যদি আল্লাহর নিরাপত্তার চাদর টানানো থাকে—কেমন হবে সেই নিরাপত্তা বেষ্টনী? সেই নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে আপনার ক্ষতি করে এমন সাধ্য আছে কারও? আল্লাহর চাইতে উত্তম নিরাপত্তা আর কে দিতে পারে, বলুন?

আচ্ছা, রামাদান মাসের পরে ঠিক কত রাত আপনি তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য ঘুম থেকে জেগেছেন? কত রাত আপনি জায়নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন? সম্ভবত আমাদের মধ্য থেকে খুব কমসংখ্যক লোককেই পাওয়া যাবে যারা রামাদানের পরে তাহাজ্জুদ আদায় করেছে। নিয়মিত না হলেও অনিয়মিত। হতে পারে আমাদের অনেক সমস্যা, অনেক কাজের চাপ, পড়াশোনার ব্যস্ততার কারণে তাহাজ্জুদ পড়া হচ্ছে না। কিন্তু আমরা জানি কি, রাতে তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য না জাগতে পারলেও এমন একটা কাজ আছে যা করতে পারলে আমরা রাতভর নফল সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের সমান সাওয়াব পেতে পারি? এক ঘণ্টা কিংবা দুই ঘণ্টা নয়। সারা রাত জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নফল সালাত আদায় করলে যে পরিমাণ সাওয়াব আপনি পাবেন, এই কাজটি করলে ঠিক একই পরিমাণ সাওয়াব আপনার আমলনামাতে যুক্ত হয়ে যাবে। তাহাজ্জুদের জন্য জাগলে আপনি হয়তো দুই রাকআত, চার কিংবা ছয় রাকআত সালাত পড়েন। সারা রাত তো আর সালাত আদায় করেন না। কিন্তু এমন একটা কাজ আছে যা করলে আপনি সারা রাত নফল

---

[১] সহিহ মুসলিম : ৬৫৭

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

সালাত আদায়ের সাওয়াব পেয়ে যাবেন। চমৎকার না ব্যাপারটা! নিশ্চয় জানতে চাইছেন কোন সে কাজ, তাই তো? তাহলে নবিজির মুখ থেকেই শুনুন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইশার সালাত জামাআতে আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত জেগে সালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের সালাত মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করল, সে যেন পুরো রাত জেগে সালাত আদায় করল।'[১][২]

খুব সহজ আমল, কিন্তু বিনিময়টা কত বিশাল দেখুন! ইশার সালাতের সময় আপনার যত ব্যস্ততাই থাকুক, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আযান হলে মসজিদ খুঁজে নিন। হাতের কাজ রেখে ওযু করে মসজিদ পানে বেরিয়ে যান। একাগ্রতার সাথে ইমামের পেছনে ইশার সালাতটা আদায় করে ফেলুন। ব্যস, ওই রাতের অর্ধেকটা যদি সালাতে কাটিয়ে দিতেন, তাহলে যে পরিমাণ সাওয়াব আপনি পেতেন, কেবল মসজিদে এসে ইশার সালাত পড়ার কারণে আপনি সে পরিমাণ সাওয়াবের মালিক হয়ে গেলেন। এরপর সুবহে সাদিকের সময় ঘুম থেকে জেগে উঠে আপনি যখন মসজিদে এসে জামাআতের সাথে ফজর সালাত আদায় করেন, তখন পুরো রাত ইবাদত তথা সালাত আদায়ের সাওয়াব আপনার আমলনামায় উঠে যায়। কী বিরাট এক সুযোগ আমাদের আমলনামা ভারী করার! কিন্তু আমরা সেই সুযোগ লুফে নিচ্ছি তো?

একটি দৃশ্য কল্পনা করা যাক এবার। আপনার সবচেয়ে প্রিয় সেলিব্রিটি কে? যারা ফুটবল পছন্দ করেন, তারা হয়তো মেসি কিংবা রোনালদোর নাম বলবেন। ক্রিকেটপ্রেমীরা বলবেন শচীন, রিকি পন্টিং, সাঙ্গাকারা কিংবা এবি ডি ভিলিয়ার্সের নাম। যাদের গান পছন্দ তারা সুরের জগতের কোনো রথী-মহারথীর নাম তুলে আনবেন। এখন আপনাকে যদি বলা হয়, যে সেলিব্রিটির কাছে পৌঁছানো আপনার কাছে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো ব্যাপার—তার সামনে রোজ দুবার করে আপনার নাম উচ্চারিত হচ্ছে, তিনি আপনার ব্যাপারে নিজ থেকে জানতে চাচ্ছেন, আপনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন, ব্যাপারটা কেমন হবে? আপনি হয়তো ভাবছেন, আরেহ! এটা তো দারুণ একটি ব্যাপার। কিন্তু এটা কি সম্ভব?

[১] কেউ যদি ইশা ও ফজরের সালাত জামাআতে আদায় করে, তবে সে সারা রাত নফল ইবাদতের সাওয়াব পাবে। পাশাপাশি সে যদি শেষরাতে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ে, তবে তা অতিরিক্ত সাওয়াব হিশেবে তার আমলনামায় যোগ হবে।

[২] সহিহ মুসলিম : ৬৫৬

সম্ভব নয়। দুনিয়ার কোনো সেলিব্রিটিই আপনাকে এতটা মূল্যায়ন কখনোই করবে না। তার সামনে আপনার নাম উচ্চারিত হওয়া তো দূরের ব্যাপার, আপনি যে দেশে থাকেন, সেই দেশের নামও হয়তো সে কোনোদিন শোনেনি। বিশ্বাস করুন। অথচ রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ তাআলা, যিনি সমস্ত কিছুর একমাত্র অধিপতি, যার শান-মান-শওকতের সামনে এই জগৎ-মহাজগতের সবকিছুই তুচ্ছাতিতুচ্ছ, সেই মহামহিম আল্লাহ তাআলা রোজ আমাদের খবর রাখেন। আমরা যখন ফজরের সালাতে দাঁড়াই, তখন একদল ফেরেশতা পৃথিবী হতে আসমানের দিকে যাত্রা করে আল্লাহর কাছে পৌঁছায়। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের কাছে জানতে চান, 'তোমরা আমার অমুক অমুক বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে?' তখন ফেরেশতারা বলে, 'রাব্বুল আলামিন! আমরা আপনার অমুক অমুক বান্দাকে সালাতরত অবস্থায় রেখে এসেছি।'[১]

চিন্তা করুন, সুবহে সাদিকের সময়ে আরামের বিছানা ছেড়ে আমরা যখন মসজিদে এসে ফজরের জামাআতে দাঁড়াই, আমাদের মর্যাদা, আমাদের কথা, আমাদের অবস্থানের বর্ণনা তখন সাত আসমান ভেদ করে আল্লাহর আরশে আযীমে পৌঁছে যায়! আমরা কি চাই না, আমাদের নাম রোজ রোজ আরশে আযীমে উচ্চারিত হোক? আমরা কি চাই না, আমাদের নাম রোজ রোজ ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে বর্ণনা করুক? দুনিয়ার সেলিব্রিটিদের কাছে পৌঁছাতে হলে আমাদের কত কসরত, কত আয়োজন, কত সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়। অথচ এই আসমান-জমিনে যিনি রাজাদের রাজা, যিনি মালিকদের মালিক, তার কাছে পৌঁছানো কতই-না সহজ! কেবল সুবহে সাদিকে উঠুন। নিজেকে পবিত্র করুন। মসজিদে আসুন। একাগ্রচিত্তে সালাতে দাঁড়িয়ে যান। ব্যস! এমন সহজতর সুযোগ আমরা যারা হেলায় মিস করি, কতই-না অভাগা আমরা!

ছোট বাচ্চারা যখন মায়েদের কাছে কিছু চায়, তখন মায়েরা বলেন, 'আগে ওটা করো, তাহলেই এনে দেবো।' ছোটরা মায়ের আদেশ পালন করে। মায়ের আদেশ পালন করা যতখানি না বড় ব্যাপার, তারচেয়ে বড় ব্যাপার হলো সেই কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি পাওয়ার লোভ। জীবনে তো কত কিছু পাওয়ার সাধ আছে আমাদের, তাই না? জান্নাত পাওয়ার সাধ কি সেই তালিকায় আছে? আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠব, হ্যাঁ, আমরা জান্নাতে যেতে চাই। নবিজি আমাদের জানাচ্ছেন, আমরা যেন দুই শান্ত

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

সময়ের সালাত আদায় করি। তাহলে আমরা সহজেই জান্নাতে যেতে পারব।[১] দুই শান্ত সময়ের সালাত কোনগুলো? সেগুলো হলো ফজর এবং আসর। এই দুই ওয়াক্তে প্রকৃতি থাকে শান্ত, সজীব, নির্মল। আমরা যদি ফজর এবং আসর সালাতে তৎপর হই, আমাদের জান্নাতে যাওয়ার পথ মসৃণ হবে। জান্নাত তো আমাদের জীবনের পরম আরাধ্য। সুমধুর কলকল ধ্বনির নহর, চিরসবুজ উদ্যান, নয়নজুড়ানো ঐশ্বর্যমণ্ডিত এমন বাগানের বাসিন্দা হওয়ার জন্য আমাদের হতে হবে সুবহে সাদিকের পাখি। যে পাখি রবের স্মরণে জেগে ওঠে। যার কণ্ঠ বেয়ে ঝরে পড়ে রবের মহিমা।

ফজর ছেড়ে দিয়ে আমরা নিজেদের জীবন থেকে দূরে ঠেলে দিই আল্লাহর বারাকাহ। একবার একলোক ইবরাহিম ইবনু আদহাম রাহিমাহুল্লাহকে বলল, 'বারাকাহ বলতে কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না।'

লোকটার কথা শুনে হাসলেন ইবরাহিম ইবনু আদহাম। বললেন, 'কুকুর এবং ভেড়া চেনো?'

'হ্যাঁ।'

'কোনটার প্রজনন ক্ষমতা কেমন?'

'একটা কুকুর সাতটা পর্যন্ত বাচ্চা দিতে পারে। অন্যদিকে, একটা ভেড়া বাচ্চা দিতে পারে বড়জোর তিনটি।'

'তোমার চারপাশে তাকালে, দুটির ভেতরে কোন প্রাণীটিকে তুমি সবচেয়ে বেশি দেখতে পাও?'

'ভেড়াই বেশি দেখি।'

'কিন্তু ভেড়া তো এমন এক প্রাণী যাকে নিয়মিত জবাই করা হয় এবং যার মাংস মানুষ খায়, তাই না?'

'জি।'

'কুকুর কি জবাই করা হয়? কুকুরের মাংস কেউ খায়?'

'না।'

'তারপরও কুকুরের চাইতে ভেড়ার সংখ্যা দুনিয়ায় বেশি।'

---

[১] সহিহ বুখারি : ৫৭৪; সহিহ মুসলিম : ৬৩৫

'এর কারণ?'

'এর কারণ হলো বারাকাহ। ভেড়া রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ে এবং ঠিক ফজরের আগে আগে তারা জেগে ওঠে। ফলে ফজরের সময়ে আল্লাহ যে বারাকাহ দুনিয়ায় পাঠান, ভেড়া সেটা লাভ করে। অন্যদিকে কুকুর সারা রাত জেগে থাকে, কিন্তু ফজরের ঠিক আগমুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়ে। ফলে ফজরে আল্লাহ যে বারাকাহ প্রদান করেন তা থেকে কুকুর বঞ্চিত হয়। এজন্যেই ভেড়া কম বাচ্চা প্রসব করা সত্ত্বেও এবং তারা জবেহযোগ্য প্রাণী হওয়ার পরেও দুনিয়ায় তাদের সংখ্যাটা অত্যধিক। অন্যদিকে বেশি বাচ্চা প্রসব এবং জবেহ-অযোগ্য প্রাণী হওয়ার পরেও দুনিয়ায় কুকুরের সংখ্যা তুলনামূলক অনেক কম। এটাই হলো বারাকাহ।'

যারা ফজরে জাগে তারা বারাকাহ লাভ করে। জীবনে, সময়ে, কাজে। আর যারা জাগতে পারে না, তারা বঞ্চিত হয় এই বারাকাহ থেকে। তাদের কাজে বারাকাহ থাকে না, সময়ে বারাকাহ থাকে না। সর্বোপরি জীবন থেকেও তাদের বারাকাহ হারিয়ে যায়। বারাকাহ যে কত বড় একটি নিআমত, তা যে লাভ করে, কেবল সে-ই উপলব্ধি করতে পারে। জীবনে বারাকাহ লাভের জন্য আমরা কি হয়ে উঠতে পারি না সকাল বেলার পাখি? সুবহে সাদিকের স্নিগ্ধ শীতল হাওয়ায় মেলে দিতে পারি না নিজেদের ডানা?

[খ]

আমরা অনেকেই ফজরের জন্য জাগতে পারি না। একজন মুমিনের জন্য এটা একটা বিশাল ব্যর্থতা। দিনের প্রথম পরাজয়। একজন মুমিন তার দিন শুরু করবে পরাজয় দিয়ে, তা-ও আবার আল্লাহদ্রোহী শয়তানের হাতে—ব্যাপারটাই তো লজ্জাজনক! এ রকম লজ্জার জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা একজন মুমিনের জন্য কখনোই শোভনীয় নয়। তাই আমাদের সবার উচিত ফজরে জাগার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এটাকে জীবনের গুরুতর একটি চ্যালেঞ্জ হিশেবে নেওয়া। ফজরে জাগার জন্য বেশ কিছু কার্যকরী উপায় আছে। সেই উপায়গুলো অবলম্বন করলে, আশা করা যায়, আমরা নিয়মিত ফজরে জাগতে পারব, ইন শা আল্লাহ।

ফজরে জাগতে হলে সর্বপ্রথম যা দরকার তা হলো নিয়ত করা। আমি যে ফজরে সত্যি সত্যিই জাগতে চাই, ফজর সালাত মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করতে চাই—এর জন্য ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক আগে নিয়ত করে ফেলা। নিয়তের ব্যাপারটি আসতে হবে একেবারে হৃদয়ের গভীর থেকে। কেবল মুখে যদি কেউ বলে,

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

'আমি ফজরে উঠব'—তাহলে সেটা সঠিক নিয়ত হবে না। নিয়ত তো মোটাদাগেই অন্তরের ব্যাপার। তাই দেখতে হবে ফজরে জাগার তাড়নাটা আমার হৃদয় থেকে উৎসারিত হচ্ছে কি না।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি, যেদিন আমি খুব তাড়াহুড়ো করে, ফজরের সালাত পড়ার ব্যাপারে কোনো রকম মনস্থির করা ব্যতীতই ঘুমিয়ে পড়ি, ঠিক সেদিনই ফজরে জাগতে প্রচুর সমস্যা অনুভব করি। নিয়ত ব্যতীত রাতে শীঘ্রই বিছানা ধরলেও ফজরে জাগতে সমস্যা হয়। আবার যেদিন আমি সঠিকভাবে ফজরের সালাত পড়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ঘুমোতে যাই, সেদিন ফজরের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই জাগতে পারি। বরং সেদিন যদি মাঝরাতে কোনোভাবে ঘুমও ভাঙে, আমি অস্থির হয়ে ঘড়ির দিকে তাকাই আর সময় দেখি। ভয় লাগে, আমার ফজরটা আবার ছুটে গেল না তো? এমনকি ফজর আদায়ের জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়ে অধিক রাত করে বিছানা ধরলেও ফজরে জাগতে কখনো সমস্যা অনুভব করি না। এই যে দুটো অবস্থায় দুটো ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি, এটা কেবল নিয়তের ফলাফল। প্রথম অবস্থায় আমার নিয়ত থাকলেও তা ছিল খুব সাদামাটা। তাতে দৃঢ় কোনো সংকল্প ছিল না। 'জাগতে পারলে পড়ব' ধরনের একটা গা ছাড়া ভাব ছিল। ফলে ওই অবস্থায় ফজর পড়তে আমাকে বেশ হিমশিম খেতে হয়েছে। আবার দ্বিতীয় অবস্থায় আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ যে, 'আমি কোনোভাবেই ফজর ছাড়ব না।' ফলে দেখা যায়, আমি ঠিক ঠিক ফজরের জন্য জাগতে পারছি কোনো সমস্যা ছাড়াই। নিয়তের আশ্চর্য ক্ষমতা এটাই।

ফজরে ঠিক সময়ে জাগার জন্য আমাদের যে অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে তা হলো রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়া। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রাত করে ঘুমিয়েও চাইলে যে-কেউ ফজরের জন্য জাগতে পারে, তবে সবসময় যে এমন হবে—তার নিশ্চয়তা নেই। খুব বেশি ঈমানি শক্তিতে বলীয়ান না হলে এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। কিন্তু ফজরে তো আমাদের নিয়মিত হতেই হবে। আর নিয়মিত হতে হলে দরকার নিয়ম করে রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়া। এটি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও সুন্নাহ। তিনি ইশার সালাতের পর অহেতুক কথা, কাজ এড়িয়ে চলতেন। ঘুমের প্রস্তুতি নিতেন এবং দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তেন।[১] কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো, আজকে আমরা নবিজির এই সুন্নাহ ভুলতে বসেছি। চমৎকার এই সুন্নাহ

থেকে আমরা আজ যোজন যোজন দূরে। প্রযুক্তির উৎকর্ষতা আজ কেড়ে নিয়েছে আমাদের চোখের ঘুম। যে রাতকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের শরীর, মন আর চোখের জন্য 'বিশ্রাম'-এর উপলক্ষ্য বানিয়েছেন, আজ সেই রাত কেটে যায় আমাদের আনন্দ-ফুর্তিতে। আরামের ঘুমে তলিয়ে যাওয়ার বদলে আমরা তলিয়ে যাই সোশ্যাল মিডিয়াগুলোর বায়বীয় জগতে। কি যুবক, কি কিশোর, কিংবা বৃদ্ধ, আমরা সকলে এখন রাতভর ফেইসবুকিং করি, ইউটিউব ব্রাউজ করি। রাতগুলো যখন শেষ হয় হয় অবস্থা, তখন আমরা কাঁথা-কম্বল মুড়িয়ে ঘুমোতে যাই। মাঝখানে ছুটে যায় আমাদের ফজরের সালাত। শুধু তা-ই নয়, রাতভর সোশ্যাল মিডিয়াতে সময় কাটানোর ফলে দিনের অর্ধেকটাই আমরা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই। এতে করে আমাদের কাজের বারাকাহ, সময়ের বারাকাহ সবকিছু কমে যায়। আমরা হারিয়ে ফেলি জীবনের ছন্দ। তাই, জীবনকে ছন্দে ফেরাতে, জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া বারাকাহ পুনরুদ্ধার করতে হলে অবশ্যই অবশ্যই রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

ইসলামে ঘুমানোর আগের বেশ কিছু আমলের কথা বলা আছে। যেমন—ঘুমাতে যাওয়ার আগে ওযু করে নেওয়া, বিতর বাদ থাকলে আদায় করে ফেলা এবং সাথে দুআ করা যেন ফজরে ঠিক সময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঘুম ভাঙিয়ে দেন। এরপর হালকা কুরআন তিলাওয়াত করা, বিশেষ করে সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত, আয়াতুল কুরসি এবং সুরা মুলক। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমোতে যাওয়ার আগে এই আমলগুলো করতেন এবং ঘুম আসার আগ অবধি মনে মনে ঠোঁট নেড়ে যিকির করতেন। সুন্নাহতে বর্ণিত এই আমলগুলো ফজরে জাগাতে অবশ্যই অবশ্যই কার্যকরী।

ফজরে জাগার অন্যতম আরেকটি উপায়, যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মেনে চলার চেষ্টা করি তা হলো ঘুমানোর সময় ফজরের সালাতের গুরুত্বগুলো একে একে মনে করা। যেমন—মুনাফিকদের জন্য ফজরের সালাত আদায় কষ্টসাধ্য। ফজরের সালাত ছেড়ে দিয়ে নিজের ভেতরে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ধারণ করা কোনোভাবেই সম্ভব না। তাছাড়া যারা ফজর সালাত পড়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের কথা ফেরেশতাদের কাছে জিজ্ঞেস করেন, ফেরেশতারাও খুব উৎসাহের সাথে ফজর সালাত-আদায়কারীদের গল্প আল্লাহর কাছে করে থাকেন। এই ভাবনাটাও আমাকে ফজর সালাত আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে খুব। যেদিন থেকে আমি ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত আদায়ের ফজিলত সম্পর্কিত হাদিসটি শুনেছি, সেদিন থেকে ফজরের সুন্নাত আদায়ে আমি এক অন্য রকম তাড়না অনুভব করি ভেতর থেকে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত হলো পৃথিবী এবং

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

এর মধ্যবর্তী সবকিছুর চাইতে উত্তম।[১] এই হাদিসটির ওপর গভীর মনোযোগ দেওয়া গেলে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত সালাত ছুটে যাওয়ার কোনো সুযোগই নেই। একটু ভালো থাকার জন্যই তো দুনিয়ায় আমাদের এত কসরত। তো ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত যখন দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে ভালো, সবকিছুর চাইতে উত্তম, তাহলে এই উত্তম জিনিসটা ছেড়ে দেওয়ার কোনো মানে হয়?

ফজর ছুটে না যাওয়ার আরেকটা সুন্দর উপায় সুন্নাহর মধ্যে পাওয়া যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন ঘুমাও তখন শয়তান তোমাদের মাথার পেছনে তিনটি গিঁট দেয় এবং এই কথা বলতে থাকে যে, 'রাত আরও অনেক বাকি! ঘুমাও! ঘুমাও! যখন কোনো ব্যক্তি ফজরের আগে জেগে যায় এবং আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন প্রথম গিঁট খুলে যায়। যখন সে ওযু করে, তখন দ্বিতীয় গিঁট খুলে যায় এবং যখন সে সালাতে দাঁড়ায়, তখন তৃতীয় গিঁটটাও খুলে যায়।[২]

খেয়াল করলে দেখবেন, আমাদের ফজর সালাত ছুটে যাওয়ার অন্যতম কারণ হলো অলসতা। আলসেমির কারণে আমরা জামাআতে ফজরের সালাত আদায় করতে পারি না। এর কারণ, শয়তানের বেঁধে দেওয়া গিঁটগুলো খুলতে না পারা। আলসেমি কাটিয়ে ওঠার এক মোক্ষম উপায় হলো এই হাদিস। যখনই ফজরের এলার্ম বেজে উঠবে কিংবা মুয়াজ্জিনের আযান আপনার কানে এসে লাগবে, ঠিক তখনই 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠে বসে পড়ুন। এরপর নবিজির শেখানো দুআটা পাঠ করুন—

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

আল-হামদু লিল্লা হিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।[৩]

এরপর সোজা বিছানা থেকে নেমে ওযু করতে চলে যান। ওযু করে নিত্যদিনের মতন কালেমা শাহাদাত পাঠ করুন। এরপর জায়নামায বিছিয়ে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত সালাতটুকু পড়ে ফেলুন। হাতে অতিরিক্ত সময় থাকলে ফজরের সুন্নাতের আগে দুই রাকআত তাহিয়্যাতুল ওযুর সালাত পড়তে পারেন। ব্যস, আপনি অভিশপ্ত শয়তানের

---

[১] *সহিহ মুসলিম : ৭২৫*

[২] *সহিহ বুখারি : ৩০৯৬; সহিহ মুসলিম : ৭৭৬*

[৩] *সহিহ বুখারি : ৬৩১২*

কল থেকে মুক্ত। এরপর মসজিদে চলে যেতে পারেন, কিংবা আরও সময় হাতে থাকলে কিছু যিকির-আযকার করতে পারেন। ফজরের যিকিরগুলোর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অনেক।

ফজরে নিয়মিত হওয়ার জন্য একটা 'চ্যালেঞ্জ' নেওয়া যেতে পারে। ত্রিশ দিনের চ্যালেঞ্জ। এই ত্রিশ দিনে তিন রকম ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

প্রথম দশ দিন : এই দশ দিনে একপ্রকার 'জোর' করেই ফজরে জেগে উঠুন। যেভাবেই হোক জেগে উঠুন। হোক অ্যালার্ম দিয়ে। হোক অন্যকে বলে রেখে। লক্ষ্য একটাই—ফজর সালাত আপনি পড়বেনই।

মাঝের দশ দিন : প্রথম দশ দিন টানা জামাআতে ফজর আদায় করতে পারলে, মাঝের দশ দিনে আপনি এমনিতেই ফজরে জাগতে পারবেন। কারণ, আপনি একটি রুটিনের মধ্যে চলে এসেছেন ইতোমধ্যে। এই দশ দিন ফজরে জাগার জন্য আপনাকে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। দেখা যাবে, ফজরে জাগার জন্য আপনি রাতে আগে আগে ঘুমোতে চলে যাচ্ছেন। ঘুমের পূর্বের দুআগুলো পাঠ করছেন। 'ফজরে জাগবেন মর্মে' নিয়ত নিয়ে ঘুমোতে যাচ্ছেন যার ফলে ফজরে জাগা এখন আপনার জন্য অধিকতর সহজ।

শেষের দশ দিন : এই দশ দিনে আপনি অন্য রকম একটা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবেন। ফজরের জন্য আপনি তো এখন জাগবেনই, অধিকন্তু, আপনি এখন ফজরের ওয়াক্তের ২০ থেকে ২৫ মিনিট আগে উঠে যেতে পারবেন। এই সময়গুলোতে আপনি তাহাজ্জুদ সালাত পড়বেন। জায়নামাজে আল্লাহর কাছে সঁপে দেবেন নিজেকে। এই দশ দিনে এক অন্য মানুষে পরিণত হবেন আপনি। ফজরে নিয়মিত হয়ে যেতে পেরে এখন তাহাজ্জুদের জন্য আপনার মন ব্যকুল হয়ে থাকবে। আপনার মনে হবে, 'ফজরের বিশ মিনিট আগে জেগে যদি তাহাজ্জুদটা পড়া যায়, অন্তত দুই রাকআত, তা-ই বা কম কীসে? জাগবই যখন, আরেকটু আগেই না হয় জাগলাম।'

এই '৩০ দিনের চ্যালেঞ্জ'টা একবার নিয়ে দেখুন। আমি বিশ্বাস করি, আপনার জীবনকে পরিবর্তন করে দিতে এই পদ্ধতি কার্যকরী ভূমিকা রাখবে, ইন শা আল্লাহ।

ফজরে জাগার জন্য সবার আগে যা দরকার তা হলো ইচ্ছা। ইচ্ছা থাকলে বাকি আয়োজন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যবস্থা করে দেন। আর যদি ইচ্ছাই না থাকে, তাহলে শয়তানের শিকল-বন্দি হয়ে দিন পার করা ছাড়া আর গতি কী? ফজর ছেড়ে

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

দিলেন তো হেরে গেলেন। হেরে যেতে কে চায় বলুন দুনিয়ায়? আল্লাহর চোখে যারা হেরে যায়, তারা তো দুনিয়া এবং আখিরাত দুই জায়গাতেই হতভাগা। আমরা কি সেই হতভাগাদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই? যদি না চাই, তাহলে চলুন দৃঢ় সংকল্প করি—'ইন শা আল্লাহ, আগামীকাল থেকে আর কখনোই আমি ফজর সালাত কাযা করব না।'

তুলি দুই হাত করি মোনাজাত

[ক]

পৃথিবীটা ভরে উঠছে হতাশাগ্রস্ত মানুষ দ্বারা। জীবনের সর্বপদে আমরা হতাশ। কেউ ভালো চাকরির জন্য হতাশ, কেউ ক্যারিয়ার, পড়াশোনা আর ভালো জীবন-জীবিকার জন্য। যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'দিনে কতবার আমি ভালো চাকরির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করি? পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট, ভালো একটি ক্যারিয়ার, ভালো জীবন-জীবিকার জন্যে দিনে কতবার আমি আল্লাহর কাছে হাত পাতি? এমন জরিপের ফলাফলও হবে হতাশাজনক। আমাদের জীবন থেকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় যে সুন্নাহটা বিলুপ্ত সেটা হলো দুআ। আমরা দুআ করতে ভুলে গেছি। অথচ নবি-জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখব, তার পুরো জীবনটাই ছিল আগাগোড়া দুআর সমষ্টি। তিনি ঘুম থেকে উঠে দুআ করেছেন। ওযু করার আগে দুআ করেছেন, ওযু শেষ করে দুআ করেছেন। তিনি নতুন জামা গায়ে দিতে গিয়ে দুআ করেছেন। জুতো পরতে গিয়েও দুআ করেছেন। ঘর থেকে বের হবেন, দুআ করেছেন। ঘরে ঢুকবেন, দুআ করেছেন। আকাশে নতুন চাঁদ দেখে দুআ করেছেন, মোরগের ডাক শুনে দুআ করেছেন। তিনি সুসংবাদ শুনে দুআ করেছেন, দুঃসংবাদ শুনে দুআ করেছেন। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে, প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি কদমে তিনি দুআ করতেন। তার জীবনটাই ছিল একটা 'দুআর ভান্ডার'। আর আমরা? মনে পড়ে আমরা শেষ কবে দুআ করেছি? অন্তত নিজের জন্য?

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

কুরআনে বর্ণিত নবি-রাসুলদের জীবনের দিকে তাকালেও আমরা দেখি যে, তাদের জীবনেও দুআর ছিল এক আশ্চর্যরকম প্রভাব। ক্ষুদ্র থেকে বিশাল সবকিছুতে তারা আল্লাহর কাছে দুআ করতেন। আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতেন। মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েও নবি আইয়ুব আলাইহিস সালাম আল্লাহর ওপর থেকে নিরাশ হননি। দুআ করা ছাড়েননি। মাছের পেটে বন্দি হওয়ার পরেও ইউনুস আলাইহিস সালাম ভুলে যাননি দুআ করার কথা। মুসা আলাইহিস সালামের মুখে ছিল জড়তা। সেই জড়তা দূর করার জন্যেও মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন যা আমরা কুরআনে দেখতে পাই। জীবনের কঠিন-সহজ সকল সময়ে আল্লাহ নবি-রাসুলদের সঙ্গী ছিল দুআ। তারা তাদের জীবনের সমস্ত কিছুকে আল্লাহর দিকে সোপর্দ করে দিয়ে দুআ করতেন। দুআই ছিল তাদের প্রধান বর্ম, প্রধান হাতিয়ার।

[খ]

কেন আমরা দুআ করি না? কারণ, আল্লাহর ওপর থেকে আমাদের তাওয়াক্কুল তথা ভরসা কমে গেছে। অথবা, হতে পারে, দুআর যে আশ্চর্যরকম একটা শক্তি আছে, সেটা উপলব্ধি করতে আমরা ব্যর্থ। নবি-রাসুলদের অন্তর তাওয়াক্কুলে টইটম্বুর ছিল বলেই তারা হরহামেশা দুআ করতেন। তাদের কাজকর্মের সবকিছুতে থাকত দুআর আবরণ। আর আমাদের অন্তরে পড়ে আছে বিস্মৃতির প্রগাঢ় প্রলেপ। মরে আছে আমাদের অন্তরাত্মা। তাই আমরা দুআ করতে পারি না। মাথা নোয়াতে পারি না। আল্লাহর কাছে হাত তুলতে পারি না।

আমরা ভুলে যাই, কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা রাখেন। যাকারিয়া আলাইহিস সালাম যখন মারইয়াম আলাইহাস সালামের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি প্রায়ই দেখতেন মারইয়াম আলাইহাস সালামের কাছে নিত্যনতুন ফলফলাদি আসত। গ্রীষ্মের ফল শীতকালে, শীতকালের ফল গ্রীষ্মে। ফলগুলো কোত্থেকে আসত সেটা যাকারিয়া আলাইহিস সালাম জানতেন না। কৌতূহলবশত একদিন তিনি মারইয়াম আলাইহাস সালামকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'হে মারইয়াম! তোমার মেহরাবে আমি ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নেই। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি এখানে আসে না। কিন্তু আমার বড্ড জানতে মন চায়, তোমার কাছে যে নিত্যনতুন ফলফলাদি দেখি, সেগুলো তুমি কোথায়

পাও?' মারইয়াম আলাইহাস সালাম বললেন, 'সেগুলো আমার আল্লাহ পাঠান।'[১] গ্রীষ্মকালের ফল শীতকালে, শীতকালের ফল গ্রীষ্মকালে দেওয়ার ক্ষমতা যে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই রাখেন, এই বিশ্বাস যাকারিয়া আলাইহিস সালামের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল। মারইয়াম আলাইহাস সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমন নিআমত দান করছেন দেখে যাকারিয়া আলাইহিস সালামের মনে একটি আশার ঢেউ খেলে গেল। তিনি ভাবলেন, আল্লাহ যদি মারইয়ামের ওপর এমন অপার দয়া করতে পারেন, আমাকেও তিনি অবশ্যই একটি সন্তান দিতে পারবেন। এরপর তিনি বিনয় চিত্তে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। বললেন, 'হে পরওয়ারদিগার! আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে। সাদা হয়ে গেছে আমার মাথার চুল। আপনাকে ডেকে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি। আর আমার পরে আমার স্বগোত্রীয়দের ব্যাপারে আমি আশঙ্কা করছি। পরওয়ারদেগার! আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। (তবুও আমি আপনার কাছে চাইছি) আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন।'[২]

যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এই দুআর মধ্যে কতটা বিনয়, কতটা অসহায়ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন দেখুন! তিনি একটি সন্তান চাচ্ছেন তার বংশপরম্পরা জারি রাখতে। কিন্তু তিনি নিজে বয়োবৃদ্ধ। তার অবস্থার বর্ণনা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বললেন, 'আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে। আমার কালো চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে।' আমরা কি কখনো আল্লাহর কাছে এভাবে কিছু চেয়েছি? বলেছি, 'মাবুদ, আমার আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। আমার কাঁধে আমার বাবা-মা, সন্তান এবং স্ত্রীর দায়িত্ব আছে। আমার হাতে কোনো মূলধন মজুদ নেই যা দিয়ে আমি ব্যবসায়ে নেমে পড়ব। এমন কোনো উপায়ও নেই যে, যা ব্যবহার করে আমি আমার পরিবারের চাহিদা মেটাতে পারব। ইয়া রব, এই মুহূর্তে একটা চাকরির সংস্থান না হলে আমাকে আমার পরিবার পরিজন নিয়ে ভিক্ষা করতে হবে। মাবুদ! রিযিকের মালিক তো আপনি। আপনার কাছ থেকেই আমাদের রিযিক আসে। আপনার ভান্ডারে তো কোনো কিছুর অভাব নেই। হে আমার প্রতিপালক, আপনার ওপরে ভরসা করে আছি। আপনি আমাকে একটি উপায় বাতলে দিন। আমার পরিবার-পরিজন নিয়ে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার বন্দোবস্ত করে দিন।'

[১] সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ৩৭

[২] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৪-৫

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

যে যুবকের এখন বিয়ের বয়স, কিন্তু নানান প্রতিকূলতায় তার বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে না, সে কি কখনো হাত তুলে আল্লাহর কাছে বলেছে, 'ইয়া আল্লাহ, আমার শরীরে এখন যৌবনের উন্মত্ত উন্মাদনা। আমার সামনে-পেছনে, ডানে-বায়ে, ওপরে-নিচে সবখানে ফিতনা আর ফিতনা। ফিতনার এই মায়াজাল ভেদ করে নিজের চরিত্রকে শুদ্ধ রাখা আমার জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। ইয়া রব, যদি আমার কোনো ভালো চাকরি না হয়, যদি আমার আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হয়, তাহলে বিয়ে করাটা আমার জন্য একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়বে। মাবুদ, আমি ফিতনা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাই। আমি চাই একটি হালাল সম্পর্ক যেখানে আমার চোখ শীতল হবে, আমার হৃদয় তৃপ্ত হবে, আমার অন্তর প্রশান্ত হবে। আপনি তো সমস্ত ঐশ্বর্যের মালিক। আপনিই পথের ভিখারিকে রাজা বানান, আবার রাজাকে বানান পথের ভিখারি। মাবুদ, আপনার অঢেল, অফুরন্ত ঐশ্বর্য থেকে আমার জন্য কিছু রিযিক নির্ধারণ করুন। আমার জন্য বিয়েটাকে সহজ করে দিন।'

যে লোকটার শরীরে বাসা বেঁধেছে দুরারোগ্য ব্যাধি, জীবনপ্রদীপ নিভে যাওয়ার আশঙ্কায় যে অস্থির-চঞ্চল, সে কি কখনো বলেছে, 'ইয়া আল্লাহ, জীবনের কতগুলো বসন্ত পার করে এসেছি। কত ভালো ভালো সময়ে তোমার স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়েছি। তোমার দেওয়া আলো-বাতাস, তোমার দেওয়া রিযিক ভক্ষণ করে বড় হলেও কখনো তোমার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করিনি। আজ আমার জীবনের ক্রান্তিলগ্ন! দুনিয়ার সমস্ত আয়োজন আমার শরীরের বসন্ত ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা আমাকে জানিয়েছে, আমার চোখ বুজবার দিন অতি সন্নিকটে। কোথাও আর কোনো আশা নেই। কিন্তু তারা হয়তো জানে না, তাদের আশা যেখানে গিয়ে শেষ হয়, তোমার ভরসার বুদবুদ সেখান থেকে যাত্রা করে। মাবুদ, আমি তো জানি, তুমিই সকল সমস্যার একমাত্র সমাধানদাতা। তুমি তো আশ-শাফী। আরোগ্যদাতা। আমি তোমার দিকে মুখ ফেরালাম। আমি অসহায়, দুর্বল, ছিন্নবস্ত্র এক। তারা বলছে আমার সকল আশা ফুরিয়ে গেছে, অথচ আমার সামনে আশার এক জ্বলজ্বলে প্রদীপ। তুমিই কি আইয়ুব আলাইহিস সালামকে দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে আরোগ্য দাওনি? তুমিই কি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য আগুনকে শান্ত-শীতল করে দাওনি? তোমার নির্দেশেই কি দরিয়া ফুঁড়ে পথ তৈরি হয়নি নবি মুসা আলাইহিস সালামের জন্য? তুমি যার রব, তার কি হতাশ হওয়ার কারণ থাকতে পারে? আমিও হতাশ হচ্ছি না ইয়া রব, আমার শরীরে তুমি আরোগ্য দান করো। আমাকে নতুন করে তোমায় ডাকতে দাও, চিনতে দাও।'

[গ]

আমরা যে দুআ করি না তার পেছনে অন্যতম আরেকটি কারণ হলো আমাদের মজ্জাগত স্বভাব। আমরা নগদে বিশ্বাসী। তৎক্ষণাৎ যা পাই তাতেই আমাদের অগাধ বিশ্বাস, অঢেল আস্থা। আমরা বোঝার চেষ্টা করি না যে, শৃঙ্খলা হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা পদ্ধতি। তিনি 'কুন' বললেই সবকিছু সৃষ্টি হয়ে যায়, তথাপি তিনি পৃথিবী এবং আসমান-জমিন সৃষ্টি করতে আট দিন সময় নিয়েছেন। তিনি 'কুন' বললেই যেকোনো কিছু অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসতে বাধ্য। অথচ মাতৃগর্ভে তিনি আমাদের দীর্ঘ একটি প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে বড় করে তোলেন। এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পদ্ধতি। নিয়ম। কিন্তু আমরা এই পদ্ধতি, এই নিয়মের তোয়াক্কা করি না মোটেও। আমরা চাই, আমাদের দুআগুলো করামাত্র কবুল হোক। যখন দেখি, আমাদের দুআগুলো আমাদের প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে কবুল হচ্ছে না, দুআর আপাত কোনো ফল পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। আস্তে আস্তে দুআ করা ছেড়ে দিই। এই যে আমাদের মজ্জাগত স্বভাব, আমাদের অস্থির চিত্ত, এটার উল্লেখ করেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে বলেছেন, 'মানুষ বড়ই তাড়াহুড়োপ্রবণ।'[১]

আল্লাহর কাছে আমরা যে দুআ করি, সেই দুআ কবুলের ব্যাপার নিয়ে ড. বিলাল ফিলিপসের খুব চমৎকার একটি কথা আছে। তিনি বলেছেন, 'আপনি যখন দুআ করেন, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তিনভাবে আপনার দুআর উত্তর দেন।

এক. আপনার দুআর বিপরীতে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।' অর্থাৎ, তৎক্ষণাৎ আপনার দুআ তিনি কবুল করে নেন।

দুই. আপনার দুআর বিপরীতে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু এখনই নয়।' অর্থাৎ আপনার দুআ তিনি কবুল করবেন, তবে সেটা তৎক্ষণাৎ নয়। আপনার দুআ পূরণের জন্য উপযুক্ত সময় কোনটি সেটা আপনি জানেন না। কোন সময়ে কবুল করলে তা আপনার জন্য বেশিই উপকারী, সেই জ্ঞান আপনার নেই, আল্লাহর আছে। তাই তিনি আপনার পছন্দমাফিক সময়ে দুআটা কবুল করেন না। উপযুক্ত সময়ের জন্য আপনাকে অপেক্ষা করান।

[১] সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১১

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

তিন. 'তোমাকে নিয়ে আমার আরও উত্তম পরিকল্পনা আছে।' অর্থাৎ দুআর মাধ্যমে আপনি আল্লাহর কাছে যা চাইছেন, তা হয়তো আপনার জন্য অকল্যাণকরও হতে পারে। অথবা আপনি যা চাইছেন তাতে আপনার জন্য যে কল্যাণ, তারচেয়ে অধিক কল্যাণকর কিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই আপনি দুআ করে যা চান, ঠিক তা-ই অনেক সময় আল্লাহ আপনাকে দেন না। আপনাকে আরও কল্যাণকর, আরও উপকারী বিষয়ের দিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ধাবিত করান।

অস্থির চিত্ত না হয়ে, আল্লাহর সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো রকম অবিশ্বাস, সন্দেহ কিংবা সংশয় পোষণ না করে তাঁর কাছে চান। আপনার যেটুকু দায়িত্ব সেটুকু পালন করে বাকি ফলাফলের জন্য তাঁর ওপর ভরসা করুন, ঠিক যে রকম আমাদের নবি মুসা আলাইহিস সালাম করেছিলেন। ফিরাউনের রাজ্য থেকে পালিয়ে তিনি মাদইয়ানে এসেছিলেন। ছিন্নমূল অবস্থায়। সেখানে দুটো অসহায় রমণীর তৃষ্ণার্ত বকরিকে পানি পান করিয়ে তিনি কেবল আল্লাহর কাছেই প্রতিদান আশা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার রব, নিশ্চয় আপনি আমার জন্য যে অনুগ্রহ প্রেরণ করবেন, আমি তারই মুখেপাক্ষী।'[১] নবি মুসা আলাইহিস সালাম নির্দিষ্ট করে আল্লাহর কাছে কিছুই চাননি। তার কী দরকার—এই ভারটা তিনি আল্লাহর ওপরে ন্যস্ত করে দিয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে যা দেবেন তাতেই আমি খুশি।' আমাদের দুআগুলোও হতে হবে এমন। দুআর মধ্যে থাকতে হবে আল্লাহর ওপর পরম নির্ভরতার ছাপ।

বনি ইসরাইল যুগের তিন লোক, যারা আটকা পড়েছিল গুহার মধ্যে, তারাও দুআর মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছিল। বিশাল পাথর এসে যখন আটকে দিয়েছিল গুহার দ্বার, তখন তারা আল্লাহর কাছে আকুল চিত্তে দুআ করেছিল। সেই দুআগুলো আল্লাহ কবুল করে নিয়েছিলেন এবং তাদের মুক্তি দিয়েছিলেন বন্দিদশা থেকে। আসহাবে কাহাফের সেই যুবকেরা, তারা চারপাশের ফিতনা থেকে বাঁচতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে দুআ করেছিল, আল্লাহ তাদের দুআও কবুল করেছেন। সুদীর্ঘ একটা সময়ের জন্য তাদের তিনি ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। হিফাযত করলেন তাদের ঈমানের।

এই কথাটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, আল্লাহ আমাদের দুআগুলো শোনেন। শুধু আমাদের নয়, যদি কোনো কাফিরও হৃদয়ের গভীর থেকে আকুলচিত্তে কোনো

কিছু চায়, দুনিয়াবি কোনো বস্তু, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার দুআও শুনে থাকেন। একজন কাফির, যে আল্লাহকে অস্বীকার করেছে কিংবা একজন মুশরিক, যে বহু ইলাহতে বিশ্বাস করে বসে আছে, গভীর বিপদের সময় কিংবা অতীব প্রয়োজনের তাগিদে সে যখন হৃদয়ের গভীর বন্দর থেকে আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য ডাক হাকে, আল্লাহ তার ডাকটিও শোনেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ করেন। আল্লাহ যদি একজন কাফিরের, একজন মুশরিকের দুআ কবুল করেন, আপনার-আমার দুআ কেন তিনি কবুল করবেন না? আমরা তো আল্লাহতে ঈমান রাখি। তাঁর ইবাদত করি। তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। আপনার-আমার চাইতে বেশি হকদার তো একজন কাফির কিংবা একজন মুশরিক হতে পারে না। তাদের দুআ যদি কবুল হতে পারে, তাহলে নিশ্চিত আমাদের দুআও কবুল হবে।[১] তবে কোনো কিছু হওয়ার আগের শর্ত হলো সেটা শুরু করা। আমরা যদি দুআই না করি, আল্লাহর কাছে না-ই চাই, তাহলে কবুলের আশা করব কীভাবে? ফসল পেতে হলে তো মাঠে বীজ বুনতে হবে। বীজ না বুনলে খেত থেকে যেমন আগাছা ব্যতীত কিছু পাওয়া যাবে না, দুআ না করলে জীবনে হতাশা ব্যতীত আর কিছু লাভ করা সম্ভব নাও হতে পারে।

আমাদের উচিত নয় দুআ করা থামিয়ে দেওয়া। আমাদের এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবশ্যই আমার দুআ কবুল করবেন। আজ, নয়তো কাল। আমার দুআ কবুল হতে হয়তো একটু সময় লেগে যেতে পারে, তবে এই 'সময় লেগে যাওয়া' যেন কোনোভাবেই আমাকে অধৈর্য, অস্থির এবং দুআ বিমুখ না করে ফেলে। আমার দুআ আল্লাহ কেন কবুল করবেন না যেখানে তিনি অভিশপ্ত ইবলিস শয়তানের দুআ পর্যন্ত কবুল করেছেন? ইবলিস আল্লাহকে বলেছে, 'আর যদি আপনি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেন, তাহলে অতি অল্পসংখ্যক ছাড়া তার (আদমের) বংশধরদের অবশ্যই আমি পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব।'

ইবলিসের এই দুআ, এই চাওয়া আল্লাহ পূরণ করেছিলেন। তিনি বললেন, 'যাও তোমাকে অবকাশ দেওয়া হলো!'[২]

---

[১] কাফিরদের দুআ কবুল হয় কি না—তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে পার্থিব বস্তু লাভের দুআ কবুল হয়।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইবলিসকেও ফিরিয়ে দেননি। আমরা কেন ভাবছি যে, তিনি আমাদের ফিরিয়ে দেবেন? নিরাশ করবেন?

[ঘ]

'আল্লাহ দুআ কবুল করেন'—এই আশার আনন্দে আমাদের মন হয়তো এখন দুলে উঠেছে। ভাবছি, আজ থেকে আর দুআ করা ছাড়বই না, তাই না? দুআ করার জন্য যে বিশেষ কিছু মুহূর্ত আছে, তা কি আমরা জানি? এমন কিছু মুহূর্ত আমরা হেলায় পার করে দিই যেগুলো দুআ কবুলের কার্যকরী সময়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সময়গুলোতে আমাদের বেশি বেশি দুআ করতে বলেছেন। এই সময়ের দুআগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দ্রুত কবুল করে নেন। আমরা কি জানব না সেই মুহূর্তগুলোর কথা? চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক—

আযান এবং ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়টুকু : মসজিদ থেকে আযান শোনার পরেও আমরা ফোন-কম্পিউটার ছেড়ে উঠি না। ভাবি, ফরয সালাত তো আরও আধা ঘণ্টা পরে। আরও কিছুক্ষণ ফেইসবুকিং করি। অথচ আযানের পর থেকে ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে এমন একটি মুহূর্ত বিদ্যমান, যে মুহূর্তে কোনো ব্যক্তি দুআ করলে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার দুআ কবুল করে নেন।[১]

বৃষ্টি হলে : কবি জসীম উদ্দীন লিখেছিলেন—বৃষ্টি হলে তার প্রিয় মানুষের কথা মনে পড়ে। আমাদের কাছে সবচাইতে প্রিয় কে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তাই বৃষ্টি হলে আল্লাহকে মনে পড়ুক এটাই কাম্য। বৃষ্টির সময় যদি কেউ দুআ করে, তার সেই দুআ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করেন।[২] আজ থেকে যখনই বৃষ্টি দেখব, দুআ করতে আর ভুল করব না।

রাতের শেষ তৃতীয়াংশে : সুবহে সাদিকের ঠিক আগের মুহূর্তটাই রাতের শেষ তৃতীয়াংশ। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে এসে বলতে থাকেন, 'কে আছ এখন আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে

---

[১] সুনানু আবি দাউদ : ৫২১; জামি তিরমিযি : ২১২, হাদিসটি সহিহ

দেবো। কে আছ আমার কাছে কিছু চাইবে, আমি তাকে তা দিয়ে দেবো...।'[১] ফজরের ঠিক বিশ মিনিট আগেও ঘুম থেকে জেগে উঠে আমরা যদি তাহাজ্জুদ সালাতে আল্লাহর কাছে কিছু চাই, নবিজি বলছেন আল্লাহ তা আমাদের অবশ্যই দেবেন।

কোনো সফরে থাকলে : জীবনের অধিকাংশ সফর তথা ভ্রমণ করেছেন গান শুনতে শুনতে, তাই না? অথচ দুআ কবুলের জন্য সফর সময়টাও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থা।[২] এমন একটি সুযোগ আমরা গান শুনে, অহেতুক কথা বলে, মোবাইলে মুভি-নাটক কিংবা ফেইসবুক স্ক্রল করতে করতে কাটিয়ে দিই।

কোন অসুস্থকে দেখতে গেলে : অসুস্থকে দেখতে যাওয়াটা আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ। এতে করে মানুষের সাথে আমাদের হৃদ্যতা বাড়ে। সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। সাথে, এই সময়টা দুআ কবুলের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় কোনো দুআ করলে তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করে নেন।[৩]

[ঙ]

আমার খুব প্রিয় একটি দুআ আছে। দুআটি খুব ছোট, কিন্তু তার বিস্তৃতি বিশাল। আমাদের সংক্ষিপ্ত এই দুআ ধারণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক বিষয়। আমাদের দুনিয়ার চাহিদা, আখিরাতের দরকার, সবকিছুই যেন এই ছোট্ট দুআতেই চেয়ে ফেলা যায়। তাই দুআটি আমি সর্বদা আওড়াই। যখনই আমার দুআ করার কথা মনে আসে, আমার মনে পড়ে যায় এই দুআর কথা। সালাতে, সিজদায়, হাঁটতে, চলতে এই দুআ যেন আমার নিত্যসঙ্গীর মতো।

আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন।'

নবিজি বললেন, 'চাচা, বলুন— اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ (আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকাল আফিয়াহ)

---

[১] সহিহ বুখারি, ১২১৭

[২] সুনানু আবি দাউদ : ১৫৩৮; জামি তিরমিযি : ১৯০৫, হাদিসটি সহিহ

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

মানে হলো, 'ও আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আফিয়াহ চাচ্ছি।'[১]

প্রশ্ন হলো, 'আফিয়াহ' কী জিনিস? যখন আপনি বিপদ-আপদ থেকে বেঁচে যান, তখন আপনি মূলত আফিয়াহ পেয়ে গেলেন। রোগমুক্তি এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে? তাহলে আপনি আফিয়াহতে আছেন। আপনার কাজে বারাকাহ আসছে? সময়ে বারাকাহ আসছে? আয়-উপার্জনে বারাকাহ আসছে? আপনি আফিয়াহ পাচ্ছেন। আপনার সন্তানদের ওপর থেকে বিপদ সরে যাচ্ছে? আপনি আফিয়াহ পাচ্ছেন। এমনকি, আখিরাতে আপনাকে ক্ষমা করা হলে, সেটাও আসলে আফিয়াহ।

এত ছোট্ট দুআতে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মন ভরল না। তিনি ভাবলেন, 'এই দুআ তো খুবই ছোট! আমার তো অনেক বড় দুআ চাই। অনেক কিছু যেখানে একসাথে চাওয়া যাবে।' তিনি নবিজির কাছে ফিরে এসে বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! এটা তো খুব ছোট দুআ! আসলে আমি আরও বড় দুআ চাচ্ছিলাম।'

তার কথা শুনে নবিজি হাসলেন। বললেন, 'প্রিয় চাচা! আপনি আল্লাহর কাছে আফিয়াহই চান। আল্লাহর শপথ! এরচেয়ে ভালো আপনার জন্য আর কিছুই হতে পারে না!'

'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকাল আফিয়াহ'—খুব ছোট্ট দুআ। অথচ ধারণ করে আছে কত বিশাল জিনিস! কত বিস্তৃত বিষয় এই দুআর মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে! আমরা যারা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচতে চাই, আমরা আল্লাহকে বলতে পারি, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকাল আফিয়াহ।' সন্তানসন্ততির ভালো চেয়ে আল্লাহর কাছে বলতে পারি, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকাল আফিয়াহ।' রোগ থেকে মুক্তি পেতে আল্লাহকে বলতে পারি, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকাল আফিয়াহ।' আয়-উপার্জনে বারাকাহ পেতে আল্লাহকে বলতে পারি, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকাল আফিয়াহ।' জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে, অনিন্দ্য সুন্দর, মনোরম মনোহর জান্নাতলাভের জন্য বলতে পারি, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকাল আফিয়াহ।'

[চ]

এখন আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটার অনুপস্থিতি তা হলো দুআ। দুআ হলো সকল নবি-রাসুলের সুন্নাত। দুআ মানে আল্লাহর কাছে চাওয়া। হাত

তুলে নিজের প্রয়োজন আল্লাহকে খুলে বলা। নীরবে, নিভৃতে গুনগুন করে আল্লাহর কাছে নিজের সকল চাহিদা, আশা, আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা। জীবনের সকল মুহূর্তে আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। এমনকি, জীবন যখন অঢেল সুখে ভরে উঠবে, তাতে যখন থাকবে না কোনো দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা-গ্লানি, তখনো আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। বলতে হবে, 'ইয়া আল্লাহ, আমার এই সুখকে আপনি দীর্ঘায়িত করুন। এটাকে আমার জন্য পরীক্ষা বানাবেন না। নিশ্চয়, আমি খুব দুর্বল এক বান্দা। আপনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।'

দুনিয়ায় আমাদের অনেক কিছু দরকার। চলুন সেই দরকারগুলোর একটি তালিকা করে ফেলি। আল্লাহর কাছে দুনিয়ায় কী কী চাই, আখিরাতে কী কী চাই, আমার বাবা-মায়ের জন্য কী চাই, আমার ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তানদের জন্য কী চাই তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করি। তালিকা ধরে ধরে আল্লাহর কাছে চাই। আল্লাহকে বলি, 'ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, আপনারই ইবাদত করি আর আপনার কাছেই সাহায্য চাই। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোনো গত্যন্তর নেই। কেউ নেই যার কাছে কিছু চাওয়া যায়। কেউ নেই যে আমাদের কিছু দিতে পারে। তাই আপনার কাছেই হাত পেতেছি, মালিক। আপনি আমাদের চাওয়াগুলো পূরণ করুন।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

চলো বদলাই

[ক]

মক্কার চারদিকে তখন মূর্তিপূজার ঘনঘটা। লাত-উযযা আর মানাতের মতো অসংখ্য, অগণিত দেব-দেবীর পূজো-অর্চনা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত মক্কার অধিবাসীরা। এই অঞ্চলেই তাওহিদের গোড়াপত্তন করে গিয়েছিলেন পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। স্ত্রী হাজেরা আর পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামকে সাথে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন একত্ববাদের ইমারত। দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'আল্লাহ এক এবং তাঁর কোনো শরিক নেই।'

কিন্তু সময়ের পালাবদলের সাথে সাথে তাওহিদের শোভামণ্ডিত এই ভূমিতে নেমে এলো ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাওহিদের মশালে উদ্ভাসিত এই উর্বর ভূমিতে উদিত হওয়া সূর্যটা আস্তে আস্তে মেঘের আড়ালে চলে গেল। এক সত্য ইলাহকে ছেড়ে মানুষ খুঁজে নিল বহু ইলাহ আর বহু মাবুদ। মানুষ ভুলে গেল তার সত্যিকার রবকে। সেই একত্ববাদের বলয় থেকে যখনই মানুষের বিচ্যুতি ঘটেছে, তখনই মানুষ ভুলে বসেছে পৃথিবীতে তার আগমনের কারণ ও উদ্দেশ্য। কেন্দ্র থেকে বিচ্যুতি ঘটলেই যেভাবে পতন হয় সুবিশাল নক্ষত্রের, ঠিক সেভাবেই তাওহিদ থেকে দূরে সরে যাওয়াতে মানুষও হয়ে পড়েছে দিশাহীন।

শেকড় ভুলে গেলেও শেকড়ের কিছু চিহ্ন মানুষ অজান্তে বুকের ভেতরে ধারণ করে রাখে। মক্কার মুশরিকদের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল একত্ববাদ, কিন্তু সেই একত্ববাদের নিশান বয়ে চলা মানুষগুলোর কিছু স্মৃতি তাদের অন্তর থেকে বিস্মৃত হয়নি কখনোই। এমন একটা স্মৃতি হলো সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো। এটা আমাদের একেবারে শেকড়ের কাহিনি।

মক্কা উপত্যকায় তখন কোনো জনবসতি গড়ে ওঠেনি। চারদিকে কেবল ধু-ধু মরুভূমি। বালির এই বিশাল প্রান্তরে কোথাও কোনো জনমানুষের চিহ্ন নেই। এমনই এক সময়ে পিতা ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার স্ত্রী হাজেরা এবং পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামকে রেখে যান এই উপত্যকায়। মাথার ওপর প্রকাণ্ড সূর্য, পায়ের নিচে তপ্ত বালু। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় শিশু ইসমাঈলের প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত প্রায়। চোখের সামনে শিশুপুত্রের এমন আর্তনাদ আর আহাজারি দেখে যেন মাতা হাজেরা আলাইহাস সালামের বুক ফেটে যায়। ইসমাঈলের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক ফোঁটা জলের আশায় তিনি দিগ্‌বিদিক ছুটতে থাকেন। একটু জলের জন্য তিনি সাফা পর্বত থেকে মারওয়া পর্বতে, মারওয়া পর্বত থেকে সাফা পর্বতে ছুটোছুটি করেছিলেন সেদিন। যদি মিলে যায় একটুখানি জল! মাতা হাজেরা আলাইহাস সালামের সেদিনকার সেই স্মৃতিকে ধরে রাখতে পরবর্তীতে সাফা-মারওয়া পর্বতে দৌড়ানোকে হজের একটি পবিত্র রীতিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। এরপর, মক্কা উপত্যকা থেকে তাওহিদ বিলুপ্ত হলেও এই রীতিগুলো একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তারা এক আল্লাহকে ভুলে গেছে ঠিক, কিন্তু বংশপরম্পরায় চলে আসা এই রীতিগুলোকে তারা ঠিকই বুকের ভেতরে জায়গা দিয়েছিল।

এ রকম এক জাহিলিয়াতের মধ্যে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেছিল মক্কা এবং তৎসংলগ্ন এলাকার মানুষগুলো। জন্মের পর থেকেই তারা উপাসনা করে এসেছে মিথ্যে ইলাহ, মিথ্যে রবের। নিজেদের পূর্বপুরুষদের দেখাদেখি সেই মিথ্যে ইলাহদের বানিয়ে নিয়েছিল জীবনের সবকিছু। তবে, একত্ববাদের বলয় থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়লেও তারা আগের মতো যথারীতি সাফা-মারওয়াতে দৌড়াদৌড়ি করত। এটাকে তারা মনে করত ইবাদত-বন্দেগির অংশ। তারা শেকড় ভুলে গেছে, কিন্তু ভুলতে পারেনি শেকড়ের চিহ্নকে। মনের অজান্তে সেটাকে বুকে বয়ে বেড়াচ্ছিল যুগের পর যুগ।

এরপর, মহান রবের বদান্যতায় যখন সেখানে আবার তাওহিদের পুনরুত্থান হলো, যখন তাওহিদ-সহ আবির্ভাব ঘটল মহামানব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তখন আবার আস্তে আস্তে প্রাণ ফিরে পেতে শুরু করল মৃত মক্কা নগরী। শুকিয়ে যাওয়া পত্রপল্লব আবার সবুজ হয়ে উঠতে লাগল। যেন মৃত গাঙে ফিরে এলো প্রাণের

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

জোয়ার। সেই ডাক, সেই সুর আর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে চারদিক থেকে দলে দলে মানুষ আবার প্রবেশ করতে লাগল একত্ববাদের বলয়ে। এ যেন দিশেহারা পথিকের দিশা। পথহারা পথিকের পথ আর কূলহারা নাবিকের কূল। এই তল্লাটে যেন এক বিস্ময়কর কান্ড ঘটে গেল! গতকালকের ডাকাত লোকটা আজকে হয়ে উঠল সম্পদের আমানতদার। গতকাল যে মানুষটা যিনা আর ব্যভিচারে মজে ছিল, কোনো এক অনন্য স্পর্শে আজ সে আগাগোড়া অন্য রকম। তাওবা করে বলেছে সে আর কোনোদিন ও-মুখী হবে না। সে তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত। গতকাল রাতে যে লোকটা তার সদ্যজাত কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার চিন্তা করছিল, কোনো এক বিচিত্র কারণে আজ সে তার কন্যার গলা জড়িয়ে ধরে কান্না করছে। যে পিতার গতকাল হবার কথা ছিল হত্যাকারী, আজ সেই পিতা হয়ে গেছে কন্যার পরম অভিভাবক। কোন সে জিয়নকাঠি, যার অনুপম স্পর্শে রাতারাতি বদলে গেল তারা? সেটা হলো ইসলাম।

সাহাবি আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু জাহিলিয়াতের এই নিয়মের সাথে পরিচিত ছিলেন। মক্কা এবং মদিনার মুশরিকরা যে সাফা-মারওয়াতে দৌড়াদৌড়ি করত এবং এই কাজকে তারা যে ইবাদতের অংশ মনে করত; তা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন তিনি। একবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আচ্ছা, আপনি কি সাঈ করতে ঘৃণা করতেন?'

হজের সময়ে সাফা-মারওয়া পর্বতে দৌড়াদৌড়ি করাকে সাঈ বলা হয়। মাতা হাজেরা আলাইহাস সালামের স্মৃতি রক্ষার্থে এই রীতিকে হজকেন্দ্রিক রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে যখন বলা হলো যে তিনি এই রীতিকে, অর্থাৎ সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানোকে ঘৃণা করতেন কি না, তখন তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আমরা এটাকে ঘৃণা করতাম। কারণ এটা ছিল জাহিলিয়াতের রীতি। জাহিলিয়াতে থাকাবস্থায় আমরা এমনটি করতাম। কিন্তু, এই রীতিকে আমরা ততক্ষণ ঘৃণা করেছি যতক্ষণ না কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয়[১]—

অবশ্যই সাফা এবং মারওয়া পর্বত দুটো আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। অতএব, তোমাদের কেউ যদি হজ কিংবা উমরা করার ইচ্ছা করে, তাহলে তার জন্য এ দুটোতে (সাফা-মারওয়াতে) তাওয়াফ করাতে দোষের কিছু নেই।[২]

[১] সহিহ বুখারি : ৪৪৯৬

সাহাবি আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর এই কথা থেকে আমরা কয়েকটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করব। জাহিলিয়াত থেকে উঠে এসে যারা নতুন ভোরের সোনারঙা রোদে রাঙিয়েছেন জীবন, যারা এতদিনকার যাপিতজীবনের সকল পাঠ ছেড়ে সূচনা করেছেন জীবনের নতুন অধ্যায়ের, তাদের কাছে সাঈ অর্থাৎ সাফা এবং মারওয়া পর্বতে দৌড়ানোকে বেশ অদ্ভুত ঠেকল। আজীবনের পরিচিত এবং প্রিয় এই রীতিকে তারা ঘৃণা করতেন। ভাবতেন, 'আরে! এটা তো জাহিলদের কাজ! জাহিলিয়াতের রীতি। আমরা এখন মুসলিম। চিন্তায় আর বিশ্বাসে বিশুদ্ধ আত্মা। আমরা কেন জাহিলিয়াতের রীতিনীতি পছন্দ করব?'

ঈমান আনার সাথে সাথে তারা ভুলে গেলেন বাপ-দাদাদের সব রীতিনীতি। পূর্বপুরুষদের আনীত, পালিত সকল বিধিবিধানকে রাতারাতি বুড়ো আঙুল দেখানোর সাহস যারা দেখাতে পারেন, তাদের ঈমানের পারদ কত উঁচুতে তা কল্পনাও করা যায় না। এরপর, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে আয়াত নাযিল করে সাফা-মারওয়ায় দৌড়ানোকে সত্যায়িত করে দিলেন, যখন আল্লাহ তাআলা বললেন সাফা মারওয়ায় তাওয়াফে দোষের কিছু নেই, তখনই আবার তারা এই রীতিকে ভালোবাসতে শুরু করলেন। এতদিন এই রীতির বিরুদ্ধে মনের মধ্যে যে ঘৃণার পাহাড় তারা তৈরি করেছিলেন, আল্লাহর বিধান শোনামাত্রই সেই ঘৃণার পাহাড় ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। এটাই তো প্রেম! এটাই অনুপম ভালোবাসা! আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা আর আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা!

[খ]

ফুযাইল ইবনু ইয়ায। একজন বিখ্যাত তাবিয়ি। তার দুনিয়াবিমুখতা এবং পরহেযগারি ছিল সবার মুখে মুখে। কিন্তু, একেবারে শুরুর জীবনে তিনি মোটেও ধর্মভীরু ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাংঘাতিক রকমের একজন ডাকাত। এলাকাবাসী তার ভয়ে সর্বদা তটস্থ থাকত। তাকে লোকজন এতটাই ভয় পেত যে, রাতের বেলা মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পর্যন্ত যেতে চাইত না। সকাল হবার জন্য অপেক্ষা করত। ভাবত, রাতে বের হলে নির্ঘাত ফুযাইলের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারাতে হবে।

সেই ফুযাইল ইবনু ইয়াযের প্রথম জীবনের ঘটনা। তিনি পড়শির একটি সুন্দরী মেয়েকে ভালোবাসতেন। একরাতে ওই মেয়ের বাড়িতে হানা দেন তিনি। মেয়েটির ঘরে ঢোকার জন্য দেওয়াল টপকাতে যাবেন, এমন সময় কোথা থেকে যেন তার

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

কানে একটি সুমধুর সুর ভেসে আসে। সেই সুর, সেই ঝংকারধ্বনি পাগলপারা করে দেয় ফুযাইলের মনকে। তার জীবনে এনে দেয় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। দুনিয়ার মোহে ডুবে থাকা ফুযাইলের অন্তরে শুরু হয় এক মহাসাইক্লোন। সেই সাইক্লোনে হৃদয়ের অলিন্দে জমে থাকা ধুলোবালি, মরচে পড়া বিস্মৃতির আস্তরণ মুহূর্তেই উড়ে চলে যায়। কোন সেই সুর, যা তছনছ করে দিয়েছিল ফুযাইলের হৃদয়কে? কোন সেই অমৃত সুধা যা ঘুরিয়ে দিয়েছে তার জীবনের মোড়? সেটি হলো পবিত্র কুরআনের সুরা আল হাদীদের একটি আয়াত যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন—

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তাতে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি?[১]

এই আয়াত শোনার সাথে সাথে ফুযাইল বলে উঠলেন, 'অবশ্যই, হে আমার রব, সেই সময় উপস্থিত।'

ব্যস, এই একটি আয়াত বদলে দিল ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহর জীবন। এরপর বাকি জীবনে তিনি আর কোনোদিন পাপ কাজের নিকটবর্তী হননি। পরের জীবনটাকে তিনি সাজিয়ে নিয়েছেন মহান আল্লাহ তাআলার বিধান অনুসারে। আল্লাহর রঙে রাঙিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। তার পরহেযগারি এবং দুনিয়াবিমুখ জীবনযাপনের জন্য তিনি পরবর্তী মানুষদের জন্য আদর্শে রূপান্তরিত হন।[২]

পাপে ভরা জীবনে আমরা যখন মিথ্যার দিকে ধাবিত হই, লোক ঠকাই, তখন কি আমাদের একবারও মনে পড়ে না যে, এই কাজগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পছন্দ করেন কি না? একবারও মনে হয় না যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত দ্বীনের সাথে আমরা তামাশা করছি? যখন কোনো পাপের নিকটবর্তী হই, তখন কি মনের মধ্যে একবারও আখিরাতের ভয় এসে দাঁড়ায় না? একটি আয়াত বদলে দিয়েছে ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহর গোটা জীবন;

---

[১] সুরা হাদিদ, আয়াত : ১৬

[২] ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে, *তারিখু দিমাশক*, খণ্ড : ৪৮; পৃষ্ঠা : ৩৮৪; *তারিখু বাগদাদ*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৪১

অথচ আমাদের সামনে গোটা কুরআনটাই বিদ্যমান। নিত্য আমাদের কানে আসে কুরআনের সুর-লহরি। তথাপি কখনো কি ভেবেছি, এই কুরআন আমাদের হৃদয়ে কেন ঝড় তুলতে পারছে না? কেন এই কুরআন আমাদের হৃদয়ে সেভাবে দাগ কাটে না, যেভাবে দাগ কেটেছিল ফুযাইল রাহিমাহুল্লাহর মনে?

[গ]

খন্দকের যুদ্ধের সময়। মদিনার ইহুদি গোত্র বনু কুরাইজা মুসলিমদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে। মদিনা শহরকে বহিরাগত শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে মুসলিমদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার যে চুক্তি তারা করেছিল, তা থেকে সরে এসে নিজেদের দুর্গে বসে আছে। এই ঘটনা মুসলিম শিবিরে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে সাহাবি আবু লুবাবা বনু কুরাইজা গোত্রের কাছে গেলেন। বনু কুরাইজা গোত্র চুক্তিভঙ্গ এবং তার ফলে আসন্ন শাস্তি নিয়ে বেশ ভীতসন্ত্রস্ত। তারা বারবার আবু লুবাবার কাছে জানতে চাচ্ছে, 'হে আবু লুবাবা! আমরা যদি দুর্গ থেকে বের হই, তুমি কি জানো আমাদের কী শাস্তি হতে পারে?'

বারবার তাদের এমন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে আবু লুবাবা শেষ পর্যন্ত ইশারায় কিছু একটা বলে বসলেন। তিনি তার হাত দিয়ে গলায় ছুরি চালানোর ভঙ্গি করে বোঝাতে চাইলেন যে, 'শাস্তি হিশেবে তোমাদের হত্যা করা হবে। তাই তোমরা দুর্গের বাইরে এসো না।' এই কাজটা করে আবু লুবাবা মুহূর্তেই অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে ফেলেছেন। তাদের আমানত নষ্ট করেছেন। মুসলিমদের পক্ষ থেকে এসে মুসলিমদের ব্যাপারে তিনি বনু কুরাইজা গোত্রকে সাবধান করছিলেন; অথচ এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আমানতের খিয়ানত। তিনি ভাবলেন, নিজ থেকে এই কথা বলে তিনি বড় ধরনের পাপ করে ফেলেছেন, যে পাপের কোনো ক্ষমা নেই। তিনি দৌড়ে বনু কুরাইজার দুর্গ থেকে বের হয়ে মসজিদে নববিতে এসে থামলেন। মসজিদে নববির একটা খুঁটিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলেন আর বলতে লাগলেন, 'আমি গুরুতর পাপ করে ফেলেছি। ও আল্লাহ, আমি গুরুতর পাপ করে ফেলেছি। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা না করলে আমি এই অবস্থা থেকে নিজেকে কোনোভাবেই মুক্ত করব না।'

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

এভাবে সাত দিন তিনি ওই খুঁটি জড়িয়ে কেঁদেছিলেন। কেবল খাওয়া আর সালাতের সময়গুলো ব্যতীত বাকি সবটুকু সময় তিনি ওই খুঁটি জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন আর বলতেন, 'আমি পাপ করে ফেলেছি। আমি মহাপাপ করে ফেলেছি। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা না করলে আমি এই অবস্থা থেকে নিজেকে কোনোভাবেই মুক্ত করব না।' পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে ক্ষমা করেন এবং এই ঘটনার প্রেক্ষিতে একটি কুরআনের আয়াতও নাযিল করেন।[১]

কেবল একটা ইশারা! এই ইশারা করেই সাহাবি আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনে হলো যে, তিনি বিরাট কোনো পাপ করে ফেলেছেন। এরপর সেই পাপ থেকে বাঁচতে সাত সাতটা দিন নিজেকে খুঁটির সাথে জড়িয়ে রেখেছেন আর ক্ষমাপ্রার্থনা করে কেঁদেছিলেন। সাহাবি আবু লুবাবার মতন এমন সতর্ক হৃদয় কি আমাদের আছে? আমরা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতার পরে এভাবে ভয়ে শিউরে উঠি? অস্থির হয়ে যাই? নত হই? ফিরে আসি? একটা পাপের গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সাহাবি আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে যে আকুলতা, সেই আকুলতা কি আমাদের মাঝে আছে আদৌ?

[ঘ]

ঐতিহাসিক তুসতার যুদ্ধের কথা। পারসিকদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের লড়াই। প্রতিটা মুহূর্ত কাটছে চরম নাভিশ্বাসের সাথে। জয়-পরাজয় আর মৃত্যুর হাতছানি বারবার উঁকি দিচ্ছে পারসিক আর মুসলিম উভয় শিবিরে। রাতভর যুদ্ধ হলো। যুদ্ধের ফলাফল এলো সূর্যোদয়ের ঠিক একটু পরেই। অবশেষে মুসলিমরা পারসিকদের ওপর বিজয়ী হলো। তবে, সেদিনের ফজরের সালাত ছুটে গেল সকল মুসলিম সৈন্যের। যুদ্ধের প্রচণ্ড দামামার মাঝে কারও একটু ফুরসত মেলেনি ফজর আদায়ের।

অন্য অনেকের মতো আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুরও সেদিন ফজরের সালাত কাযা হয়ে যায়। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এতে তিনি পাপী সাব্যস্ত হবেন না। গুনাহগার হবেন না। যুদ্ধকালীন অবস্থার অপারগতার জন্য তাদের ছাড় দেয় ইসলামি শরিয়ত। তবু সেদিনের ফজর সালাত ছুটে যাওয়ার ব্যথা সারা জীবনেও আর ভুলতে পারেননি সাহাবি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু। যখনই তার তুসতার যুদ্ধের কথা মনে পড়ত, তখনই তিনি অঝোরে কাঁদতে শুরু করতেন। তার মুখে প্রায়ই শোনা যেত, 'তোমরা আমাকে তুসতার বিজয়ের কথা বলছ? এ তো নস্যি! আমার যে সেদিন ফজরের সালাতটাই ছুটে গিয়েছিল। এই সালাতের বিনিময়ে যদি উপহার হিশেবে পুরো পৃথিবীও আমার সামনে উপস্থিত করা হয়, তবু আমি তা পছন্দ করব না।'[১]

কেবল এক ওয়াক্ত সালাত কাযা হয়েছিল! তা-ও শরিয়তের দৃষ্টিতে সেই ছাড় তার জন্য বরাদ্দ ছিল। তারপরও এক ওয়াক্ত সালাত কাযা হয়ে যাওয়ায় আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনের যে অবস্থা, হৃদয়ে যে হাহাকার, ছুটে যাওয়া এক ওয়াক্ত সালাতের বিনিময়ে তিনি যে পুরো দুনিয়াটাকেও তুচ্ছ ভাবছেন, তার এমন ভাবনা থেকে আমরা কী শিখতে পারি? আমরা শিখতে পারি, দ্বীনের বুনিয়াদি বিষয়গুলোর ব্যাপারে কীভাবে তৎপর হতে হয়। দ্বীনের প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের জন্য আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মনের গহীনে যে ব্যাকুলতা, সেই ব্যাকুলতা আমাদের আছে কি? জীবনে কত হাজার ওয়াক্ত সালাত আমরা ছেড়ে দিয়েছি তার কি কোনো হিশেব আছে? এই যে হিশেবহীনভাবে সালাত কাযা করেই যাচ্ছি রোজ, এর জন্যে আমাদের অন্তরের কোথাও কি একটু অনুশোচনা জাগে? কখনো কি একবার আমরা সাহাবি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো করে ভাবতে পেরেছি? গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি? হুহু করে কাঁদতে পেরেছি? আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু কেবল এক ওয়াক্ত সালাতের জন্য দুনিয়াটাকেই তুচ্ছ ভেবেছিলেন, আর আমরা দুনিয়ার জন্য নিত্যদিনকার সালাতগুলোকে তুচ্ছ ভেবে দিন কাটাই।

[ঙ]

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং রোমকদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। একপর্যায়ে উভয় দলের মাঝে একটি সন্ধি হয় যে, তারা আপাতত যুদ্ধ বিরতিতে যাবে। সন্ধিরও একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হলো। তবে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মুসলিম সৈন্যদের রোমক সীমান্তের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়ামাত্র রোমকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। এতে করে রোমকরা পুনরায় যুদ্ধপ্রস্তুতি নেওয়ার আগেই তাদের পরাস্ত করে ফেলা যাবে। তারা কল্পনাও করতে পারবে না যে, মুসলিমরা যুদ্ধ বিরতির পর এত দ্রুত আক্রমণ করে বসবে। তা-ই হলো। মুসলিম সৈন্যরা রোমক সীমান্তে

---

[১] ...য়া খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ৯৯ ; আত তাবাকাতুল কুবরা, ইবনু সাদ, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ৩৩৩

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

গিয়ে অবস্থান নিল এবং সন্ধির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ামাত্রই তারা অপ্রস্তুত রোমকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রোমকরাও আর পেরে উঠল না মুসলিমদের সাথে। তারা পিছু হটতে শুরু করল। মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বিজয়ের আশা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন।

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সামনে অগ্রসর হতে দেখে পেছন থেকে একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত বেগে তার সামনে চলে এলো। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! মুসলিমদের আদর্শ হলো অঙ্গীকার রক্ষা করা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা নয়।'

নিকটবর্তী হওয়ার পর দেখা গেল ইনি হলেন সাহাবি আমর ইবনু আবাসা রাযিয়াল্লাহু আনহু। তাকে কথাগুলো বলতে দেখে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমরা তো অঙ্গীকার ভঙ্গ করিনি। নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হওয়ার পরে আক্রমণ করেছি।' তখন আমর ইবনু আবাসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো জাতির সঙ্গে কোনো অঙ্গীকার করে, তাহলে সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কিংবা স্পষ্টভাবে অঙ্গীকার শেষ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া পর্যন্ত সে অঙ্গীকার ওই ব্যক্তি খুলবেও না, বাঁধবেও না। অর্থাৎ অঙ্গীকারবিরোধী কোনো কাজ সে করবে না।'[১]

আমর ইবনু আবাসা রাযিয়াল্লাহু আনহু এই হাদিস দ্বারা মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, কোনো জাতির সাথে কৃত অঙ্গীকার স্পষ্টরূপে বাতিলের ঘোষণা দেওয়া ব্যতীত উক্ত জাতির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপই নেওয়া যাবে না। যুদ্ধ তো আরও অনেক পরের ব্যাপার। মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যেভাবে রোমকদের অতর্কিত আক্রমণ করে বসেছেন তা শরিয়তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়।

মুসলিম বাহিনী একেবারে বিজয়ের দোরগোড়ায়। বিশাল শক্তিবহরের রোমক বাহিনীকে তারা প্রায় পরাস্ত করেই ফেলেছে। এমন সময় সেখানে একজন সাহাবি এসে জানালেন ভিন্ন কথা। ফিরে যেতে হবে মুসলিমদের, কারণ শেষোক্ত এই আক্রমণ শরিয়ত মোতাবেক বৈধ নয়। দলিল হিশেবে তিনি উপস্থিত করেছেন কেবল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটিমাত্র হাদিস।

---

[১] তাফসিরে ইবনু কাসির, সুরা নাহলের ৯২ নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে দুটো পথ। হয় তিনি আমর ইবনু আবাসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথাকে অগ্রাহ্য করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন এবং বিজয় লাভ করে দখল করবেন রোমকদের দুর্গ। নয়ত তিনি একেবারে বিজয়ের দ্বারপ্রান্ত থেকে রিক্তহস্তে ফেরত আসবেন। তার ঝুলিতে থাকবে না কোনো প্রাপ্তি। বিজয়ের সকল আয়োজন ভেস্তে দিয়ে তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে বিফল মনোরথে। যদি আমরা দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করি, মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর জায়গায় যদি অন্যকেউ হতেন, কোন পথে অগ্রসর হতেন তিনি? যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী বিজয় ফেলে রেখে বেছে নিতেন পরাজয়ের মালা? কখনোই নয়। কিন্তু মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তা-ই করলেন। বিজয়ের অলিন্দ থেকে তিনি সকল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে চলে এলেন কেবল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে। নবিজির কেবল একটি হাদিস তাকে ফিরিয়ে এনেছে সম্মুখ সমরের নিশ্চিত বিজয় থেকে। যুদ্ধে জয়লাভের গৌরব, বিজয়ের ফলে অর্জিত হতে যাওয়া সকল সম্ভাব্য অর্জনকে তিনি বিসর্জন দিয়ে দেন কেবল আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করবেন বলে।

কেবল একটি হাদিস, একটি বাণী তাদের যুদ্ধজয়ের এ রকম চরম মুহূর্ত থেকেও ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। আমাদের সামনে তো গোটা কুরআন, হাদিস পড়ে আছে। আমরা জানি, কুরআন আমাদের যিনার কাছে ঘেঁষতে নিষেধ করে, সুদ-ঘুস খেতে নিষেধ করে। সালাত প্রতিষ্ঠা করতে বলে, যাকাত আদায় করতে বলে। সৎ হিশেবে বাঁচতে বলে। নবিজির সুন্নাহতে আমরা আমাদের জীবন গঠনের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র দেখতে পাই। তবু কি আমরা এ সকল পাপ থেকে নিজেদের নিবৃত্ত করতে পারি? পারি না। যে ইসলাম, যে কুরআন, যে রাসুল তাদের জন্য এসেছিল, ঠিক একই ইসলাম, একই কুরআন, একই রাসুল আমাদের জন্যও। তবুও কী বিশাল পার্থক্য তাদের আর আমাদের ঈমানের মাঝে!

[চ]

বর্তমান সময়টা জাহিলিয়াতের সেই সময়ের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। চারদিকে কত রং-বেরঙের ফিতনা। নানান রকম ফাঁদ আর বিচিত্র সব চোরাবালির সমারোহ। একটু পা ফসকালেই ডুবে যেতে হবে অথৈ ফিতনার অতল গহ্বরে। পৃথিবী তার সমস্ত আয়োজন নিয়ে বসে আছে আমাদের বিভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত আর গাফিল করার জন্যে। আমাদের চিরশত্রু ইবলিস শয়তানের রূপেও এসেছে বাহারি পরিবর্তন। সে এখন নানান রকম বেশে উপস্থিত হয় আমাদের কাছে। কখনো বন্ধু বেশে, কখনো-বা পরামর্শদাতা হিশেবে।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

গিয়ে অবস্থান নিল এবং সন্ধির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ামাত্রই তারা অপ্রস্তুত রোমকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রোমকরাও আর পেরে উঠল না মুসলিমদের সাথে। তারা পিছু হটতে শুরু করল। মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বিজয়ের আশা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন।

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সামনে অগ্রসর হতে দেখে পেছন থেকে একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত বেগে তার সামনে চলে এলো। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! মুসলিমদের আদর্শ হলো অঙ্গীকার রক্ষা করা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা নয়।'

নিকটবর্তী হওয়ার পর দেখা গেল ইনি হলেন সাহাবি আমর ইবনু আবাসা রাযিয়াল্লাহু আনহু। তাকে কথাগুলো বলতে দেখে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমরা তো অঙ্গীকার ভঙ্গ করিনি। নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হওয়ার পরে আক্রমণ করেছি।' তখন আমর ইবনু আবাসা রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো জাতির সঙ্গে কোনো অঙ্গীকার করে, তাহলে সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কিংবা স্পষ্টভাবে অঙ্গীকার শেষ হওয়ার ঘোষণা দেওয়া পর্যন্ত সে অঙ্গীকার ওই ব্যক্তি খুলবেও না, বাঁধবেও না। অর্থাৎ অঙ্গীকারবিরোধী কোনো কাজ সে করবে না।'[১]

আমর ইবনু আবাসা রাযিয়াল্লাহু আনহু এই হাদিস দ্বারা মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে, কোনো জাতির সাথে কৃত অঙ্গীকার স্পষ্টরূপে বাতিলের ঘোষণা দেওয়া ব্যতীত উক্ত জাতির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপই নেওয়া যাবে না। যুদ্ধ তো আরও অনেক পরের ব্যাপার। মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু যেভাবে রোমকদের অতর্কিত আক্রমণ করে বসেছেন তা শরিয়তের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়।

মুসলিম বাহিনী একেবারে বিজয়ের দোরগোড়ায়। বিশাল শক্তিবহরের রোমক বাহিনীকে তারা প্রায় পরাস্ত করেই ফেলেছে। এমন সময় সেখানে একজন সাহাবি এসে জানালেন ভিন্ন কথা। ফিরে যেতে হবে মুসলিমদের, কারণ শেষোক্ত এই আক্রমণ শরিয়ত মোতাবেক বৈধ নয়। দলিল হিশেবে তিনি উপস্থিত করেছেন কেবল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটিমাত্র হাদিস।

[১] তাফসিরে ইবনু কাসির, সুরা নাহলের ৯২ নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য

মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর সামনে দুটো পথ। হয় তিনি আমর ইবনু আবাসা রাযিয়াল্লাহু আনহুর কথাকে অগ্রাহ্য করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন এবং বিজয় লাভ করে দখল করবেন রোমকদের দুর্গ। নয়ত তিনি একেবারে বিজয়ের দ্বারপ্রান্ত থেকে রিক্তহস্তে ফেরত আসবেন। তার ঝুলিতে থাকবে না কোনো প্রাপ্তি। বিজয়ের সকল আয়োজন ভেস্তে দিয়ে তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে বিফল মনোরথে। যদি আমরা দুনিয়াবি দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করি, মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর জায়গায় যদি অন্যকেউ হতেন, কোন পথে অগ্রসর হতেন তিনি? যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী বিজয় ফেলে রেখে বেছে নিতেন পরাজয়ের মালা? কখনোই নয়। কিন্তু মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তা-ই করলেন। বিজয়ের অলিন্দ থেকে তিনি সকল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে চলে এলেন কেবল নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করে। নবিজির কেবল একটি হাদিস তাকে ফিরিয়ে এনেছে সম্মুখ সমরের নিশ্চিত বিজয় থেকে। যুদ্ধে জয়লাভের গৌরব, বিজয়ের ফলে অর্জিত হতে যাওয়া সকল সম্ভাব্য অর্জনকে তিনি বিসর্জন দিয়ে দেন কেবল আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করবেন বলে।

কেবল একটি হাদিস, একটি বাণী তাদের যুদ্ধজয়ের এ রকম চরম মুহূর্ত থেকেও ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল। আমাদের সামনে তো গোটা কুরআন, হাদিস পড়ে আছে। আমরা জানি, কুরআন আমাদের যিনার কাছে ঘেঁষতে নিষেধ করে, সুদ-ঘুস খেতে নিষেধ করে। সালাত প্রতিষ্ঠা করতে বলে, যাকাত আদায় করতে বলে। সৎ হিশেবে বাঁচতে বলে। নবিজির সুন্নাহতে আমরা আমাদের জীবন গঠনের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র দেখতে পাই। তবু কি আমরা এ সকল পাপ থেকে নিজেদের নিবৃত্ত করতে পারি? পারি না। যে ইসলাম, যে কুরআন, যে রাসুল তাদের জন্য এসেছিল, ঠিক একই ইসলাম, একই কুরআন, একই রাসুল আমাদের জন্যও। তবুও কী বিশাল পার্থক্য তাদের আর আমাদের ঈমানের মাঝে!

[চ]

বর্তমান সময়টা জাহিলিয়াতের সেই সময়ের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। চারদিকে কত রং-বেরঙের ফিতনা। নানান রকম ফাঁদ আর বিচিত্র সব চোরাবালির সমারোহ। একটু পা ফসকালেই ডুবে যেতে হবে অথৈ ফিতনার অতল গহ্বরে। পৃথিবী তার সমস্ত আয়োজন নিয়ে বসে আছে আমাদের বিভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত আর গাফিল করার জন্যে। আমাদের চিরশত্রু ইবলিস শয়তানের রূপেও এসেছে বাহারি পরিবর্তন। সে এখন নানান রকম বেশে উপস্থিত হয় আমাদের কাছে। কখনো বন্ধু বেশে, কখনো-বা পরামর্শদাতা হিশেবে।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

দুনিয়ায় প্রাপ্ত বড় একটি নিআমত হলো মুসলিম হিশেবে জন্মগ্রহণ করা। কিন্তু এই নিআমাত তখনই ফলপ্রসূ হবে, যখন আমরা এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারব। মুসলিম হয়ে কী লাভ হলো, যদি আমি পদে পদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকি? আমার জন্য নাযিল হওয়া জীবনবিধান অনুসারে জীবন যদি না-ই সাজাতে পারি, কী মূল্য আছে তবে এই মুসলমানিত্বের? আমি কুরআন পেয়েছি, হাদিস পেয়েছি, কিন্তু আমি কি আনাস ইবনু মালিকের মতো হয়ে উঠতে পেরেছি? আমি কি পেরেছি আমার জাহিলিয়াত থেকে পুরোপুরি উঠে আসতে? আমি কি পেরেছি আমার জাহিলিয়াতের কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা করতে? আমি মুসলিম, কিন্তু আমার জীবনে কি ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহর মতন কুরআনের প্রভাব আছে কোনো? কুরআনের কোনো আয়াত নিয়ে কি গভীরভাবে ভাবার এবং জীবনে বাস্তবায়ন করার সময় আমার কখনো হয়েছে? প্রতিদিন আমি তিলাওয়াত করি, ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকীম—আমাদের সরলপথে পরিচালিত করুন। অথচ মসজিদ থেকে বের হলেই আমি আবার পাপের মধ্যে ডুবে যাই। ফিরে যাই আমার চির-পরিচিত সেই নাটক, সিনেমা আর আত্মপ্রবঞ্চনার জগতে।

ভাবছেন, এসব আবার জাহিলিয়াত কীভাবে হয়? আদতে আমরা তো পুরোপুরিই জাহিলিয়াতের মধ্যে ডুবে আছি। মোবাইল আর কম্পিউটারের ব্রাউজার হিস্টোরি যেগুলোকে আমরা এক ক্লিকে মুছে ফেলি, সেগুলোই তো আমাদের জাহিলিয়াতের প্রমাণ। কত নিষিদ্ধ, অশুদ্ধ এবং অশ্লীল সাইটেই আমরা ঘোরাফেরা করি রোজ। যুগের আধুনিকতা পতিতাপল্লীকে আমাদের হাতের মুঠোয় পুরে দিয়েছে। সেই নিষিদ্ধ পল্লীর নিয়মিত খদ্দের আমরা। এই যে ভার্চুয়াল যিনা আর ব্যভিচারের মধ্যে আমাদের দু-চোখ আর দু-হাত ডুবিয়ে রেখেছি, এটা জাহিলিয়াতের চেয়ে কম কীসে?

আমরা জানি, মিথ্যে বলা গুনাহের কাজ। এই নির্জলা সত্যটা জেনেও আমরা উঠতে-বসতে মিথ্যে কথা বলি। মানুষকে কষ্ট দেওয়া, লোক ঠকানো, প্রতারণা করা, বাবা-মায়ের অবাধ্য হওয়া, হারাম রিলেশানশিপে জড়িয়ে থাকা—ইত্যাদি নানারকম জাহিলিয়াতে নিমগ্ন আমরা। কখনো কি এই জাহিলিয়াতগুলোকে আমরা মন থেকে ঘৃণা করেছি বা করার চেষ্টা করেছি আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো?

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ব্যাপারে কতই-না উদাসীন আমরা! অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে আমাদের জন্য ফরয করেছেন। ফরয মানে অবশ্য কর্তব্য, অবশ্য পালনীয়। বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ এবং বাতাসে

কার্বন-ডাই অক্সাইড ছাড়ার মতোই জরুরি। অক্সিজেন গ্রহণ আর কার্বন-ডাই অক্সাইড ত্যাগ করতে না পারলে আমাদের অস্তিত্ব যেমন সংকটে পড়ে যায়, ঠিক সেভাবে সালাত আদায় না করলে আমাদের মুসলমানিত্বও সংকটে পড়ে যায়। অক্সিজেন সংকটে পড়ে যাওয়া মুমূর্ষু রোগীটা যেভাবে হাসপাতালে ছুটে আসে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণের জন্য, মুসলমানিত্বের সংকটে পড়ে যাওয়া কোনো ব্যক্তি কি সেভাবে মসজিদে ছুটে আসে? আসে না। কারণ, অক্সিজেন সংকটের ব্যাপারটা দৈহিক আর মুসলমানিত্বের ঘাটতিটা আত্মিক। আমরা আমাদের শরীর নিয়ে যতটা উদ্বিগ্ন আর চিন্তিত, আত্মা নিয়ে ততটাই ভাবলেশহীন।

এই সংকট আর দুরবস্থা থেকে বাঁচতে হলে আমাদের বদলাতে হবে। বদলাতে হবে ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহর মতন—রাতারাতি, মুহূর্তেই। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো জাহিলিয়াতকে ঘৃণা করতে হবে। সবার আগে নিজের দিকে তাকাতে হবে। আমাদের হতে হবে সাহাবি আবু লুবাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতন। যদি মনে হয় আমার দ্বারা অন্যায় হয়ে গেছে, পাপ কাজ হয়ে গেছে, মুহূর্তকাল না ভেবেই তাওবা করতে হবে। আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। আমাদের হৃদয় হতে হবে আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতন। এক ওয়াক্ত সালাতের জন্য ছটফট করতে থাকবে আমাদের হৃদয়। হতে হবে মুয়াবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্যের কাছে নিজের বিজয়, বীরত্ব, অহমিকা সবকিছুকে বিসর্জন দেওয়া শিখতে হবে।

আমার কী করার কথা ছিল আর আমি কী করছি—এই ফর্মূলাতে নিজেকে কল্পনা করে যদি আমরা আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারি, তাহলেই আমরা এই জাহিলিয়াত থেকে আমাদের উত্তরণ করতে পারব, ইন শা আল্লাহ। আমরা যে গান শুনি আর রাতভর মুভি দেখি, এই কাজ কি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পছন্দ করেন? অনুমোদন করেন? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে সেগুলো থাকুক। আর যদি উত্তর 'না' হয়, তাহলে এক্ষুনি, এই মুহূর্তে মোবাইল আর কম্পিউটারের প্রতিটি ফোল্ডারে থাকা সবগুলো গান আর মুভি এক ক্লিকে 'অল ডিলেট' করে দিই!

আমার ফোনের গ্যালারিতে থাকা আমার বান্ধবীর ছবিগুলো দেখার অনুমতি কি আমার ধর্ম আমাকে দিয়েছে? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে সমস্যা নেই। আর উত্তর যদি 'না' হয়, তাহলে আমার কি উচিত নয় এই মুহূর্তেই সেগুলো ডিলেট করে দেওয়া?

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

রিলেশানশিপের ব্যাপারটা ভাবা যাক। যার সাথে দিনে রাতে আমি ভালোবাসা আদানপ্রদান করছি, রেস্টুরেন্টে খাচ্ছি, পার্কে হাত ধরাধরি করে ঘুরছি, বিবাহ-বহির্ভূত একটা সম্পর্কে জড়িয়ে যাকে আমি জাদু, ময়না, টিয়া আর সোনাপাখি সম্বোধন করে যাচ্ছি রোজ—এই কাজ কি আমার জন্য আদৌ হালাল? আদৌ কি আমার ধর্ম এটা সমর্থন করে? আদৌ কি একজন মুসলিম এভাবে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়াতে পারে? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে এটা চলমান থাকুক। আর, উত্তর যদি 'না' হয়, তাহলে আমার কি উচিত নয় আজকেই এসব ছেড়ে দেওয়া? তাওবা করা? আল্লাহর কাছে পূর্বের সকল কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাওয়া?

এভাবেই, রাস্তায় যখন কোনো বেগানা নারীর দিকে নজর চলে যাবে, তার দিকে ড্যাবড্যাব চোখে তাকানোর আগে আমাদের ভাবতে হবে, 'এই কাজ কি মুসলিম হিশেবে আমার পক্ষে সাজে?'

যখন মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বেরিয়ে আসতে চাইবে, আমাদের ভাবতে হবে, 'আমি তো মুসলিম। আমি কি মিথ্যে বলতে পারি?'

যখন কোনো রিকশাওয়ালাকে ধমকাতে যাব, তার আগে ভাবা উচিত, 'এই আচরণ কি আমার সাথে যায়?'

যখন কোনো লোককে ঠকাতে যাব, তখন ভাবব, 'মুসলিম হয়ে আমি কি এটা করতে পারি?

প্রতিটি কাজের আগে আমরা যদি নিজেকে একবার প্রশ্ন করতে পারি, তাহলেই অনেক সমস্যা, অনেক সংকট থেকে সহজেই আমরা বেরিয়ে আসতে পারব। আমাদের সংকল্প হতে হবে আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতোই। জাহিলিয়াত যতই সুন্দর, মনোহর আর আকর্ষণীয় হোক না কেন, যদি তা আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনুমোদন না করেন, তাহলে সেটাকে আমরা মনেপ্রাণে ঘৃণা করব। আমাদের জীবন গঠন করতে হবে ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লার মতন; আল্লাহর বাণী শুনেই কেঁপে উঠেছিল যার অন্তরাত্মা। আমাদের হতে হবে সাহাবি আবু লুবাবার মতন; কেন্দ্র থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও যেন আমাদের অস্থির করে তোলে। আল্লাহর কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত হৃদয় যেন তড়পাতে থাকে অবিরাম।

জ্ঞানার্জনের কথা বলতে গিয়ে সক্রেটিস বলেছিলেন, Know Thyself. মানে হলো, নিজেকে জানো। তিনি মনে করতেন, নিজেকে জানতে পারলেই জগৎকে জানা সহজ হয়ে যায়। পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। Change Yourself. নিজেকে পরিবর্তন করলেই আশেপাশে পরিবর্তন করা সহজ হয়ে যায়। সুতরাং, চলো বদলাই।

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

শেষ কথা

জীবন ক্ষয়িষ্ণু। বরফ যেমন গলতে গলতে একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়, আমাদের জীবনটাও ঠিক তেমনই। সময়ের সাথে চলতে গিয়ে এই জীবন একদিন শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। আচ্ছা, নশ্বর এই জীবনটা কি নিছক ভোগ আর ভ্রান্তির মাঝেই কেটে যাবে? নিজেকে বদলে ফেলার উদাত্ত আহ্বান প্রতিদিন পাঁচবার করে মিনারের চূড়া থেকে ভেসে আসে আমাদের কানে। তবু আমরা ভাবলেশহীন। যে অনন্ত জীবনের সোপান পানে আমাদের দৃষ্টি, যে অনিঃশেষ সময়ের স্রোতে অবগাহনের সাধ আমাদের হৃদয়কোণে, তাকে পূর্ণমাত্রা দিতে আমরা কি আরেকবার ছুটে আসব না সেই আলোর ফোয়ারার দিকে, যে ফোয়ারা উৎসারিত হয়েছিল হেরা গুহা থেকে? যে আলোতে ভরে উঠেছিল অন্ধকার পৃথিবী, সেই আলোতে জীবন রাঙাতে আমরা কি আর এক পা এগিয়ে যেতে পারি না?

জীবনের বেলা ফুরাবার আগে, চলুন তবে প্রত্যাবর্তন করি। নিজেকে আবিষ্কার করি নতুন আরেক পৃথিবীতে...

একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০ উপলক্ষ্যে

সমকালীন প্রকাশন-এর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক
০১	বেলা ফুরাবার আগে	আরিফ আজাদ
০২	ফেরা-২	বিনতু আদিল
০৩	শিকড়ের সন্ধানে	হামিদা মুবাশ্বেরা
০৪	হৃদয় জাগার জন্য	ইয়াসমিন মুজাহিদ
০৫	জীবন যদি হতো নারী সাহাবির মতো	ড. হানান লাশীন
০৬	বাক্সের বাইরে	শরীফ আবু হায়াত অপু
০৭	কাজের মাঝে রবের খোঁজে	আফিফা আবেদীন সাওদা
০৮	সুখের নাটাই	আফরোজা হাসান
০৯	ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ	আবুল হাসানাত
১০	ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আব্দুল্লাহিল মামুন
১১	ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ
১২	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ	যোবায়ের নাজাত
১৩	হাসান আল-বাসরি রাহিমাহুল্লাহ	আব্দুল বারী
১৪	আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ	আবুল হাসানাত

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আমাদের অন্যান্য সেরা বইসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য (টাকা)
০১	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২	আরিফ আজাদ	৩৩৬
০২	পড়ো	ওমর আল জাবির	২২০
০৩	আরজ আলী সমীপে	আরিফ আজাদ	২৫০
০৪	প্রত্যাবর্তন	আরিফ আজাদ	৩০০
০৫	সবুজ রাতের কোলাজ	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	১৫০
০৬	খুশূ-খুযূ	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	১২৫
০৭	মা, মা, মা এবং বাবা	আরিফ আজাদ	২৩৫
০৮	ফেরা	সিহিন্তা শরীফা, নাইলাহ আমাতুল্লাহ	১৭২
০৯	তিনিই আমার রব	শাইখ আলী বিন জাবির আল ফাইফি	২৭২
১০	জীবন পথে সফল হতে	শাইখ আব্দুল কারিম বাক্কার	২৩২
১১	যে জীবন মরীচিকা	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	১৭৫
১২	নবীজি ﷺ	শাইখ আয়িয আল-কারনী	২৯০
১৩	তারাফুল	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২৭২
১৪	সেইসব দিনরাত্রি	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	২৭৫
১৫	মেঘ রোদ্দুর বৃষ্টি	রৌদ্রময়ীরা	২৮৬
১৬	শিশুর মননে ঈমান	ড. আইশা হামদান	১৭৬
১৭	মেঘ কেটে যায়	ড. হুসামুদ্দিন হামিদ	২৬৮
১৮	গল্পগুলো অন্যরকম	সমকালীন টীম	৩১৫
১৯	সন্তান : স্বপ্ন দিয়ে বোনা	আকরাম হোসাইন	১৮৫
২০	হিফয করতে হলে	শাইখ আব্দুল কাইয়্যুম আস-সুহাইবানী	১৪১
২১	সালাফদের জীবনকথা	শাইখ আব্দুল আযীয	৩২০
২২	কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা	শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান	২৬০
২৩	আর্গুমেন্টস অব আরজু	আরিফুল ইসলাম	২৫০
২৪	সবর	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	২৬০
২৫	ভালোবাসার রামাদান	ড. আয়িয আল-কারনী	৩০৮

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

আরিফ আজাদ। জন্মেছেন চট্টগ্রামে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময় থেকেই লেখালেখির হাতেখড়ি। ইসলামি সাহিত্য নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করেন। ২০১৭ সালের একুশে বইমেলায় 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ' লিখে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন। বিশ্বাসের কথাগুলোকে শব্দে রূপ দিতে তার জুড়ি নেই। ইসলামি ভাবধারাকে কলমের তুলিতে তুলে ধরতে লেখকের রয়েছে মুনশিয়ানা। ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয় লেখকের পাঠকনন্দিত বই 'আরজ আলী সমীপে' এবং ২০১৯ সালে তুমুল জনপ্রিয় সাজিদ সিরিজের দ্বিতীয় বই 'প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২'। এছাড়াও সম্পাদনা করেছেন 'প্রত্যাবর্তন' আর 'মা, মা, মা এবং বাবা'-এর মতো জনপ্রিয় বইগুলো। ২০২০ সালের একুশে বইমেলায় লেখকের প্রকাশিত চতুর্থ মৌলিক বই 'বেলা ফুরাবার আগে'।

সমকালীন প্রকাশন

Download New Pdf- www.PoragEducation.com

জীবনের কতগুলো বসন্ত পার হয়ে গেছে, ম্লান হয়ে গেছে কতশত কাকডাকা ভোর। আবছা স্মৃতির মতো, জীবন আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন হয় ধূসরতায়। সময়ের সরল সংখ্যা কমে আসছে ধীরে ধীরে। সব পাখি নীড়ে ফেরে। সব নদী ফিরে যায় মোহনায়। তবু কিছু মানুষ, ভ্রান্তির মায়াজাল ভেদ করে, ফিরে আসতে চায় না। মোহ আর মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে তারা ছুটতে পারে না আদিগন্ত অনন্তের পথে।

তবু ফিরতে হবে। বেলা ফুরাবার আগে, ঠিক ঠিক চিনে নিতে হবে পথ। সন্ধ্যের ঘনঘোর আঁধারের অতলতায় ডুবে যাবার আগে, জীবন তরিটিকে ভেড়াতে হবে কূলে। রাতেরও শেষ আছে। ক্লান্তিরও আছে অবসান। জীবনের জড়তার জোয়ার ছেড়ে, নতুন করে একবার, শুধু একবার জ্বলে উঠতে হবে। নিজেকে আরেকবার ঝালিয়ে নিতে আজ তবে ডুব দেওয়া যাক...

ISBN
9 789843 445759